নব্যভারত।

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

আশা-শিশু—নিরাশার মন্দিরে।

আশা ধরিয়া মানুষ বাঁচে, আশা অবলম্বনে জাতি সজীব হয়, আশা-কুহকে মাতিয়া দেশ উন্নত হয়। আশা না থাকিলে মানুষ মৃত, জাতি নির্ব্বাণ, দেশ ভস্মীভূত। বাঙ্গালীর, ভারতীয় জাতির, বা ভারতের কি আশা আছে যে, তাহাকে জীবন্ত বা উন্নত বলিব?

ব্যক্তিগত জীবনে দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত হৃদয়ে কত আশা-শিশু জন্মিয়াছিল, কিন্তু দু দশদিন পরেই তাহা ঢলিয়া পড়িয়াছে, সফল হয় নাই। যত্ন করি, চেষ্টা করি, আশা কিছুতেই বাঁচে না। সকল উদ্যম পরাস্ত, সকল সাধ অপূর্ণ—আশা-শিশু এ জীবন-সরসিতে মাথা তুলিল কই? মায়ার ঘোরে ডুবিয়া, অজপা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, অশেষ সুখ বিলাসে মাতিয়া তুমি ভাই বড় মানুষী চালে চলিয়া, গাড়ী ঘোড়া হাঁকিয়া কতই আশা-স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইতেছ, ভাবিতেছ, কি যেন পাইলে আর কি! কিন্তু আমি ঐ সকলের মধ্যে কেবল মরীচিকাই দেখিতেছি। চতুর্দ্দিকে মহা মরুভূমি, অজানিত, অকথিত, অব্যক্ত; পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ পথিক হাহাকার করিতেছে, প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, আশা-মরীচিকা দেখিয়া যতই ছুটিতেছে, ততই বঞ্চিত হইতেছে। জল মিলিল না, তৃষ্ণা মিটিল না, পথিকের জীবন যা
হইয়াছে। আমি সংসার-মরুতে দগ্ধ প
কই জল পাইলাম, কেবল পুড়িলামই
আশা মিটিল? কেবল ছুটিলামই, কেবল
লামই, কই জল মিলিল? বাল্যকাল
কর্ম্মকাণ্ড ধরিয়া ছুটিতেছি, কই ভাই শা
বারি মিলিল বলত? বাল্যকাল হইতে অ
করিতেছি, নিঃস্বার্থ প্রেম নামক যে এ
জিনিস আছে শুনিয়াছি, তাহা ধরিয়া
জাতি বিশ্ব-প্রেম-ধামে পৌছিবে,—এক ক
বাঙ্গালী মানুষ হইবে। যত লেখা, যত
যত কথা—সব ইহারই জন্য। যত বয়স বা
তেছে, ততই প্রত্যক্ষ করিতেছি, নিঃস্ব
কথাটা অলীক স্বপ্নবৎ উপেক্ষিত হ
প্রায় সর্ব্বত্র; সকলেই, না হয়, অ
বৃথা মায়ায় মজিয়া, যাহা লক্ষ্য নয়,
কর্ত্তব্য নয়, তাহা ধরিয়াই মহা
নৃত্য করিতেছে;—দিবারাত্রি শুনি
কেবল স্বার্থ, স্বার্থ, কেবল স্বার্থ! ভা
মিথ্যা, স্ত্রী পুত্র মিথ্যা, পিতা মাতা
আত্মীয় পরিজন মিথ্যা, দেশ মিথ্যা
মিথ্যা; সত্য কেবল স্বার্থ,—
অনাবিল, স্ব এবং অর্থ! আ
আপনার কাম

মাপনার ঐশ্বর্য্য, আপনার সম্পদ; যা সবই কেবল আপনার জন্য! একান্ন-পরিবার-সংরক্ষণ, এক জাতীয়ত্ব-গঠন, সংস্থাপন এবং ভাষা-সংস্করণ,—এ সক-বাতুলের প্রলাপ! বড় হইতে চাও, ফল ভুলিয়া কেবল "আপন", কেবল ং" কেবল "স্ব" লইয়া ডুবিয়া থাক। ন যশ, আপন প্রশংসা, আপন গুণ-ন, আপন গুণ-শ্রবণ, আপন কথা প্রচাব, রাত্রি এই সকল লইয়া মাতিয়া থাক, ার্থ" কথাটা অভিধান হইতে তুলিয়া কেবল "স্বার্থ" কথার জয় ঘোষণায় ক রহ! বড় কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছি। য় আশা-শিশু এই নিরাশার মরুভূমিতে জল বিনা, এতদিন পর, শুষ্ক হইতে য়াছে। এতদিন যে আশা-শিশু ধরিয়া চয়াছিলাম, সে আশা-শিশু মরিলে আর চয়া কাজ কি? বৃথা লেখা-লেখি, বৃথা াবকি, বৃথা যল্পনা, বৃথা কল্পনা করিয়া ভ কি? মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াই কি ? ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে যে কথা, প্রতি াত সম্বন্ধেই সেই কথা, প্রতি দেশ সম্বন্ধেই ই কথা। ব্যক্তিত্বটুক বাদ দিলে, কথাটা ড়ায়, বাঙ্গালীর, ভারতবাসীর এবং এই ার কি আশা আছে যে, তাহা লইয়া ধারণ করিবে? মৃত্যু শ্রেয় নয় কি? । মরণের গাঢ় অন্ধকারে সকল নিমগ্ন কি?। হায়, প্রকৃত জীবনের পরিচয় ায় পাওয়া যায়।।

ৃপক্ষীরা নিজ নিজ লইয়া দিবানিশি ব্যস্ত। মানুষও যদি কেবল তাহাই তবে মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যার কেন? মানুষ তবে পশুর দলে ... অচ্ছাগতিবিধি করিয়া স্ব-সুখ-সাধনে ব্যস্ত থাকুক। এতকাল পরে পশুর ধর্ম্ম যদি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বিবেচিত হইয়া থাকে, তবে আর কেন? স্বাধীনতার বিজয়-নিশান গগনে তুলিয়া, নির্ভয়ে স্বেচ্ছা-চারিতার ভুবন-বিজয়ী সঙ্গীতে তান ধরিয়া দেও, সকল আন্দোলন নির্ব্বাণ হউক, বল, পশুপক্ষীই জগতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। জন্ম মরণই পশুপক্ষীর জীবনের লক্ষ্য, আমরণ নিজসুখ অন্বেষণই উদ্দেশ্য, যতটুক বুঝি আর শ্রেষ্ঠ গুণ ত বড় দেখিতে পাই না। সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন বিবর্ত্তনবাদীই পশুপক্ষী-সমা-জের উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। চিরকালই তাহারা একই ভাবে আছে, নড়েচড়ে, খায় শোয়, কয়েক বৎসর পর মরিয়া যায়। মানুষের অত্যাচারে কোন কোন জন্তু আরো অবনতির রাজ্যে যাইতেছে, কিন্তু উন্নতি কোথাও দেখি নাই। কিম্বা উন্নতির কথা ত কোন পুস্ত-কেও পড়ি নাই। গো, মহিষ, ছাগল, কুকুর, হরিণ ব্যাঘ্র হইতে শ্রেষ্ঠতর জীবের অভ্যু-থানের কথা পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডারবিন-প্রমুখ ব্যক্তিগণও বলিতে পারেন নাই। ইহারা আদিতে যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে; চিরদিনই একই রূপ খায়, একইরূপ বেড়ায়, একই রূপ ডাকে, একই রূপ থাকে। বৈচিত্র্য নাই, রূপান্তর নাই, আদিতে যেমন, আজও তেমনি। আহার, নিদ্রা, রিপু-সেবা; ইহাই জীবনের লক্ষ্য এবং জীবনের পরিণতি। কোন আশা নাই, কোন উন্নতির পিপাসা নাই। মানুষ যদি আশা-বঞ্চিত, উন্নতির কামনা-রহিত, পরভাবনা-বর্জ্জিত, স্বার্থ-পরিচালিত হয়, তবে পশুতে আর মানুষে পার্থক্য কোথায়? কোনই পার্থক্য নাই।

বাঙ্গালী জীবিত; কেবল বাঙ্গালী কেন

সমস্ত ভারতীয় জাতির মনের উপর দিয়া এমন একটা বিষাদ-কালিমা রেখা অঙ্কিত হইতেছে যে, দিনদিন সকল উদ্যম, আশা-ভরসা-হীন হইয়া পড়িতেছে। দাঁড়াইয়া নীরবে অপমান বা প্রহার সহ্য করিতে ভারত-বাসীর মত এমন কেহই পারে না। স্ফূর্ত্তি নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, চেষ্টা নাই, যেন কলের পুতুল আর কি! কোন একজন বিদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালী এমন একজাতি, যাহারা শুইতে পাইলে বসে না, বসিতে পারিলে দাঁড়ায় না, দাঁড়াইতে পাইলে হাটে না এবং হাটিতে পাইলে দৌড়ায় না।" বাস্তবিক, ভারতের সমস্ত জাতি সমূহই যেন দিনদিন এই কথার জীবন্ত সাক্ষী রূপে দেদীপ্যমান হইতেছে। পরাধীনতার তীব্র আঘাতে, দারিদ্র্যের ঘোর পীড়নে, ম্যালেরিয়ার দারুণ আক্রমণে এবং চরিত্র-হীনতার অসহ্য দংশনে জাতি সাধারণের শরীরের তেজ নাই, মনের স্ফূর্ত্তি নাই;—মনুষ্যের যাহা থাকা প্রয়োজনীয়, তাহা যেন কিছুই নাই। ইংরাজ, ভারতের তেজ ও বীর্য্যে শক্তি ও সামর্থ্যে, চিরদিনের জন্য, এমন তরল অহিফেন ঢালিয়া দিয়াছে যে, সমস্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল, নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ইচ্ছা মাত্র ইংরাজ ঝালোয়াড়ের রাজাকে পথের ভিখারী সাজাইতেছেন, ইচ্ছামাত্র গলায় ফাঁসি দিয়া তেকেন্দ্রজিৎকে অমর ধামে প্রেরণ করিতেছেন, ইচ্ছামাত্র, বড় বড় মহামহোপাধ্যায়দিগকে 'অসৎকাজের সং সাজাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া তামাসা দেখিতেছেন, তুরি ভেরী বাজাইয়া বড়বড় হিতৈষীদিগকে শ্বেতাঙ্গের মোহিনী মায়ায়, সাপুড়িয়ার বংশী-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় বশ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। আজি তোমাকে, আমাকে, তাহাকে, নিত্য ইংরাজ অপমান নির্যাতনের উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া বিকট হাস্য হাসিতেছেন। তুমি জাতীয় মহাসমিতির ক্ষণিক উৎসাহে ভুলিতেছ, ভাই, দেখিতেছ না, দিন দিন এজাতি কেমন মৃতবৎ নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে? পরনিন্দা শিক্ষিতদিগের দিন দিন কণ্ঠের ভূষণ হইতেছে, পরশ্রীকাতরতা দিন দিন শিক্ষিতদিগের অঙ্গাভরণ হইতেছে, হিংসা বিদ্বেষ, যাহা নীচ জন-যোগ্য, তাহা এখন ষোল আনা শিক্ষিতদিগের হৃদয়ে রাজ্যাধিকার বিস্তার করিতেছে; সহানুভূতি, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সব গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছে। তুমি ভাই, কি অর্থে বল যে, এজাতির উন্নতি-সূর্য্য অদূরে? বাঙ্গালীর, ভারতবাসীর আছে কি? কেবল চিৎকার, কেবল বক্তৃতা, কেবল কাগজে কালীর আঁচড় কাটা, আর কি? জীবন থাকিলে এত অত্যাচার, এত অবিচার, এত দুর্নীতি, এত ব্যভিচার, এ সোণার ভারতে ধর্ম্মের নামে, রাজনীতির নামে বিকাইত না! বৃথা ভাই আশা-মরীচিকার স্বপ্ন দেখিতেছ, আজ এভারত আশা-হারা, তেজ-হারা, বীর্য্য-হারা, সম্মান-হারা, সর্ব্বস্বহারা। এভারত আজ ঘোর স্বার্থ-পরতায় নিমগ্ন।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-নীতি, যে দিন হইতে সেই ধর্ম্মের দুর্জ্জয় প্রভাব মন্দীভূত হইয়াছে, যে দিন হইতে ব্যাস বাল্মীকির ধর্ম্মাদর্শময় উজ্জ্বল সাহিত্যের স্থলে স্বেচ্ছা-প্রেম-লীলাময় নাটকাদির আদর বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে দিন হইতে শ্রীচৈতন্যের প্রেম ভক্তির নামে ব্যভিচারের কদর্য্য লীলা-স্রোতে দেশ ভাসিতেছে, সেই দিন বুঝিয়াছি, এ দেশের আর আশা ভরসা নাই। যে দিন ষোড়শবর্ষীয় বালক সিরাজকে সিংহাসন-

চ্যুত করিয়া, খাল কাটিয়া ইংরাজ-লোনা-জল আনায়ন করার জন্য কৃতঘ্নদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা-সভা বসিয়া গিয়াছে, সেই দিন এদেশের আশা-সূর্য্য ডুবিয়াছে? এখন আছে, দিগ্-দিগন্ত ব্যাপিয়া কেবল নিরাশা, নিরানন্দ, নিরুদ্যম, স্ফূর্ত্তিহীন পরাধীনতা, আত্মমর্য্যাদা-হীন তোষামোদ, আর স্বার্থ-চালিত দাসদিগের বিকট চিৎকার। নিন্দা পরে করিও, ভাই, একবার ভাবিয়া দেখ, কথাটা সত্য কি না?

জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রথম কথা প্রেম, মধ্য কথা পবিত্রতা, শেষ কথা দয়া। কেবল প্রেম, কেবল পবিত্রতা, কেবল দয়া। মহাত্মা বুথ বলেন, তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল এই কয়টী কথায় "Love" নিবদ্ধ। তিনি বলেন, প্রেমে অসাধ্য সাধিত হয়। আমরা দেখিতেছি, বাস্তবিকই প্রেমের দুর্জ্জয় তেজে দুর্ব্বল, অসহায়, ক্ষীণ বুথ অসাধ্য সাধন করিয়া জগৎকে মোহিত এবং স্তম্ভিত করিতেছেন। সহস্র সহস্র প্রতিনিধি জাতীয় মহাসমিতিতে একত্রিত হইয়া যাহা করিতে পারিতেছেন না, একা বুথ অঙ্গুলীনির্দ্দেশে তাহা সাধন করিতেছেন। কথা—কেবল প্রেম, শাস্ত্র কেবল প্রেম, অস্ত্র কেবল প্রেম। আমরা মিলিতে চাই, এই প্রেমটাকে দূরে ফেলিয়া দিয়া। গঙ্গায় প্রেম-মণি ভাসাইয়া, মন্ত্রণা-সভা বসাইয়া, ভারত উদ্ধার করিতে চাই!! সিরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, সিরাজকে মারিবার জন্যই মন্ত্রণা-সভা বসাইতে এদেশের লোকেরা চায়। পিতৃ-মাতৃ বিচ্ছেদ ঘরে ঘরে, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘরে ঘরে, একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা, পাশ্চাত্য পরিশ্রম-সমতা-সাধনের শিক্ষা-কুহকে ভাঙ্গিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, ঘোরতর দারিদ্র্য ভারতের গ্রাম, দেশ, রাজ্য সমূহকে গ্রাস করিতেছে, আর আমরা নিজ সুখ লইয়া, নিজ গৌরবে স্ফীত হইয়া গাড়ী চড়িয়া, হ্যাটকোট পরিয়া, রাশি ২ অর্থ ঢালিয়া, মন্ত্রণা-সভা করিতেছি। ধিক, ধিক, শতধিক! দশ বৎসরে যে সভা একটা কাজ হাতে লইতে পারিল না, সে জাতীয় সভার আবার নাম কর? ধিক, ধিক, শতধিক!! ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যার মীমাংসা আজও হয় নাই, আজও নিরন্নদিগের টেক্সের ভয় যায় নাই, আজও জমীদারের অত্যাচার কমে নাই, আজও দরিদ্রের ঘরের সুন্দরী স্ত্রী কন্যা, ধনীর অত্যাচারের অতীত হয় নাই, বরং কি, বরং দিন দিন আরো অত্যাচার বাড়িতেছে, টাকার বলে দরিদ্রদিগের নির্ব্বাসন-কথাও ঢাকা পড়িতেছে। সমবেদনা কোথায়? কোন্ মুখে নির্লজ্জের ন্যায় বল, দেশের জাতীয় সভা দাঁড়াইয়া আশার স্বপ্ন জাগাইতেছে? অশিক্ষার ঘোরান্ধকারে ভারত নিমজ্জিত, অধীনতার তীব্র অত্যাচারে নিষ্পেষিত, দেখ দেখ, চাহিয়া দেখ, চক্ষু থাকে ত চাহিয়া দেখ, বৃথা চীৎকার ভিন্ন সতী নারীকে উদ্ধার করিতে, বিপন্ন নির্ব্বাসিত রাজার সহায় হইতে, অত্যাচারিত ও নির্ব্বাসিত মূক প্রজাকে রক্ষা করিতে এদেশে কোন হিতৈষী নাই। হিতৈষী নামটা লাটসভায় বসিবার এবং রায় বাহাদুর খেতাব প্রাপ্তির পূর্ব্বাভাস মাত্র। না খাটিয়া, না জীবন দিয়া, না পরের জন্য ভাবিয়া, না পরের জন্য সর্ব্বস্ব ঢালিয়া, আর কোন দেশে হিতৈষী নাম বিকায় নাই! আবেদন করার পরামর্শ দিবার জন্য, আবেদনের আয়োজনের জন্য বা ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষার জন্য কোন সভার প্রয়োজন আছে কি না, তুমি জান, এজগতের কোন বিখ্যাত হিতৈষী জানেন না। রবার্ট এমেট জানেন না, পার্কার জানেন না, ম্যাট্‌সিনি জানেন না, গ্যারিবল্ডি

জানেন না। প্রেম কই, ভালবাসা কই, স্বার্থ-ত্যাগ কই, জীবন-ত্যাগ কই? বৃথা হুজুগ, বৃথা আয়োজন, বৃথা আশা-মরীচিকা!

আমি চাই একটু সুশীতল প্রেম বারি। ভারত মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, ভারত চায় একটু সুশীতল প্রেম-বারি। বক্তৃতাময় যুদ্ধ নয়, ভাবময় লেখালেখি নয়, ভারতের জাতিসমূহ চায় একটু সহানুভূতি মাত্র। কাট কাট মার মার করিয়া এজাতির কখনও উদ্ধার হইবে না;—নরশোণিত-ধারা-প্লাবনে এদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবে না। সকল অসাধ্য সাধিত হইবে,কেবল প্রেমে। ফরাশী-বিপ্লব কি প্রেম-মন্ত্রে ফ্রান্সকে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছে? আজও সেখানে নব-বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে—স্বাধীনতার প্রশান্ত ধ্বজার নিম্নেই পরাধীনতার বিষময় কাল-ভুজঙ্গ লুকায়িত আছে। প্রকৃত স্বাধীনতা মনে,—বাহিরে নহে। বাহিরের স্বাধীনতা,পরাধীনতার বিকৃত খোলস্ মাত্র। প্রকৃত স্বাধীনতা,স্বার্থ-ত্যাগে, জিতেন্দ্রিয়তায়, রিপু-সংগ্রাম-জয়ে, অজেয় আত্ম-মর্য্যাদা ও জাতীয়ত্ব বোধে। প্রকৃত স্বাধীনতা,দয়া,প্রেম ও পুণ্যসঞ্চয়ে। বাহিরের স্বাধীনতা, দেশকে, সমাজকে, কেবল শ্রীহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল করে। তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। যাহাতে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, বংশের শ্রীবৃদ্ধি, তাহাই বাঞ্ছনীয়। তাহা কেবল প্রেম-পুণ্যে অর্জ্জন করা যায়। সকল ভাই এক মায়ের সন্তান, সকল ভাই এক মাতৃ-ক্রোড়ে লালিত পালিত, অথচ থাকে দূরে দূরে, আরো দূরে, আরো দূরে! ছি, এমন করিয়া কি একতা হয়? এমন করিয়া কি মহাবল লাভ করা যায়? দাঁড়াও ভাই, আমার পার্শ্বে ভাই হইয়া দাঁড়াও, আমি,তুমি, সে—সকলে জমিয়া যাই, সকলের স্বার্থ ভুলিয়া একাত্মক হই, তোমাকে আমি তুলি, তুমি আমাকে তোল,—মহাবলে সকলে বলীয়ান হই। তবে ত হইবে। দূর দূর দূর—অপ্রেম,অপ্রেম,অ-প্রেম—স্ব,স্ব,স্ব—হায় এরূপ করিয়া একতার ঘর বাঁধা যায় না! ভাঙ্গিল, আর যোড়া লাগিল না। লাগিল কই? মিলন কই? কংগ্রেস কোথায়? অপ্রেম-আগুনে ঘর বাড়ী সব পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, দুর্ভিক্ষে নরনারী মরিয়া দেশ শূন্য করে, তর্পণ করিবেন, বৎসরান্তে কংগ্রেস।—অথবা মৌখিকপ্রেম, অথবা, গলাবাজি, অথবা উপাধির কুহক! হায়রে মহামেলার অপার আশা-ছাউনি!!

অশ্রুতে সিক্ত হইয়া মহাত্মা বিদ্যাসাগর বলিতেন,"এদেশের নিম্নশ্রেণীর গতি ফিরিবে না, এদেশের আর আশা নাই।" বলিতেন, "যে দেশে মাতৃজাতির হতাদর, সে দেশের মঙ্গল নাই। যে দেশে পুরুষে রমণী বধ করিয়া সুখ পায়, সে দেশের মঙ্গল নাই।" এ সকল কথা জীবন্ত সত্য। পরের জন্য কাঁদিয়া, পরের জন্য ভাবিয়া, পরের জন্য সর্ব্বস্ব ঢালিয়া বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন, তাঁহার বংশধর, তাঁহার প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তি, আজ ধনীর আসনে উপবিষ্ট, পিতৃ কীর্ত্তি ডুবাইয়া, ভৃত্যের তৈলসেবায় পুলকিত! বলিব কি যে, এদেশের মঙ্গল-আশা আছে? আর যাঁহারা এদেশের হিতৈষী, তাঁহারা নিজের গাড়ী সানন্দে মনুষ্য-ঘোড়ার দ্বারা চালিত হইতে দিয়া ধন্য এবং কৃতার্থ হইতেছেন!! যে শোক ক্রন্দনে পরিণত, তাহা গভীর নহে, যে আনন্দ বাহ্য-উৎসবে পর্য্যবসিত, তাহা কদাচ বিমল আনন্দ নহে। দেখিয়াছি, এক সময়ে যাহারা মনের আবেগে সানন্দে হিতৈষীর গাড়ী টানে,অন্য সময়ে তাহারাই গলাধাক্কা দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে। উহাতে

আত্মহারা হইয়া হিতৈষী নামে যাঁহারা কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা যতদিন এদেশে, ততদিন নিশ্চয় বলিতে পারি, এদেশের কোন আশা নাই। যাঁহারা দান-খাতায় টাকা লিখিয়া তাহা প্রদান করাকে অধর্ম্ম মনে করেন,—খাটাইয়া ভৃত্যের বেতন দেওয়া যাঁহারা অধর্ম্ম মনে করেন, বিদ্যাসাগর বলিতেন, যাঁহারা পিতা মাতার পরিচর্য্যাকেও অধর্ম্ম, অসভ্যতা বা অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়,মনে করেন,তাঁহারা যে দেশের হিতৈষী,যে দেশের নেতা,হায় হায়,যে দেশের আশা কোথায়? তুমি ভাই অপূর্ব্ব যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিতে পার, আমি দেখিতেছি, সকলই আশা-মরীচিকা! বিদ্যাসাগরের ন্যায় পুণ্যশ্লোক ক্ষণজন্মা লোকের সম্মান-কীর্ত্তি যেদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল না, সে দেশের সকলই আশা-মরীচিকা।

সত্য কথা বলিলে নির্যাতন কর, সহিব, জেলে পাঠাও যাইব, হত্যা কর, রক্ত ঢালিয়া দিব। তোমার ভয়ে আমি সত্য চাপা দিতে পারিব না। এমন করিয়া কখনও এদেশ উদ্ধার হইবে না। স্বার্থ নামক পদার্থটাকে বিসর্জ্জন দিতে এবং প্রেম-পুণ্যে ভূষিত হইতেই হইবে; আমি না পারি, সরিয়া দাঁড়াই, তুমি না পার অম্লান চিত্তে সাধু মহাজনদিগের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া সরিয়া দাঁড়াও। পুণ্যবান মহাত্মাদিগের অভ্যুত্থানের আশা-শলিতা ধরিয়া এস নয় ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকি; তবুও যেন মনুষ্যত্বের নামে কলঙ্ক না আনয়ন করি। যদি তুমি আর আমি কাহাকেও ভালবাসিতে না পারিলাম, কেবল প্রেমের নামে কলঙ্কই আনিলাম,তবে এস ভাই, আর অপেক্ষা না করিয়া, মৃত্যুর পথ দিয়া চলিয়া দেশকে ও সমাজকে পবিত্র করি। পুণ্যময় দেশ পুণ্যময় থাকুক, আমাদের ন্যায় অধার্ম্মিকদিগের দ্বারা যেন কখনও দেশ কলঙ্কিত না হয়। আমাদের নাম ডুবুক, কার্য্য ডুবুক, সব ডুবুক, কিছুই যেন না থাকে। আমাদের কথা ডুবুক, বক্তৃতা ডুবুক—সব ডুবুক। স্বার্থ যখন বলি দিতে পারি নাই, প্রেম-সাধনে যখন অসিদ্ধ, তখন আর কাজ কি ভাই? এস তুমি আর আমি, সকল হুজুগ ছাড়িয়া মৃত্যুর পথ দিয়া চলিয়া যাই। যাহা হওয়ার ঢের হইয়াছে—কলঙ্কের উপর কলঙ্ক, অধর্ম্মের উপর অধর্ম্ম, পাঁপের উপর পাপ; বোঝা যারপর নাই গুরুতর হইয়াছে। আশা ভরসা নাই যখন, তখন আর কেন, এস, চলিয়া যাই। এস, পলায়ন করি। এস, নিবিয়া যাই।

নব্যভারতের আশা কোথায়? আশা, প্রেম, পবিত্রতা ও দয়ায়; আশা, জাতীয় ধর্ম্ম এবং জাতীয় ভাষায়। এ সকল ছাড়িয়া,ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই দাঁড়াইয়া, কেহই, এই ঘোর নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস-বাদ প্রচারের দিনে, চরিত্র ও ধর্ম্মজীবনের পার্থক্য-সংস্থাপনের দিনে, অথবা ভিতর-বাহিরের একীকরণ-বিনাশের যুগে, অথবা চরিত্রহীন, বিশ্বাসহীন পুনরুত্থানের দিনে আশা করিতে পারেন না যে,এই ভারতে আবার জাতীয় ধর্ম্ম নামে একতার একটা সাধারণ ভূমি সৃজিত হইবে। আশা করিবার কিছু নাই, যদি কখনও হয়, তবে তাহা বিধাতার বিশেষ কৃপা মনে করিব। ধর্ম্মের অবস্থা ভারতে এখন কেমন, সকলেই জানেন। জৈনদিগের নিকট বুদ্ধদেবের নাম কর, কাণে অঙ্গুলি দিয়া বলিবে, "বাবু, এমন কথা মুখে আনিবেন না।" যেন কি ভয়ানক অপরাধের কথা! কবিরপন্থীদিগের নিকট নানকপন্থীদিগের নাম কর, চটিয়া লাল

হইবে! শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ চির-প্রসিদ্ধ কথা। খ্রীষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুর বিবাদ চিরপরিজ্ঞাত! এখন নব্যদলের মধ্যে বাকী রহিলেন, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী দল। তাঁহাদের ভিতরের গৃহ-বিবাদ, বিশ্বাসহীনতা ও চরিত্র-হীনতার কথা মনে হইলে, অথবা চাকচিক্য-ময় বিলাসিতা,রিপু-পরায়ণতা বা সাংসারিক-তার কথা ভাবিলে, পরোপকার ও স্বার্থনা-শের প্রতি অবহেলা ও ভ্রূ-কুঞ্চনের কথা স্মরণ হইলে, আশা হয় না, বিশ্বাস হয় না যে, এই ধর্ম্মসমাজ বিধাতার পবিত্র নামকে দীর্ঘকাল পবিত্র রাখিয়া,সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা পূর্ব্বক প্রেম,পবিত্রতা ও দয়ারূপ সম্মিলনের পবিত্র সূত্রে ভারতীয় অসংখ্য জাতিসমূহকে বাঁধিতে পারিবে! বোধ হয় যেন, এসমাজ দিন দিন কিছু আদর্শহীন হইতেছে। বোধ হয় যেন এসমাজ দিন দিন কিছু কিছু ধর্ম্মহীনও হইতেছে। পবিত্রতার আদর্শ খর্ব্ব হইলে, প্রেমের আদর্শ বিসর্জ্জিত হইলে, চরিত্রের আদর্শ ডুবিলে, কেবল ধর্ম্মের খোলস লইয়া কেহ বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ বা মুক্তি ধামে পৌছিতে পারে না। চরিত্র-হীনতা ও রিপু পরতন্ত্রতার পথ দিয়া, স্বার্থ-পরতা ও বিলাসিতার পথ দিয়া, ব্রাহ্মসমাজ যেন ক্রমে ক্রমে প্রেম-হীন রাজ্যে উপনীত হইতেছে! প্রেম, পুণ্য ও দয়া সাধন এখন কথায় ও বক্তৃতায়। দিন দিন এ সকল সৎগুণ কথার কথা হইয়া উঠিতেছে। প্রচারকদিগের মৌখিক প্রেমের কথায় বিশ্বাস করিয়া তুমি একথা বলিতে না চাহ, না বলিও, আমি কিন্তু আশার কোন চিহ্ন দেখি না। শ্রাদ্ধের গামছা বা ভোজনদক্ষিণার সিকি দুয়ানি পর্য্যন্ত প্রচারগণ নামিয়াছেন, বলি-তেছি না। তবে একথা ঠিক যে, তাঁহারা নীতি ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ঠিক রাখিয়া,পবিত্রতার উচ্চ আদর্শ ধরিয়া,ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষের আদর্শ ঠিক রাখিয়া চলিতে পারিতেছেন,মনে করিতে পারি না। দুপয়সা,দশ পয়সার মায়ায় না হউক, পাঁচশত বা দশ সহস্রওয়ালা লোকের মমতায় তাঁহারা প্রেমপুণ্যের কেনা বেচা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ কথা বলিতে পারি। এহেন লোকদিগের দ্বারা ভারতে একতা সাধিত হইবে, ভাই তুমি আশা করিতেছ? করিয়া বাঁচিয়া থাক; আমি কিন্তু ভাই মরীচিকায় পুড়িয়া মরিতেছি। ছাই, ছাই, চতুর্দ্দিকে কেবলই ছাই!!

আর আশা কোথায়? রাজনীতির সু-বৃহৎ ক্ষেত্র গেল, ধর্ম্মের প্রাঙ্গণ গেল, বাকী রহিল কি? নিরাশা-মন্দিরের একটুকু ক্ষুদ্র, একবিন্দু পরিমাণ স্থানে এখন আশা-শিশু খেলা করিতেছে,—একটু একটু শ্বাস টানিতেছে। এখন এই ক্ষীণ শ্বাসটুক গেলেই প্রাণটা যায়, দেশটাও রক্ষা পায়। সে স্থান-টুক—জাতীয় ভাষা। জাতীয় ভাষা একটা হওয়া চাই—নিশ্চয়ই চাই, নচেৎ জাতির রক্ষা নাই। কিন্তু আশা শিশু এখানেই বা বাঁচে কই? ছোট গাছটীকে বাঁচাইতেছিলেন সে সকল মহারথীগণ,আজ তাঁহারা কোথায়? কোথায় রামমোহন, কোথায় বিদ্যাসাগব, কোথায় অক্ষয়কুমার, কোথায় মাইকেল, কোথায় কেশবচন্দ্র, কোথায় প্যারিচাঁদ, কোথায় বিহারীলাল,কোথায় দীনবন্ধু,কোথায় রাজকৃষ্ণ, এবং আজ কোথায় বাঙ্গালা ভাষার রাজাধিরাজ বঙ্কিমচন্দ্র। এই আশা-শিশু বড় হইতে না হইতে আজ তাঁহারা কোথায়? হায় হায় হায়, প্রাণ ফাটিয়া যায়, আজ সুকু-মার শিশু সাহিত্য পরনিন্দায়, পর-হেলায়, বিদ্বেষ ও ঘৃণার উষ্ণ নিঃশ্বাসে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, কে রাখে, কে দেখে, কে

বাঁচায়? সোণার বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসনে কে বসিবে, সে চিন্তায় সকলে আত্মহারা, কেহ বঙ্কিমের ভাষার দোষ কীর্ত্তনে ও কেহ কালীপ্রসন্নের গুণকীর্ত্তনে ব্যস্ত, কেহ নবীনচন্দ্রের স্ফুট প্রতিভার মহিমা কীর্ত্তনে ও মাইকেলের প্রতিভার খর্ব্বীকরণে ব্যস্ত—কেহবা সকলের নিন্দা ঘোষণা করিয়া আপনি বড় সাহিত্যিক ধুরন্ধর বলিয়া সর্ব্বত্র মহিমান্বিত হইবার জন্য লালায়িত!! হায়রে হিংসা-বিদ্বেষ-কীট, তুই কোন্ প্রাণে এই সুকুমার আশা শিশুর নব মুকুলিত অঙ্কুর বিনাশে লালায়িত? হায় হায় হায়, শেষ আশা ঢলিয়া পড়িলে এদেশ, এজাতি বাঁচিবে কেমনে? সাহিত্যের আদর্শ আজ কাল বড়ই পরিম্লান হইতেছে। পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় সাহিত্য পরিপূর্ণ, কবি এখন অনুকরণের বাজারে বা অপহরণের বাজারে মৌলিকতার বিনিময়ে বাহ্য-চটক-ময় প্রাণহীন শিল্প-সৌন্দর্য্য খুঁজিতেছেন, প্রবন্ধ-লেখক এখন ঐ বাজারে বিজ্ঞতা ক্রয়ের ফিকিরে ঘুরিতেছেন, অথবা টাকার বাজারে এপ্রেন্‌টিসের চেষ্টায় আছেন, সমালোচক খোষামুদী বা নিন্দার বিষ উদ্গীরণের চেষ্টায় আছেন, ইতিহাস-লেখক এখন খোষামুদীর তৈল পাত্র হাতে লইয়া, স্কুলের বালকদিগের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছেন। সাহিত্যের জন্য সাহিত্য-সেবা, মৌলিক সাহিত্যের সেবা করিতেছেন—অতি অল্প লোক!! ঋণ করিয়াও, নিন্দা-ভাজন হইয়াও আদর্শ সাহিত্যের সেবা করিতে হইবে, এদেশের ভাবী উন্নতির বীজ ইহারই মধ্যে নিহিত—না করিলে চলে না, এরূপ ভাব সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ না হইলেও, এরূপ ভাবেই বা সাহিত্যের চর্চ্চা করে কয় জন? সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ—সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও ধর্ম্ম-নীতি-পিপাসা চরিতার্থ করা! সে আদর্শ আজ কাল বড় একটা দেখি না। সাহিত্যেও ব্যবসাদারী ঢুকিয়াছে! সাহিত্যে বিজ্ঞাপন-কুহক প্রবেশ করিয়াছে। সাহিত্যিকগণও আজ প্রশংসা ও সম্মানের কাঙ্গাল। তাঁহারা দেশ চালাইবেন কি, বিবিধ প্রকারে দেশ আজ তাঁহাদিগকে চালাইতেছে। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় যে, মানুষ পুস্তক লিখিয়া আবার প্রশংসার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়? কেন বাপু, যদি তোমার এতই দুর্দ্দশা হইয়া থাকে, এতই গৌরবের কাঙ্গাল হইয়া থাক, স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লেখ, ক্ষমতা না থাকে, দশ জনের পুস্তক হইতে দশটা গল্প তুলিয়া কীর্ত্তি রাখ—একটু তোষামোদ করিতে পারিলেই বা কিছু ঘুষ দিতে পারিলেই তোমার নামের কীর্ত্তিটা থাকিবে, দশটা টাকাও পাইবে। আদর্শ সাহিত্য-সেবকেরা কি চান? লোকের প্রশংসাও না, নিন্দাও না; তাঁহারা প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসক, নীতির উপাসক—প্রশংসা-নিন্দা-নিরপেক্ষ। সাহিত্য-সেবক প্রশংসা-নিন্দা-নিরপেক্ষ হইলে তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যের উদয় হয়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম এক দিনের জন্যও প্রশংসা-লালায়িত হন নাই। প্রশংসা-লালায়িত হন নাই, রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিহারীলাল ও বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহাদের বিমল সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্যে আজ চতুর্দ্দিক পূর্ণ। আজ সাহিত্যের নেতৃত্ব পদের আশায় বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ বঙ্গবাসীর প্রশংসার জন্যও লালায়িত!! পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক জীবন মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িলেও আমরা ইহাপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইতাম না। আর বলিব কি? বলিতে লেখনী লজ্জায় অভি-

ভূত হয়, মহা প্রতিভাশালী, পূর্ব্ব গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র নবীনচন্দ্র, পুস্তকের সমালোচনার জন্য আজ দ্বারে দ্বারে ভিখারী! নব্যভারতে তাঁহার নাকি কি নিন্দা ঘোষণা করা হইয়াছে, এজন্য তিনি নব্যভারতের প্রতি বিরক্ত! এই বিরক্তি, নব্যভারতের অনুকূল বন্ধুদিগের ভালবাসা ও অনুরাগ-সিংহাসন টলাইতে পত্রের মস্তকে চড়িয়া চতুর্দ্দিকে নাকি ঘুরিতেছে!! ইহাতে নবীন চন্দ্রের প্রতিভা বাড়িতেছে, না কমিতেছে, না বুঝিয়া আমরা অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি, এদেশের হইল কি? নবীনচন্দ্রের প্রতিভার জয় ঘোষণা করিবার জন্য অথবা প্রতিভা প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশে আসরে নামিলেন শেষে একজন বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতের নবজাত শিশু। এইরূপ আত্মমর্য্যাদাহীন প্রশংসা-ব্যাকুলতা দেখিয়া আমরা ভাবিতেছি, নবীন চন্দ্র তবে কি প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি নহেন? যদি তাহা না হন, তবে এদেশের সাহিত্যের আশা কোথায়?

হেমচন্দ্র এক প্রকার সাহিত্য-জগত হইতে বিদায় লইয়াছেন। চন্দ্রনাথ এখন স্কুলের পাঠ্য লিখিতেছেন, অক্ষয় চন্দ্র নির্জ্জন সাধন করিতেছেন, এবং যোগেন্দ্রনাথ গবর্ণমেণ্টের দাসত্বে বিব্রত। যাঁহাদের নিকট অনেক আশা, এইরূপ এক এক করিয়া দেখি, সকলেই দূরে দূরে যাইতেছেন। পূর্ব্ব যুগের সমস্ত পত্রিকা গিয়াছে, গত বৎসর নবযুগের অতি গৌরবের "সাধনা" উঠিয়া গিয়াছে, জন্মভূমি দারুণ ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছেন। ভারতীর ভার কন্যাদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করিয়া আদর্শ মহিলা দেবী স্বর্ণকুমারী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন। প্রেম, পবিত্রতা ও দয়া এ বঙ্গে জাগাইবে কে, ভাবিয়া ঠিক পাই না।

আদর্শ সাহিত্যের জন্য সাহিত্য-সেবা আমরা দেখিতে চাই। নীতিমূলক মৌলিক সুকুমার সাহিত্য দেখিতে চাই। সেই আশা লইয়া নব্যভারতের জন্ম। সেই আশা এখনও ইহাকে সজীব রাখিয়াছে। কিন্তু আশা-শিশু নিরাশার মন্দিরে এখন যারপর নাই মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে, শিশু বাঁচিবে কিনা, কে জানে!! যদি না বাঁচে, তবে আমরা বলিতে পারি, নব্যভারতও সহানুভূতি ও সাহায্য অভাবে মৃত্যু-মুখে ছুটিবে! অথবা নব্যভারত যে অধীনতার ঘোর তিমিরে, সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকিবে!! বিধাতার বিধানে কি আছে, তিনিই জানেন। আমরা নিরাশার মন্দিরে আশা-শিশুকে মৃতপ্রায় দেখিয়া কেবল বিধাতাকে স্মরণ করিতেছি। তাঁহার কৃপা বর্ষিত হউক, নচেৎ রক্ষা নাই, নচেৎ আর রক্ষা নাই।

ভারত, মিসর ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। (১)

ধনধান্য-পূর্ণ ভারতীয় ঐশ্বর্য্যের যশ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই যশে আকৃষ্ট হইয়া সেকালে আরব্যোপসাগর-কূলনিবাসী জাতিগণ ভারতবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বালুকাময় মরুদেশ তাহাদের কোন বাধা-বিপত্তি ঘটাইতে পারে নাই। উষ্ট্রের সাহায্যে সেই মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তাহারা পণ্যদ্রব্যজাত ভারত হইতে লইয়া আসিত। পুরাতন বাইবেলে লিখিত আছে যে, ভারতোৎপন্ন দ্রব্যাদি অনেক দূরবর্ত্তী দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক আনীত হইত :—

"And they sat down to eat bread; and they lifted up their eye and looked; and

behold, a company of Ishmaelites came from Gilead with their camels bearing Spicery and Balm and Myrrh, going to carry it down to Egypt."
Genesis XXXVIII. 25

"এবং তাহারা রুটি খাইতে বসিয়াছিল ; তৎপরে চক্ষু তুলিয়া দেখিল ; এবং দেখিতে পাইল, একদল ইস্মেলাইট মসলা, ঔষধি এবং নানাবিধ সুগন্ধী দ্রব্য উষ্ট্রযানে লইয়া গাইলিয়ড হইতে আসিতেছিল। সেই সমস্ত পণ্য দ্রব্য তাহারা ইজিপ্টে লইয়া যাইতেছিল।"

কিন্তু শুদ্ধ উষ্ট্রের সাহায্যে এত দূর-দেশীয় বাণিজ্য-ব্যবসা চালান বড় সহজ কথা নহে। অনেক কাল এইরূপ ব্যবসায়ে থাকিয়া বণিকেরা দেখিল যে, তাহা অতি কষ্টসাধ্য এবং তাহাতে অনেক বিপৎপাতও হয়। ভাবিল, অন্য কোনরূপে এই বাণিজ্য চালাইতে পারিলে সুবিধা হইতে পারে। তখন তাহারা মহাসমুদ্র ও নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, সমুদ্র তাহাদিগকে তরঙ্গ তুলিয়া যেন হস্তোত্তলন করিয়া ডাকিতেছে। নদী বহিয়া যাইবার সময় যেন বলিয়া যাইতে লাগিল, এই পথ দিয়া আইস, আমি তোমাদিগকে ভারতোপকূলে লইয়া যাইব। তাহারা সামান্য সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত সামান্য সামান্য নৌকা প্রস্তুত করিত। সেই নৌযানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কিরূপে বড় বড় অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, তাহার উপায় দেখিতে লাগিল। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই ; বহু পরিশ্রমে তাহারা বৃহৎ বৃহৎ পোত প্রস্তুত করিল। তৎপরে বহুদর্শন আসিয়া সহায়তা করাতে তাহাদের সামুদ্রিক বাণিজ্যে আর কোন অসুবিধা রহিল না।

তাহাদের দেখা-দেখি ভূমধ্য-সাগরের উপকূল-নিবাসী জাতিসমূহও সেই বাণিজ্য ব্যবসায়ে ক্রমে ক্রমে মাতিয়া উঠিল। সেই জাতিসমূহ দেখিল, আমাদের এই সাগরোপকূলে তিন মহাদেশ অবস্থিত—ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এসিয়া। এই সামুদ্রিক বাণিজ্যে ইজিপ্ট-বাসিগণও যোগ দিয়াছিল। ইতিহাসবেত্তা বলিতেছেন :—

"We find accordingly, that the first voyages of the Egyptians and Phœnicians, the most ancient navigators mentioned in history, were made in the Mediterranean. Their trade, however, was not long confined to the countries bordering upon it. By acquiring early possession of ports on the Arabian gulf, they extended the sphere of their commerce, and are represented as the first people of the West who opened a communication by sea with India."
W. Robertson on Ancient India.

"এজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, ইজিপ্ট এবং ফিনিসিয়া-বাসিগণ ইতিহাসে অতি প্রাচীনকালীন নাবিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা প্রথমে ভূমধ্যসাগর মধ্যেই নিজ ব্যবসা কার্য্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহাদের সেই ব্যবসা কেবল সেই সাগরোপকূলস্থ নগরসমূহে বহুদিন আবদ্ধ থাকে নাই। আরব্যোপসাগরের কূলে কতিপয় বাণিজ্যোপযোগী স্থান তাহাদের হস্তগত হওয়াতে, তাহাদের বাণিজ্য বিস্তৃত হইল এবং তদবধি ইতিহাস-বেত্তাগণ বলেন, সেই পাশ্চাত্য জাতি ভারতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের প্রথম সূত্রপাত করেন।"

এই বাণিজ্যহেতু ভারতের ধনে সিডন এবং টায়ার (Sidon and Tyre) ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ডেভিড এবং সলমনের (David and Solomon) রাজত্বকালে ইহুদীজাতিও সেই বাণিজ্যে নামিয়াছিলেন। কথিত আছে, সলমন তদ্দ্বারা প্রভূত ধনরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, সেই প্রাচীনকালে ফিনিসিয়ানেরা এবং সমস্ত গ্রীকজাতি এক "Ionians" নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। একজন ফরাসী ইতিহাসবেত্তা বলিতেছেন :—

"I will merely, therefore, remark here, that the Hellenic races were known to the East, in the olden times, by the name of Ionians For the Javan of Scripture, when read according to the letters, is merely Iun, and occurs in Joel"

Egypt's place in Universal History By Baron Bunsen — Vol I B I Sec II

"এজন্ত এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইল যে, সমগ্র প্রাচ্যদেশে সমুদায় হেলেনিক জাতি আয়োনিয়ান নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ, ধর্ম্মগ্রন্থে যাহাকে যবন বলে, তাহা আর কিছুই নহে, জোইলোক্ত "আযোন' শব্দ মাত্র।

নিজ ইজিপ্টেও গ্রীকেরা Ionians বা Javan যবন বলিয়া পরিচিত ছিল। ভারতেও তদ্রূপ। এই যবনদিগের সহিত যাহারা যাহারা ভারতে যাইত, সকলেই এক যবন নামে অভিহিত হইত। এই যবনেরা, কি স্থলে, কি জলে, দুই পথেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের সহিত আরবেরাও মিলিত হইয়াছিল। এই দেখুন, ঐতিহাসিক কি বলিতেছেন :—

"Besides the maritime range of Tyre and Sidon, their trade by land in the interior of Asia was of great value and importance They were the speculative merchants who directed the march of the caravans laden with Assyrian and Egyptian products across the deserts which separated them from Inner Asia—an operation which presented hardly less difficulties, considering the Arabian depredators whom they were obliged to conciliate and to employ as carriers, than the longest coast voyage"

Grote's History of Greece, Part II Chap XVIII

"সিডন এবং টায়ারের সুবিস্তৃত জলপথের বাণিজ্য ব্যতীত আয়োনিয়ানেরা স্থলপথে মধ্য-এসিয়ায় যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, তাহাও কিছু সামান্ত নহে। তাহাদের স্বদেশ এবং মধ্য-এসিয়ার মধ্যে যে সুবিস্তীর্ণ মরুদেশ অবস্থিত, সেই মরুদেশ দিয়া এসিরিয়া এবং ইজিপ্ট দেশোৎপন্ন দ্রব্যভার উষ্ট্রপৃষ্ঠে লইয়া মহাব্যাপার চালাইত। সুদূর জলপথে যত কষ্ট, তদপেক্ষা এই স্থলপথীয় ব্যবসা তত কষ্টসাধ্য ছিল না। তাহার কারণ, যাহারা কষ্ট দিবার পাত্র সেই আরবীয় দস্যুগণই কার্য্য চালাইবার জন্ত বৃত্তিভোগীরূপে নিযুক্ত হওয়াতে তাহাদের ধনলিপ্সা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।"

স্থলপথের ব্যবসাবলম্বন করিয়া যবনেরা যেমন ভারতের উত্তরাঞ্চলে যাইত, জলপথেও অনেকে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে যাতায়াত করিত। এই বাণিজ্যসূত্রে যবনেরা শুদ্ধ যে, ভারতে আসিত,এমত নহে, এখানে ব্যবসা চালাইবার জন্ত অনেকে বাস করিত। এই হেতু আমরা দেখিতে পাই, মহাভারতে ভারতের উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন স্থান যবনপুর নামে অভিহিত হইয়াছে। সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সহদেব দক্ষিণদিকে দিগ্বিজয়ে গিয়া :—

"পাণ্ড্য, দ্রবিড় উড্রকেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ উষ্ট্র, কর্ণিক, রমণীয়া, আটবীপুরী ও যবনপুর দূত দ্বারা নিজায়ত্ত করিয়া করসংগ্রহ করিলেন।"

নকুল খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে বিনির্গত হইয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি সমস্ত দেশ হইতে কর সংগ্রহ করিয়া :—

"পরিশেষে সাগরগর্ভস্থ পরম দারুণ ম্লেচ্ছপহ্নব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে বশীভূত ও তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট অন্যান্ত পার্থিবদিগকে জয় করিলেন।"

গ্রোট যবনদিগের জলপথের বাণিজ্য ব্যাপারের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

"Such was the state of the Greeks as traders at a time when Babylon combined a crowded and industrious population with extensive commerce, and when the Phœnician merchant ships visited in one direction the Southern coast of Arabia, perhaps even the island of Ceylon—in another direction the British Islands."

Part I Chap. XX.

"যে সময়ে ব্যাবিলনের পরিশ্রমী লোকারণ্য বিস্তৃত

বাণিজ্যে সংযুক্ত হইয়াছিল, যে সময়ে ফিনিসীয় বাণিজ্যপোত একদিকে আরবের দক্ষিণকূল এবং সম্ভবতঃ সিংহলদ্বীপ, অন্যদিকে ব্রিটিস দ্বীপ পর্য্যন্ত যাইত, সেই সময়ে বণিকব্যবসায়ী গ্রীকজাতির অবস্থা এইরূপ।"

সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত যে, যবনেরা যাইত, গ্রোটও একথা বলিতেছেন। এই যবনেরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও দেখা দিয়াছিল। আশ্বমেধিক পর্ব্বে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় বর্ণনস্থলে মহাভারত বলিতেছেন ঃ—

"পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কিরাত, যবন, ম্লেচ্ছ ও আর্য্যপ্রভৃতি যে সমুদায় ধনঞ্জয় পরাজিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।"

মহাভারতের সময় ধরিলেও যবনেরা অনেককাল হইতে ভারতের সংস্রবে আছে বলিতে হইবে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ঃ—

"সগর রাজা স্বীয় গুরু ঔর্ব্বঋষির বাক্যে তালজঙ্ঘ যবন, শক, হৈহয় এবং বর্ব্বরদিগের প্রাণবধ করেন নাই, বিকৃতবেশী করিয়াছিলেন।"

এই সগর রাজার কথা রামায়ণে উক্ত আছে বটে, কিন্তু রামায়ণে যবনের উল্লেখ নাই। এমন কি, সুগ্রীব যখন সীতান্বেষণের জন্য বিনত নামা বানরকে সম্বোধন করিয়া ভারতের সমস্ত ভৌগলিক বিবরণ দিতেছেন, তখনও তাহার মুখে যবনের নাম উক্ত হয় নাই। তাহাতেই প্রতীত হয়, রামায়ণের সময় ভারত যবন-সংস্রবে আইসে নাই। মহাভারতের কাল অথবা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে তাহার যবন স্পর্শ ঘটিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ;—

"রাজা ভরত দিগ্বিজয় করিতে গিয়া কিরাত, হূণ,যবন, পৌণ্ড্র,কঙ্ক, খশ, শক এবং অন্যান্য অব্রহ্মণ্য নৃপতি ও সমস্ত ম্লেচ্ছ জাতিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।"

কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটকেও আমরা রঙ্গভূমিতে একজন "যবনিকার" প্রবেশ দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণে যবনের কথা এই রূপ উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

"পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
২অংশ ৩অধ্যায়—৮।

"এই ভারতের পূর্ব্বভাগে কিরাতগণ এবং পশ্চিমে যবনেরা আছে।"

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যবনেরা অনেক কাল পূর্ব্বে ভারতে উদয় হইয়াছিল। তখন মহম্মদ বা মুসলমানের নাম গন্ধও ছিল না। মহম্মদের কথা দূরে থাক, তখন খ্রীষ্টেরও জন্ম হয় নাই। তখন আরবেরা মুসলমান নহে। সুতরাং গ্রীকজাতি সমূহ পূর্ব্বকালে যে যবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই যবনেরা বহুকাল হইতে ভারতে যাতায়াত করিত। এক্ষণে মিসরের কথা।

এই যবনেরা যাহাকে ইজিপ্ট বলিত,তাহার প্রকৃত নাম মিসর ছিল। ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, ইজিপ্টের হিব্রু নাম Mizraim. মিজ্‌রেমের অর্থ মিসরদ্বয়। কারণ,পূর্ব্বে মিশর দেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—উচ্চ এবং নিম্ন মিসর। রাজা Menes এর সময় উক্ত রাজ্যদ্বয় একচ্ছত্র হইয়া মিজরেম নাম ধারণ করিয়াছিল। বাইবেলে হিব্রু ভাষায় এই মিজরেমের কথাই উল্লেখ আছে। এই দেখুন Bunsen কি বলিতেছেন ঃ—

"The Mythological System which we meet with at the first dawn of the empire of Menes, owes its existence therefore, in the primeval time, to the amalgamation of the religion of Upper and Lower Egypt. This however means nothing more than that it originated in the same manner as the empire of Menes, which owed its existence to the union of two *Misr*, by which process it became Mizraim and took its place in history."

অন্যত্র :—

"The Hebrew name of Egypt, Mizraim *i. e.* the two Misr, contains a similar allusion."

যে গ্রীকজাতি মিসরের নাম ইজিপ্ট দিয়াছিল, হিব্রুবাইবেল গ্রীকভাষায় অনুবাদ সময়ে তাহারাই মিসরকে ইজিপ্ট নামে অভিহিত করিয়াছেন। হোমরের সময় হইতেই মিসর দেশের নাম ইজিপ্ট হইয়াছিল। Odysseyর চতুর্থ সর্গে মেনেলিয়সের বৃত্তান্তে প্রতীত হয় যে, হেলেন যখন প্যারিসের সঙ্গে সমুদ্র দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি এক প্রবল ঝটিকাঘাতে নীল নদের ধারে আনীত হন। তখন সেই নদের নাম ইজিপ্টস Egyptus বা স্বর্ণদীছিল। তদবধি সেইদেশ ইজিপ্ট বলিয়া হোমর এবং গ্রীক জাতির নিকট পরিচিত হয়। গ্রীকবিশ্বার প্রচারের সহিত ইউরোপময় মিসর ইজিপ্ট নামেই প্রসিদ্ধ হয়।

হিব্রুভাষায় মিসর (Misr) নাম যেমন প্রসিদ্ধ, প্রাচীন আরব গ্রন্থেও তেমনি। সেই মিসর নামেই ইজিপ্ট উক্ত হইয়াছে। সেই জন্য মুসলমান রাজত্ব কালে ভারতেও ইজিপ্ট, মিসর বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে। সেইদেশ হইতে যে দ্রব্য ভারতে আনীত হইত,তাহার নাম আজিও "মিস্‌রী" (মিশ্রী) রহিয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের শুধু যে ধনগৌরব দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, এমত নহে, জ্ঞানেও তাহার যশসৌরভ চারিদিক বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহুদীজাতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী নৃপতি এজন্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন:—

"The wisdom of all the children of the East country."—1. Kings—IV—30.

ধন, মান ও জ্ঞানে ভারত তখন অদ্বিতীয়। তাই সেই যশে আকৃষ্ট হইয়া প্রসিদ্ধ মিসর সম্রাট ওসিরিস (Osiris) দিগ্বিজয় কালীন ভারতে আসিয়াছিলেন। তথায় তিনি নাইসা (Nysa) নামক রাজ্য স্থাপন করিয়া যান। এই দেখুন ইতিহাসবেত্তা কি বলেন :—

"In India he (Osiris) built Nysa in honour of Nysa in Arabia, not far from Egypt, where, as the heir of Zeus, he had received an education conformable to his rank."—Bunsen.

সম্ভবতঃ এই নাইসা নগরই যবনরাজ্য ; কারণ, সেকালে কি আরব, কি গ্রীক, কি মিসরবাসী সকলেই এক যবননামে অভিহিত হইত। আমরা বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতে পাই, পুরুবংশে আটজন যবনরাজ হইয়াছিলেন।

"ততঃ ষোড়শ শকাভূভুজোভবিতারঃ। ততশ্চ অষ্টৌযবনাঃ।"

বিষ্ণুপুরাণ—৪র্থ অংশ—২৪অ-১৪।

অনন্তর ষোলজন শকবংশীয়, তৎপরে আটজন যবনরাজা হইবে।

এস্থলে বোধ হয়, ওসিরিস-প্রতিষ্ঠিত যবন নগরের কথারই উল্লেখ হইয়া থাকিবে।

সে যাহা হউক, যে সময় হইতে ভারতে যবনেরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে সময়ে ভারত ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানে সম্পন্ন হইয়া সভ্যতার চূড়ান্ত শিখরে উঠিয়াছিল। বিদেশিগণ ভারতে আসিলেই তাহার এই সভ্যতায় আকৃষ্ট হইত। কারণ, ভারতে সকলই নূতন ; তাহার লোক সমাজ নূতন ধরণে গঠিত ; তাহার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, পূজা পদ্ধতি—সকলই বিদেশীর চক্ষে নূতন। সেই পুরাতন জনসমাজে নূতন কথা ও ধর্ম্মের নূতন মত অনেক শুনা যাইত। জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্টবাদ, কর্ম্মফলবাদ, প্রভৃতি বৈদিক মত এবং হিন্দু দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, সকলই বিদেশিগণের চক্ষে নূতন ও বিস্ময়কর। যাহা কেহ কখন শুনে নাই, যাহা শুনিতে অতি মধুর, তাহা ভারতে ছিল। মহা মহা মুনি ঋষি ও যোগিগণ

সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে অতি মনোহর বেশে এবং পবিত্র মূর্ত্তিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত দেখিয়া কোন্ বিদেশী না মোহিত হইবে? বিশেষতঃ তখনকার কালে ধর্ম্মানুষ্ঠান অনেকেই সাত্ত্বিকভাবে করিতেন। এখনকার মত প্রাণশূন্য বাহ্যাড়ম্বর ও রাজসিক ব্যবহারের তত গৌরব বৃদ্ধি হয় নাই। সুতরাং সেই পূজা পদ্ধতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে মোহিত হইয়া যবনেরা,আরব এবং মিসরবাসিগণ তাহাদিগকে স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। ওসিরিস ভারত হইতে গিয়া স্বদেশে মিসর ধর্ম্মের সূত্রপাত করেন। তাই পুরাতন মিসর, আরব এবং গ্রীসদেশে ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্মতন্ত্রের (Mythology) প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ভারতে যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ প্রধান জাতি ছিলেন,গ্রোট বলেন, মিসরেও তদ্রূপ পুরোহিত এবং রণদক্ষ জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তৎপরে ব্যবসাবলম্বী বৈশ্যজাতি। ধর্ম্মের তুলনা করার এস্থান নহে, নহিলে আমরা দেখাইতে পারিতাম,পুরাতন আরব,গ্রীস ও মিসরীয় ধর্ম্মতন্ত্রের সহিত ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্মতন্ত্রের কতদূর সাদৃশ্য।

ভারতীয় সভ্যতা যত প্রাচীন, গ্রীস ও মিসরীয় সভ্যতা তত নহে। এই দেখুন, জর্ম্মন দার্শনিক Frederick Schlegel এর মত কিঃ—

"The Egyptian problem seemed at last to be solved The civilzation of Egypt was derived from Meroe (Ethiopia) that of Meroe incotestably from India."
Baron Bunsen.

ইথিয়োপিয়ার সভ্যতা যখন ভারতীয় সভ্যতা হইতে সমুৎপন্ন এবং ইথিয়োপীয় সভ্যতাই মিসরীয় সভ্যতা রূপে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা যে, কোথা হইতে আসিল, এ প্রশ্নের সমাধান হইতে আর বাকী রহিল না।

জনশ্রুতি প্রাচীন ইতিবৃত্তের প্রধান উপকরণ। এই জনশ্রুতি অনুসারে Diodorus Siculus প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মিসরের ইতিহাস সংগ্রহ করেন। সেই ইতিহাসের গণনায় প্রতিপন্ন যে, মিসরীয় সভ্যতাও অত্যন্ত প্রাচীন—ভারতীয় সভ্যতার মতই প্রাচীন। কিন্তু Bunsen দেখাইয়াছেন যে, মিসরবাসিগণের বর্ষগণনা স্বতন্ত্র ছিল। সৌর ও চান্দ্রমাস ধরিয়া প্রাচীন মিসরে বর্ষগণনা হইত না। তথায় ঋতুপরিবর্ত্তনে যেমন নীলনদের মূর্ত্তিভেদ হইত, সেই মূর্ত্তিভেদ ধরিয়া কালনির্ণয় হইত। সুতরাং ঋতু পরিবর্ত্তন অনুসারে মিসরে বর্ষগণনা হইত। আমাদের যাহা একবৎসর, মিসরগণের তাহা দশ বৎসর। এইরূপে মিসরীয় সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মিসরের বর্ষগণনা হইতে দশক বাদ দিলে আর তত প্রাচীন বোধ হইবে না। ঐতিহাসিক Bunsen এর প্রমাণ পদ্ধতি এত বিস্তৃত যে, তাহা এস্থানে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

সে যাহা হউক, মিসরে যখন ভারতীয় ধর্ম্মতন্ত্রের অনুরূপ ধর্ম্মতন্ত্র প্রচলিত, তখন জুডিয়ার অনেক অগ্রগণ্য লোক মিসরে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। সেই সময় মোসেস (Moses) মিসর-ধর্ম্মে বিশিষ্টরূপে শিক্ষিত হন। তৎপরে তিনি মিসর হইতে স্বদেশবাসিগণকে লইয়া কেমন করিয়া তথা হইতে পলাইয়া আসেন, তাহা তদুক্ত প্রাচীন বাইবেলেই বিবৃত হইয়াছে। স্বদেশে আসিয়া তিনি ইহুদী-ধর্ম্মের পত্তনস্বরূপ পুরাতন বাইবেলের প্রথম পাঁচখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ লিখিয়া যান। তাহাই চিরকাল ইহুদীধর্ম্মে Law বলিয়া সম্মানিত ও অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। মোসেসের প্রসিদ্ধ দশ-আজ্ঞা (Ten

Commandments) মিসর ধর্ম্মের বিয়াল্লিশ আজ্ঞারই সারসংগ্রহ। নিজে পাদ্রী Hoare সাহেব তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, মিসর ধর্ম্মের সার-গর্ভ উপদেশ সকল ইহুদী ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি *। মিসরধর্ম্ম যখন ভারতীয় মূল বৈদিক ধর্ম্ম হইতে সমুথিত, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, পরম্পরা সম্বন্ধে পুরাতন বাইবেলের ভিত্তি-ভূমি ভারতীয় ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। এক মাত্র বৈদিক ধর্ম্মই মূল ধর্ম্ম; অপরাপর সমস্ত ধর্ম্ম তাহারই শাখা মাত্র। মতামত সকল পর্য্যালোচনায়ও একথার যাথার্থ্য প্রতি-পাদিত হয়।

মোসেসের পঞ্চ গ্রন্থ হইতে সমুদায় পুরাতন বাইবেলের সৃষ্টি; অন্যান্য গ্রন্থাবলী তাহারই বিস্তার মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের দেব দেবীর অর্চ্চনা পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যেমন হিন্দু-ধর্ম্মের শাখা বৌদ্ধধর্ম্মের স্বতন্ত্রতা ও সৃষ্টি, মিসর ধর্ম্মের দেব দেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তেমনি মোসেসের ধর্ম্মপ্রণালীর স্বতন্ত্রতা ও সৃষ্টি। হিন্দুধর্ম্মের ভক্তি-পথের রস গ্রাহী হওয়া সহজ কথা নহে; এজন্য সকলে তাহার মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হয়েন না। অনেকে স্বর্গের সোপানকে স্বর্গ বলিতে চান না, এজন্য দেব-দেবীর উপাসনাকে অলীক বলিয়া জ্ঞান করেন। মোসেস এইরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হইয়া মিসর ধর্ম্মের দেব-দেবীর উপাসনা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম জ্ঞানমূলক; সেই জ্ঞান মিসরধর্ম্মে প্রতিভাত হয় নাই, এমত নহে। কারণ, মোসেসের ধর্ম্মতন্ত্রেও তাহার পরিচয় আছে। এই জ্ঞান দ্বিবিধ—ঐন্দ্রিয়িক বা মায়িক জ্ঞান এবং পরম বা অধ্যাত্ম জ্ঞান। মোসেসের ধর্ম্মতন্ত্রে আমরা যে Paradise এর আভাস পাই, তাহাতেই এই দ্বিবিধ জ্ঞানের বিলক্ষণ নিদর্শন দেখিতে পাই। যে জ্ঞান পাপপুণ্যবিরহিত, যাহা মনুষ্যের দেবত্ব, দেবতার সহিত যাহার ঘনিষ্টতা, সেই জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এড্যাম এবং ইভ সৃষ্ট হইলেন। যত দিন এড্যাম এবং ইভ এই জ্ঞানে জ্ঞানী, তত দিন তাহাদের আনন্দ-সম্ভোগ (Paradise ভোগ)। সেই জ্ঞান-সম্পন্ন এড্যাম এবং ইভের পাপ নাই পুণ্য নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, শত্রুতা নাই, মিত্রতা নাই, কেবলই দেবত্বের আনন্দ, ভোগ। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন করিয়া যখন তাহাদিগের মায়িক জ্ঞান জন্মিল, তখন তাহাদের অন্তরে ভেদজ্ঞান সঞ্জাত হইল। এই ভেদজ্ঞান সঞ্জাত হওয়াতে ইভ লজ্জাবস্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনার নগ্নতা আবৃত করিলেন।

মোসেসের ধর্ম্মে পরমজ্ঞানকে Innocence বলিয়াছে; তাহার কারণ এই, অন্যে ভেদ-জ্ঞানরহিত পরমজ্ঞানীকে জ্ঞানশূন্য মূঢ় বলিয়াই বোধ করে। ব্রহ্মদর্শী শুকদেব এইরূপ অন্য কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শুকদেবের বৃত্তান্ত পড়িলে মোসেসের Paradise এর অর্থ বিশদ হইয়া আসিবে।

"শুকদেব পরমযোগী, ব্রহ্মদর্শী ও ভেদজ্ঞানবিহীন। তাঁহার বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই ধাবিত হইত না। তিনি মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন নহেন, সেই জন্য অন্যে তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য মূঢ় বলিয়া বোধ করে। শুনিয়াছি, যে সময়ে তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া উলঙ্গবেশে বনগমন করেন, তৎকালে পথি পার্শ্বস্থ কোন সরোবরে কতকগুলি অপ্সরা ক্রীড়া করিতে-

* See "Religion of the Ancient Egyptians" in the Nineteenth Century, December 1878, by the Reverend John Newnham Hoare.

ছিল। নগ্ন শুকদেবকে দেখিয়া তাহারা কিছুমাত্র লজ্জিত হয় নাই। কিন্তু যখন ব্যাসদেব পুত্রের অনুসরণ করে পরক্ষণেই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন যুবকামিনীগণ উত্থান পূর্ব্বক আস্তে ব্যস্তে নিজ নিজ বসন পরিধান করিল। মহর্ষি তাহাতে বিস্মিত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, একপ বিচিত্র আচরণের কারণ কি? তোমরা শুককে উলঙ্গ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইলে না; কিন্তু আমাকে বসনাবৃত দেখিয়াও লজ্জিত হইলে? তাহারা উত্তর করিল, ঋষে, আপনার স্ত্রীপুরুষ বলিয়া ভেদজ্ঞান আছে; কিন্তু আপনার পুত্র শুকের তাহা নাই। আপনার ভেদজ্ঞান থাকাতে আপনি বসনাবৃত হইয়াছেন এবং আমরাও আপনাকে দেখিয়া বসনাবৃত হইলাম"।

হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ ভেদজ্ঞানরাহিত্যই Innocence। যখন এই চরমাবস্থায় মনুষ্য উপনীত হয়, তখন তাহার পাপপুণ্য ও কর্ম্মের ফলাফল বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই তাহার মুক্তাবস্থা। এইরূপ মুক্তাবস্থাই মোসেসের Paradise এবং এড্যাম ও ইভের Innocence. কিন্তু মানবের যতক্ষণ ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ তাহার অহংজ্ঞান বর্ত্তমান। এই অহংজ্ঞান লইয়া আত্মার জীবত্ব। প্রধানা-প্রকৃতি বা অনন্ত মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব সমুদ্ভূত। অহঙ্কারতত্ত্বই অনন্ত প্রকৃতি হইতে জীবের জীবত্ব দান করে। জীব-সৃষ্টি হইতে সুতরাং অহঙ্কারের সৃষ্টি? অহঙ্কারের সৃষ্টি হইতে মায়াজ্ঞান ও পাপপুণ্যের সৃষ্টি। এই সৃষ্টি-রহস্যকে মোসেসের ধর্ম্মে এড্যামএবং ইভের পতন বলিয়া প্রতীত হয়; তাহাই আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম্মে Doctrine of original sin বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যখন জীব সাধনাবলে পাপপুণ্যের ফলাফল হইতে মুক্তিলাভ করে,তখনই তাহার সংসারে যাতায়াত ঘুচে, তাহার জীবত্বের মোচন হয়; জীব তখন মুক্ত। বৈদিক ধর্ম্মের মুক্তিবাদ মিসর ধর্ম্ম দিয়া ইহুদা ধর্ম্মে, এবং ইহুদী ধর্ম্ম দিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে গিয়া তাহা যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখাইলাম। বৈদিক মূলতত্ত্ব ঠিক একই আছে। বুঝিবার দোষে তাহা অন্য রূপ ধারণ করিয়াছে।

মোসেস এইরূপ অনেক বৈদিক তত্ত্ব মিসর ধর্ম্ম হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া স্বপ্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থাবলিতে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। তিনি দেবদেবীর অর্চ্চনা গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু সেই দেবদেবীর অর্চ্চনা মধ্যে যে মানসিক সূক্ষ্ম সাকার উপাসনা আছে, মোসেস তাহা গ্রহণ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম প্রণালীতে সমাবিষ্ট করিয়াছেন। কালক্রমে মোসেসের ধর্ম্ম যখন বাহ্যাড়ম্বরপরিপূর্ণ হইয়া প্রাণশূন্য হইল, তখন সেই ধর্ম্মে প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য একজন ধর্ম্মসংস্কারকের প্রয়োজন হইল। ইহুদা ধর্ম্মে যিনি নূতন জীবিত ভাব দিয়া তাহাকে নূতন আকারে দেখাইয়াছেন, তাহার নাম যীশু। তিনি নূতন-ভাব সঞ্চারিত করিয়া ইহুদী ধর্ম্মের যে নূতন আকার দিয়াছেন, তাহাই নূতন বাইবেলের বিষয়। কিন্তু যীশুর এই সঞ্জীবনী শক্তিও যে বৈদিকধর্ম্ম প্রণোদিত, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শন করিতেছি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

বিদেশী বাঙ্গালী। (২)

সনাতন গোস্বামী।

দিল্লীর মুসলমান সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আওরাঙ্গজেব্ যখন হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশের ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, ঠিক যে সময়ে মধ্য-ভারতে মহারাষ্ট্রীয়গণ একত্র হইয়া ভারতভূমি হইতে ম্লেচ্ছ মুসলমানের নাম নিশান পর্য্যন্ত লোপ করিয়া, আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের প্রস্তাব করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে,পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মথুরার যমুনাতটস্থিত এক পর্ণ কুটীরে বসিয়া বাঙ্গালী বৈরাগী সনাতন গোস্বামী, ভারতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম স্থাপন, হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা এবং মুসলমান অত্যাচারের নাশ জন্য, হিন্দু-সমাজাগ্রগণ্যদিগকে ডাকাইয়া আপনার সঙ্কল্পিত সাধু উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু সেই মহান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইতে হইতেই, দিল্লী হইতে আওরঙ্গজেব-প্রমুখ যবন-সেনা মথুরায় আসিয়া পৌছিল, দলে বলে মথুরা, বৃন্দাবন এবং সমগ্র ব্রজধামকে ছাইয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার কয়েক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে সনাতন গোস্বামী মথুরায় যাইয়া বাস করিতেছিলেন।

যবনসেনা মথুরা লুণ্ঠন করিল, অসংখ্য হিন্দুরমণীর সতীত্ব হরণ করিল, অগণ্য হিন্দু-শিশুকে তরবারীর আঘাতে যমসদনে প্রেরণ করিল, বহু হিন্দুকে 'লাইল্লা' পড়াইয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলমান করিল, সহস্রাধিক হিন্দুদেবমূর্ত্তি চূর্ণীকৃত হইল, হিন্দুগ্রন্থাদি অনলকুণ্ডে অদৃশ্য হইল এবং নগরের পার্শ্বে ও মধ্য দেশে যবনমস্জিদ্ নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইল। বাঙ্গালী বৈরাগী সনাতন গোস্বামী দেখিলেন, তাঁহার কোনও উদ্দেশ্যই সংসাধিত হইল না। তিনি মেরু (বর্ত্তমান নাম হাট্রাশ্ রেলওয়ে ষ্টেশন) নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। ঐ নগর এখনও বর্ত্তমান; এক্ষণে হাট্রাশ দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশ, হাট্রাশ সহর; অপর অংশ হাট্রাশ জংশন। পূর্ব্বে এই নগরে স্বাধীন হিন্দুরাজা থাকিতেন, তাঁহার এক বিশাল মৃণ্ময় দুর্গ ছিল, ঐ দুর্গের ভগ্নাংশ এখনও বর্ত্তমান। (মথুরা হইতে হাট্রাশ দুই দিনের পথ) এখানকার রাজাকে স্ব বশে আনিয়া সনাতন গোস্বামী মথুরাপ্লাবিত যবনের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিলেন, কিন্তু সে ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত হইল না, মুসলমানেরা আপনা হইতেই স্বল্পকাল মধ্যে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

মথুরা যখন লুণ্ঠিত হইতেছিল, সেই সময়ে মথুরার "শ্রীগোবিন্দ" "শ্রীগোপীনাথ" এবং "শ্রীমদনমোহন" এই তিনটি প্রধান হিন্দু দেবমূর্ত্তি ছিল। এতন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দমূর্ত্তিকে হিন্দুরা অত্যন্ত ভক্তি করিত এবং ইহাকেই প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিত। সনাতন গোস্বামী, এই তিনটি মূর্ত্তিকে যবন হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। কি প্রকারে তিনি এই মূর্ত্তিগুলিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত ইতিবৃত্ত এখনও পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, ঘোরতর রাজনৈতিক কৌশলে, তিনি এই তিন মূর্ত্তিকে যবন হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। মদন মোহন মূর্ত্তিকে তিনি কেরোলী নামক রাজ্যে

লইয়া যান এবং তথায় উহা স্থাপিত করেন। ঐ মূর্ত্তি তথায় এখনও বহুল সম্মানের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। অপর দুই মূর্ত্তি জয়পুরে তিনি স্থাপনা করেন। বলা বাহুল্য, রাজপুতানা ভ্রমণকারী হিন্দু মাত্রেই ঐ দুই মূর্ত্তি অবশ্যই দর্শন করিয়া থাকিবেন।

আমরা প্রথমে শ্রীমদনমোহন মূর্ত্তির বিষয় বর্ণনা করিব। কেরোলীরাজ্য,ভরতপুর এবং জয়পুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত এবং চোলপুর রাজ্যের ইহা পার্শ্বস্থিত। রাজপুতানার মধ্যে ইহা এক সম্মানিত দেশীয়রাজ্য। হিণ্ডন্ রোড্ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কেরোলীরাজ্য প্রায় ২১ ক্রোশ দূর। সনাতন গোস্বামীর এস্থানে আসিবার পূর্ব্বে, মাংস ভক্ষণ, সুরাপান প্রভৃতি ক্রিয়ায় এখানকার লোকেরা দ্বিতীয় জগাই মাধাই বলিয়াই পরিগণিত হইত। রাজা ক্ষত্রিয়; শিকার করা,পশুবধকরা, সুরাপান করা, মাংস ভক্ষণকরা, তাঁহার বর্ণোচিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ছিল না। প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মনীতি কাহাকে বলে, রাজাধিরাজ হইতে কৃষক পর্য্যন্ত কেহই জানিত না। ঠিক এই সময়ে সনাতন গোস্বামী আসিয়া কেরোলীতে পদার্পণ করিলেন। সংক্ষেপে বলিতেছি, তাঁহার চরিত্র বলে, অমিত বিদ্যাবলে, প্রগাঢ় জ্ঞানগর্ভ বিচার বলে, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান বলে,কেরোলীর মহারাজা, সুতরাং তৎসঙ্গে তাঁহার সমগ্র অমাত্যবর্গ এবং প্রজাগণ—বাঙ্গালী বৈরাগীর অটল ভক্ত হইয়া উঠিলেন। সনাতনের মদনমোহন কেরোলীতে স্থাপিত হইল। রাজা, লক্ষাধিক অর্থ ব্যয় করিয়া,অতি বিশাল,অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ঐ মন্দির এখনও বর্ত্তমান। রাজা ও রাজবংশ, ঐ মদনমোহনের শিষ্য হইলেন, অর্থাৎ শ্রীমদনমোহনকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন। মন্দিরের ব্যয়ের জন্য লক্ষাধিক টাকার বার্ষিক "জায়গীর" নির্দ্দিষ্ট হইল; ঐ জায়গীর এখনও বর্ত্তমান। রাজা, ইচ্ছা করিলেও ঐ মৌরশী (চিরস্থায়ী) জয়গীর কাড়িয়া লইতে পারেন না। ক্রমে সমগ্র রাজ্য মদনমোহনের ভক্ত হইয়া উঠিল। শ্রীমদনমোহনকে এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীকে, লোকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিল। এইরূপে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও মূর্ত্তির স্থাপনা ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে, তিনি আপনার সঙ্কল্পিত বৈষ্ণবধর্ম্ম স্থাপনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সে উদ্দেশ্যও ঈশ্বর পূর্ণ করিলেন। জগাই মাধাই প্রমুখ লোকেরা সংশোধিত হইল, রাজ্যে ধর্ম্মের শান্তি, প্রেমের উৎস, ভক্তির কোমলতা, সর্ব্বত্রই দেখা দিল। রাজা, নিজে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ক্রমে বৈষ্ণবের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, মাংস বা বা পলাণ্ডু ভক্ষণ না করিলেই মহাবৈষ্ণব হয়, তাঁহারা কি মহা ভ্রান্ত!! সনাতন গোস্বামী, নিজে বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি এবং গোস্বামী কুলাগ্রগণ্য হইয়াও কখনও রাজাকে বলেন নাই যে, "তুমি মাংস খাইওনা"। তিনি নিজে গোঁড়ামীর কখনই প্রশ্রয় দিতেন না; ইংরাজী বিজ্ঞান না শিখিয়াও তিনি এখনকার ইংরাজী বিজ্ঞানে শিক্ষিত,অথচ মহা কুসংস্কারসম্পন্ন নব্য যুবার ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন না। প্রকৃত ধর্ম্ম তাঁহারাই জানিতেন; এখনকার ধর্ম্মধ্বজীতা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। এখনকার ধর্ম্মালোচনা কেবল একটা সখের জিনিষ' মাত্র অথবা 'উদর পূরণ' করিবার একটা উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহার দৃষ্টান্ত জন্য কেবল সেই স্বার্থপর, বুদ্ধিহীন,

সময়-সেবী বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র খানার নাম লইলেই যথেষ্ট হইবে, যে সংবাদ পত্রের "হাড়ে হাড়ে স্বার্থ এবং প্রতি পেশী ও নাড়ীতে মন্দবুদ্ধি জড়িত হইয়া রহিয়াছে।" বম্বাই গেজেটের কোনও মহাজ্ঞানী পত্র প্রেরক উপরি উক্ত হতভাগ্য বাঙ্গালা সমাচার পত্রের এইরূপে গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কেরোলাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থাপন এবং সংস্কৃত শিক্ষার আলোচনার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া, সনাতন গোস্বামীর চিত্ত আর একটি মহৎভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই মহাবৈষ্ণব রাজপুতানাবাসীর উন্নতিতেই কেবল ব্যস্ত ছিলেন না, স্বজাতীয় (বাঙ্গালীর) উন্নতিতেও তিনি কখনও পৃষ্ঠপদ হয়েন নাই। বাঙ্গালীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা তাঁহার জীবনের এক মহামন্ত্র ছিল। রাজাকে হাতে পাইয়া তিনি এই মহামন্ত্রের আহুতি দিতে ইচ্ছা করিলেন। কেরোলীর রাজাকে তিনি বলিলেন, "শ্রীমদনমোহনের পূজা রাজপুতানার কোনও ব্রাহ্মণ দ্বারা হইতে পারিবে না। ইহা, অতি দুর্দ্দিনে, মহাকষ্টে, বাঙ্গালী কর্তৃক মথুরা হইতে কেরোলী নগরীতে আনীত হইয়াছে; ইহাকে এক প্রকার বঙ্গবাসীরই বিগ্রহ বলা যায়। সুতরাং, অদ্য হইতে আমি এই নিয়ম করিতে চাহি, যত দিন এই রাজ্যে এই মন্দির ও এই মন্দির বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালী বৈষ্ণব অথবা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীমদনমোহনের মূর্ত্তির পূজা হইতে থাকিবে।" রাজাও তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন; কেবল মৌখিক প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা নহে, প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ মন্দির মদনমোহন মূর্ত্তি, জায়গীর, স্থাবর—অস্থাবর জঙ্গম সমুদয় সম্পত্তি, আইনানুসারে, বাঙ্গালী পুরোহিতকে বংশাবলীক্রমে উৎসর্গীকৃত করা হইল। এখন পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরের পুরোহিত বাঙ্গালী। কাহার সাধ্য যে, কেরোলী রাজ্য হইতে বাঙ্গালী পুরোহিতকে তাড়াইয়া দেয়? আজি যদি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালী পুরোহিতকে দেশত্যাগী করেন, ইহা নিশ্চয় যে, সমগ্র কেরোলী হিন্দুসমাজ বিদ্রোহী হইয়া দণ্ডায়মান হইবে। এখন ভাবিয়া দেখ, এক-জন সর্ব্বত্যাগী বাঙ্গালী বৈরাগীর যত্নে, বীরপ্রসূ রাজপুতানার এক প্রবল হিন্দুরাজ্য দুর্ব্বল বাঙ্গালীর কেমন অদ্ভুত ক্ষমতা স্থাপিত হইয়াছে!! ভারতবর্ষ মধ্যে রাজপুতানার ন্যায় কোনও প্রদেশে ধর্ম্মের নামে লোক অধিকতর আন্দোলিত হয় না। শ্রীমদনমোহনের পুরোহিত সমগ্র কেরোলীর আধ্যাত্মিক গুরু ও পরামর্শ দাতা। তাহাতেই বলিতেছি, এক জন বিদেশী বাঙ্গালীর যত্নে রাজপুতানার কেমন বাঙ্গালী জাতির অতুল আধ্যাত্মিক ক্ষমতা জন্মিয়াছে, দেখিলে কি? এই আধ্যাত্মিক শক্তি, রাজনৈতিক শক্তির সহিত মিলিত হইয়া, রাজপুতানার অপর অংশে কেমন আর এক আশ্চর্য্য সুফল প্রসব করিয়াছে, তাহাও আমরা পরে দেখাইতেছি। ধন্য সনাতন গোস্বামী! ধন্য বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি! প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম, যাহা ক্ষত্রিয় রাজাগণ কুরুক্ষেত্র সমর কালে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তুমিই কলিযুগে, আদর্শ বাঙ্গালী ও আদর্শ বৈষ্ণবরূপে, রাজপুতানায় স্থাপন করিয়া সহস্রাধিক ক্রোশ দূরেও জননী জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছ। এখনকার ধর্ম্মধ্বজী ও মিথ্যাধর্ম্মান্দোলনকারী-হিন্দুকুলকলঙ্কদিগের জানা উচিত, কেবল বাবু বা ব্রাহ্মনিন্দা করিলেই ধর্ম্মান্দোলন হয় না; নিজের চরিত্র ও জ্ঞানবলে, সমাজের

অসচ্চরিত্রতা ও কুসংস্কারকে (সাধুসনাতন গোস্বামীর ন্যায়) যিনি অপনোদন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম-সংস্থাপক। গোস্বামী বুঝিতেন, রাজনৈতিক শক্তি না জন্মিলে, ধর্ম্মসংস্থাপনের শক্তি জন্মিবে না। তাহাতেই তিনি সকল স্থলে রাজাকে প্রথমে হাতে করিয়া, প্রধান প্রধান গণ্য মান্য অধিবাসীকে বশীভূত করিয়া, ধর্ম্মস্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বজাতিবৎসল, উদারচেতা, রাজনৈতিক কৌশলী অথচ ধর্ম্মাত্মা সনাতনের জীবনের অপর অংশ বর্ণনা করিবার সময়, সে কথা উত্তম রূপে বুঝাইব।

পাঠকদিগের বোধ হয় স্মরণ আছে, শ্রীগোপীনাথ এবং শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তিদ্বয়, সনাতনের নিকট এখনও যত্নে রক্ষিত। গোপীনাথ মূর্ত্তিটিকে তিনি যোধপুরে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। এই সময়ে যোধপুরে এক ক্ষুদ্র সংগ্রাম চলিতেছিল, সুতরাং তথায় এই সময়ে যাইলে,কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে, ভাবিয়া, যোধপুরে তিনি যাইলেন না। জয়পুরে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন। রাজপুতানার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় রাজ্যে, তাঁহার বহু যত্নের রক্ষিত শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। মথুরা লুণ্ঠিত হইয়াছে, হিন্দুমূর্ত্তি সমূহ চূর্ণীকৃত হইয়াছে, এ কথা জয়পুরের মহারাজা এবং তথাকার লোকেরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথ মূর্ত্তিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন শুনিয়া, জয়পুরাধিপতি এবং তত্রত্য সমগ্র হিন্দু পরম পরিতোষ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক, আকবরের সময়ে যখন যশোহর হইতে সল্লাদেবী আনীতা হইয়াছিল, তখন আধুনিক জয়পুর নগর নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় যখন গোবিন্দ মূর্ত্তি লইয়া আইসেন, তখন জয়পুর সহর নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে এবং ধন ধান্যে লোকালয়ে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মহারাজা বাহাদুর, সনাতনের নিকট হইতে গোবিন্দ মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন এবং এই মূর্ত্তি কোথায় স্থাপন করিলেন, পাঠক জানিতে ইচ্ছা কর কি? রাজপ্রাসাদের সম্মুখেই এক রমণীয় উদ্যান, সেই উদ্যানের মধ্যভাগে এক মনোহর প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মিত হইল, এবং সেই মন্দিরে বাঙ্গালী সনাতনের গোবিন্দ মূর্ত্তি রক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ মন্দির এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত এবং ঐ মূর্ত্তি ঐ মন্দির এরূপ ভাবে স্থাপিত যে, মহারাজা এবং মহারাণী প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গবাক্ষ খুলিলেই, তাহাদের মহারাধ্য শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় এবং দৃষ্টিগোচর হইলেই রাজা ও রাণী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন; যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভাতের প্রণাম না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা ও রাণীর স্নান ও আহার হয় না। সুতরাং প্রতি প্রভাতেই গোবিন্দমূর্ত্তিকে দর্শন করিতে হয়। ঐ মন্দির ৩ লক্ষ ৬২ সহস্র মুদ্রায় নির্ম্মিত, এবং ঐ মূর্ত্তির স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার এবং হীরা, মণি প্রভৃতির মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। ঐ মূর্ত্তি জয়পুরে 'গোবিন্দজী' বলিয়া বিখ্যাত। প্রকৃত প্রস্তাবে ইনিই জয়পুরের অর্দ্ধ শক্তি; প্রকৃত প্রস্তাবে ইনিই জয়পুরের রাজা। সে কথা পরে বলিব। ভাবিলেও, স্বজাতি মহিমায় হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে যে, এক এক জন কাঙ্গালী বাঙ্গালী বহু দূরদেশে যাইয়াও কি অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন!! ধন্য বাঙ্গালী জাতি!! কে বলে, বাঙ্গালীর আর ভরসা নাই? যে

বলে, সে অর্ব্বাচীন, সে অল্প বুদ্ধি। যে জাতি সনাতন গোস্বামীর জন্মদাতা, সে জাতি চিরকালই জগতের আরাধ্য, জগতের অনুকরণীয়।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, শ্রীগোপীনাথ নামে আর একটি মূর্ত্তি, গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে ছিল। এই মূর্ত্তিটিকেও তিনি জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। জয়পুর নগরের মধ্যভাগে, বাজারের মধ্যে, লোকালয়ের কোলাহলের মধ্যে, এই অত্যুচ্চ মহামন্দির আজিও মহাসম্মানের সহিত বর্ত্তমান। শ্রীগোবিন্দের মূর্ত্তির পরেই শ্রীগোপীনাথের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, গোস্বামী মহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন এবং অবসর পাইয়া অপরাপর দিকে আপনার চিত্তবৃত্তিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়ের সুবিধার জন্য, এস্থলে শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথের মূর্ত্তির প্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলিয়া রাখি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জয়পুরের সমগ্র রাজবংশ, শ্রীগোবিন্দজী দেবের ভক্ত এবং শিষ্য। এক্ষণে এই বিগ্রহের প্রতি দিবসীয় খরচা, নিত্যব্যয়, প্রায় এক সহস্র টাকা। এতদ্ভিন্ন দেওয়ালী, হোলী, প্রভৃতি বড় বড় উৎসবের ব্যয় স্বতন্ত্র। দিবসে প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় এবং সায়াহ্নে প্রায় ৭টার সময় মন্দিরের দ্বার, সর্ব্ব সাধারণের দর্শনের জন্য, নিয়ম মত খোলা হয়। ঠিক ঐ সময়ে না যাইতে পারিলে, ঐ দিবস দর্শন হয় না। অসংখ্য লোক প্রতিদিন ঐ নিয়মিত সময়ে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া থাকে এবং শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তিকে দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। একাদশী, দ্বাদশী, হোলী, দেওয়ালী, সোমিতি প্রভৃতি উৎসবে, মন্দিরে এত জনতা হয় যে, কাহার সাধ্য তথায় অক্ষতশরীরে প্রবেশ করিয়া বাহিরে আইসে? রাজাধিরাজ হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র কৃষাণ পর্য্যন্ত, গোবিন্দের নামে ভক্তিতে উচ্ছলিত হয়। গোবিন্দের নামে কাহাকে শপথ করাইলে, সে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারে না। কেননা এই নামের এমনই মাহাত্ম্য যে, জয়পুরের লোকেরা জানে, গোবিন্দের ক্রোধে সে ব্যক্তি সবংশে বিনাশ হইবে। জয়পুর নগর এবং জয়পুর রাজ্যের সমগ্র হিন্দু গোবিন্দের ভক্ত। রাজা এবং প্রধান প্রধান রেইসগণ (ক্ষমতাশালী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ) গোবিন্দের শিষ্য। গোবিন্দকে দর্শন না করিয়া অনেকে আহার, স্নান, বিদেশ গমন অথবা শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। শত শত রাজার রাজমুকুট গোবিন্দের পদারবিন্দে লুণ্ঠিত হইতেছে। জয়পুর রাজ্যের সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্র—গোবিন্দের মন্দির। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ক্রিয়া, শাস্তি বিচার, প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু অঙ্গ, শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে তাহার মীমাংসা না হইলে জয়পুরী বীরহিন্দু তাহা মানিবে না। মন্দিরের অনুজ্ঞা ও অভিমতি অকাট্য। রাজার সিংহাসন টলিয়া যাউক, ক্ষতি নাই, কিন্তু গোবিন্দের আদেশ অমান্য করে, কাহার সাধ্য? এখন ভাবিয়া দেখ, গোস্বামী মহাশয়ের যত্নে বঙ্গবাসীর কি অপূর্ব্ব সম্মান, কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা, রাজপুতানায় স্থাপিত হইয়াছে!!

জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত খেৎড়ী, শিকোড়, সুরযপুরা প্রভৃতি কয়েকটি অতি প্রাচীন রাজ্য আছে। এগুলি হিন্দুরাজা এবং পুরাকাল হইতে প্রবল প্রতাপান্বিত কিন্তু আকারে ও আয়ে অবশ্য তুলনায় ক্ষুদ্র।

শ্রীগোপীনাথজী দেবের ইহারা ভক্ত ও শিষ্য। শ্রীগোবিন্দ দেব যখন জয়পুর রাজ্যের রাজা, উপরি উক্ত তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শ্রীগোপীনাথজী দেবই অধিপতি। তাহা হইলেই দেখ, সমগ্র জয়পুর এবং জয়পুরে সম্মিলিত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য একজন সর্ব্বত্যাগী বাঙ্গালা বৈরাগীর চরণতলে পতিত। রাজপুত বীরের যে হস্ত কোটি কোটি যবন বীরের মস্তককে দ্বিখণ্ড করিয়াছে, যে হস্ত কখনও বাদসাহের হস্তের সহিত মিলাইয়া করমর্দ্দনে প্রশ্রয় দেয় নাই, আজ সেই হস্ত এক জন দুর্ব্বল, ভিখারী, কাঙ্গালী বাঙ্গালীর চরণ স্পর্শ করিয়া কৃতকৃতার্থতা লাভ করিতেছে। ভাবিলেও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়; সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে দেখিলে জাতীয় মহিমার গৌরবে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

একথা বলা বাহুল্য, কেরোলীর রাজার ন্যায়, জয়পুরের মহারাজাও শ্রীগোবিন্দের জন্য জায়গীর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। খেৎড়ী প্রভৃতির রাজাও শ্রীগোপীনাথের মূর্ত্তির যথারীতি বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত জয়পুর রাজভাণ্ডার হইতেও এই বিগ্রহের ব্যয়ের জন্য প্রচুর অর্থ আসিয়া থাকে। গোস্বামী মহাশয় এই সকল রাজার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া লইয়াছেন যে, "যত কাল জয়পুর, খেৎড়ী, শিকড়, প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথের মূর্ত্তির পূজা বাঙ্গালী বৈষ্ণব বা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।" তদবধি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণব দ্বারাই পূজাদি চলিয়া আসিতেছে। সমুদায় জায়গীর, স্থাবর—অস্থাবর—জঙ্গম সম্পত্তি প্রভৃতি বাঙ্গালীর হস্তেই ন্যস্ত। তদ্ব্যতীত যাহা কিছু আমদানী হয়, তাহার উপরে বাঙ্গালী পুরোহিতেরই সর্ব্বতোময় প্রভুত্ব ও অধিকার। ফল কথা, এই দুই মন্দিরে "বাঙ্গালী যাহা করিবে, তাহাই হইবে; যাহা বাঙ্গালীর অভিপ্রেত নহে, তাহা হইতে পারে না।"

এক্ষণে দেখা গেল, গুণাকর বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় (প্রথম প্রস্তাব দেখুন) অম্বর শৈলে সল্লাদেবী প্রতিষ্ঠিতা করিয়া বাঙ্গালী শক্তির যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, সনাতন গোস্বামীর আগমনে তাহা বিশাল তরুরূপে পরিণত হইল। রাজপুতানার ধর্ম্মশক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি; এই শক্তির নিকটে আর সকল শক্তিই হীণপ্রভঃ হইয়া যায়। বিদ্যাধরের ও সনাতনের চেষ্টায়, সমগ্র জয়পুর রাজ্যটিকে বাঙ্গালীজাতি যেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে টানিয়া রাখিয়াছে। শ্রীসল্লাদেবী, শ্রীগোবিন্দজী, শ্রীগোপীনাথজী প্রভৃতির পৌরহিত্য করার অর্থে স্পষ্টতঃ এই বুঝায় যে, "সমগ্র রাজ্যের আধ্যাত্মিক শক্তিকে একচেটিয়া (ইজারা অথবা Monopolise) করিয়া লওয়া।" যদি সমগ্র রাজ্যের আধ্যাত্মিক শক্তি (যাহাকে সাধারণ ভাষায় ধর্ম্মশক্তি বলে) তোমার হাতে রহিল, তাহা হইলে তোমার হাতে না রহিল কি? তুমি এই শক্তির সুন্দর ও ন্যায়তঃ প্রয়োগে, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিদ্বয়ও একচেটিয়া করিয়া লইতে পার। অনেকবার জয়পুরে, বাঙ্গালী তাহা করিয়া লইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাধর ও সনাতনের রাজপুতানার জীবনী সমালোচনা করিলে এক মহা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া উঠে। কিন্তু সে অবসর আমাদের নাই, "নব্যভারতে"ও বোধকরি সে স্থান নাই। কেবল এই কথাটি পরিশেষে

দেখাইতে চাহি (এবং দেখাইয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিতে চাহি) যে, ইহাঁদের রাজপুতানায় আগমনে বাঙ্গালী জাতির কি প্রকারে উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

কেরোলীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেরোলীতে প্রায় তিনশত বৎসর হইতে বাঙ্গালীর গমনাগমন চলিতেছে। রাজকার্য্যে বাঙ্গালী, কৃষিকার্য্যে বাঙ্গালী, ব্যবসায়ে বাঙ্গালী, ধর্ম্ম কর্ম্মে বাঙ্গালী। এমন এক এক ঘর বাঙ্গালী কেরোলীতে আছেন, যাঁহারা সার্দ্ধ দুই শত বৎসর হইতে পুরুষানুক্রমে এস্থানে অবস্থান করিতেছেন। অম্বর, সঙ্গানীর, জয়পুর, খিৎড়ী, শিকোড় প্রভৃতি স্থানেও অসংখ্য বাঙ্গালী। জয়পুর রাজ্য ত এক্ষণে এক প্রকার বাঙ্গালী উপনিবেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তিনশত বৎসরের গৃহস্থ, এমন ৩০ জন বাঙ্গালী পাওয়া যায়। ৫ পুরুষ, ৭ পুরুষ, ১০ পুরুষ হইয়া গিয়াছে, এমন বাঙ্গালী, এখানে প্রায় ৫০ ঘর। বাঙ্গালা ভাষা বুঝেনা, পরিচ্ছদ মাড়োয়ারীর মত, অথচ বাঙ্গালীকুলে জন্ম—নামটি কেবল বাঙ্গালী নাম—এমন বাঙ্গালী এখানে আমি ২২ জন দেখিয়াছি। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানায় বাঙ্গালী ৩৭৬ জন।

জয়পুর রাজ্যে এখন একবার বাঙ্গালীর প্রভুত্ব শুনিয়া মোহিত হইয়া যাও। জয়পুরের শিক্ষা বিভাগ বাঙ্গালীর হস্তে; কলেজটি বাঙ্গালীর দ্বারাই স্থাপিত, প্রিন্সীপাল মহাশয় বাঙ্গালী, প্রধান প্রধান অধ্যাপক বাঙ্গালী। দেওয়ানী বিভাগ বাঙ্গালীর হস্তে ন্যস্ত। পূর্ব্বে বাবু হরিমোহন সেন মহাশয় দেওয়ান ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারই পুত্র বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন (৺ মহাত্মা কেশব বাবুর ভ্রাতা) দেওয়ানী বিভাগ চালাইতেছেন। বাবু হারাণচন্দ্র মুন্সেফ্। চিকিৎসা বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় অমাত্য বাবু যদুনাথ দে। মিউনিসিপালীটীর প্রধান কর্ম্মচারীও বাঙ্গালী। ধর্ম্ম বিভাগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ষ্টাম্প কার্য্যের কর্ত্তাও বঙ্গবাসী। যে দিকে যাও, বাঙ্গালীকেই দেখিবে। মহারাজার শিক্ষক বাঙ্গালী ছিলেন। মহারাজার বর্ত্তমান প্রাইভেট্ সেক্রেটরী বাঙ্গালী ভদ্রলোক। কিন্তু সমগ্র রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা কেহ জানেন কি? জয়পুরে তাঁহার অতুল প্রভুত্ব, অমিত প্রভাব, অসাধারণ রাজনৈতিক কৌশল দেখিয়া, "বাঘে ছাগে একঘাটে জল খায়"। ইঁহার নাম রায় বাহাদুর বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই। সত্য কথা বলিতে হইলে, ইনিই জয়পুরের রাজা, ইনি যাহা করেন, রাজার তাহাই গ্রাহ্য হয়। কাহার সাধ্য, ইঁহার অনুজ্ঞা ও অভিমতকে টলাইয়া দেয়? জয়পুরে বাঙ্গালীর এই ক্ষমতার মূল, বিদ্যাধর ও সনাতন গোস্বামী।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়নগর। (৫)

পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ।

বাইশহাজারীদর্গা।—মালদহ হইতে দিনাজপুরের রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথমতঃ বাইশ হাজারী দর্গা-দ্বার ও তাহার অনতিদূরে এই দর্গা অবস্থিত। এই দর্গা সাহজালাল উদ্দিন-তাব্রুক একজন প্রসিদ্ধ পীরের নামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ ইহা তাঁহার সমাধিস্থান

নহে, কারণ এদেশে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। মুসলমান অধিকারের প্রাক্কালে সাহজালাল-উদ্দিন একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন। পারস্যের অন্তর্গত তাব্রিজ নগরে তাঁহার জন্ম হয় ও ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেখ শুভোদয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে,রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে সাহজালালউদ্দীন এদেশে আগমন করেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে সাতিশয় সমাদর করিতেন এবং তিনিই পাণ্ডুয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রাম তাঁহাকে পীরোত্তর স্বরূপ প্রদান করেন। এই দর্গা একটী মস্‌জিদে অবস্থিত। এই মস্‌জিদ ১০৭৫ হিজরীতে (১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) চাঁদখাঁর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহার রক্ষার জন্য ২২ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি আছে। এই স্থানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে একটী মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে প্রায় ৫।৬ হাজার মুসলমানের সমাগম হয়। এই মস্‌জিদের মধ্যে দুইখানি অতি জীর্ণ হস্তলিখিত পুস্তক আছে। উভয় খানিই সেখ শুভোদয় গ্রন্থের অনুলিপি,কিন্তু এত জীর্ণ যে, পাঠোদ্ধার হয় না। মালদহ জিলার অন্তর্গত ভাইয়োভিকাহ নামক গ্রামের রায় বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ এক সময়ে এই দর্গার সম্পত্তির মতোলী বা কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এই রায় মহাশয়দিগের বাটীতে এই পুস্তকের এক খানি অনুলিপি আছে। উক্ত রায় বংশের কিঙ্কর নারায়ণ রায় নামক কেবল পূর্ব্বপুরুষের সময় এই পুস্তক লিখিত হয় বলিয়া বোধ হয়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, যে সময়ে ঢাকার রাজধানী হইতে পাণ্ডুয়ার ২২ হাজারী ও ছয় হাজারী দর্গার নিষ্কর ভূমির দান কর্ত্তার ও দান পত্রের অনুসন্ধান হইয়াছিল, সেই সময়ে উক্ত বিষয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ এই গ্রন্থখানিকে উপস্থাপিত করেন। প্রবাদ আছে যে,ইহা গঙ্গা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ফলতঃ সেই সময়েই এই গ্রন্থ জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থখানি ২৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। কোন কোন অধ্যায় অসম্ভব উপন্যাসে পরিপূর্ণ। ইহা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধের রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভাষা ও রচনা এরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃতে পরিপূর্ণ যে,কিছুতেই হালায়ুধের রচনা বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থে সময় নির্দ্দেশক যে সকল শাক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রম নাই। লোক পরম্পরায় ও বংশ পরম্পরায় যে সকল উপাখ্যান ও শ্লোক চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের সারমর্ম্ম এই যে, ৬০৮ হিজরীতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব সময়ে,মকদমসাহ জালালউদ্দীন নামক এক দরবেশ গৌড়ে আগমন করেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহার অলৌকিক কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি গ্রাম নিষ্কর প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে রাজা ও দরবেশ উভয়েই আপন আপন বংশের পরিচয় প্রদান করেন।

ছয় হাজারী দর্গা।—২২ হাজারী দর্গার কিঞ্চিৎ উত্তরে নুরকুতুব নামক পীরের এই দর্গা অবস্থিত। ইহার নিকটে একটী ছোট মস্‌জিদের মধ্যে তাহার সমাধিস্থান। চতুর্দ্দিকে আরও কতকগুলি সমাধি আছে। ইহার প্রায় সিকি মাইল দূরে কুতুবের বাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার কোন কোন গৃহের ইষ্টকগুলি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত।

পাণ্ডুয়ার সোনামস্‌জিদ।—পূর্ব্বোক্ত দর্গার কিছু উত্তরে এই মস্‌জিদ অবস্থিত। ইহা গ্রেনিট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার উপরে ৯টী গুম্বজ আছে। ৯৯০ হিজরীতে (১৫৮৫

খ্রীষ্টাব্দে) এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়, ইহা এক্ষণে ভগ্নপ্রায়।

একলাখী মস্‌জিদ।—সোণা মস্‌জিদের কিছু উত্তরে এই মস্‌জিদ অবস্থিত। কথিত আছে যে,এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যভাগে সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন ও তাহার দুই পুত্রের সমাধি আছে। ইহা আকারে একটী বর্গক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার প্রত্যেক দিক্ ৮০ ফিট এবং উপরে একটী প্রকাণ্ড গুম্বজ; তাহার ভিতরের ব্যাস প্রায় ৩২ হাত। প্রাচীর প্রায় ৮ হাত প্রশস্ত। সম্মুখ দ্বারের উপরিভাগে এখনও একটী ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

আদিনা মস্‌জিদ।—একলাখী মস্‌জিদের দুই মাইল উত্তর পূর্ব্বে দিনাজপুরের রাস্তার পূর্ব্বদিকে আদিনা নামক প্রসিদ্ধ মসজিদ। এই মস্‌জিদ গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট এবং ভারতবর্ষের মধ্যে পাঠান স্থপতি-বিদ্যার আদর্শ-স্বরূপ। ইহার আয়তন, উপাদান ও নির্ম্মাণ কার্য্য দর্শন করিলে চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়। ইহার নিম্ন অর্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বল প্রস্তরে এবং উপরের অর্দ্ধ ইষ্টক নির্ম্মিত। ফার্গুসন সাহেব বলেন যে, ইহার আকৃতি ও পরিমাণ ডামস্কস্ নগরের মস্‌জিদের ন্যায়। ইহা আকারে একটী প্রশস্ত আয়তক্ষেত্র, ৫০০ ফিট দীর্ঘ, ৩০০ ফিট প্রশস্ত এবং ৬২ ফিট উচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিকেই থিলান ও গুম্বজযুক্ত গৃহ, মধ্যভাগ অনাবৃত। কথিত আছে যে, সমুদয়ে প্রায় ৪০০ গুম্বজ ছিল। ইহার অধিকাংশই পড়িয়া গিয়াছে, প্রায় ৪০ টী মাত্র গুম্বজ এক্ষণে দণ্ডায়মান আছে। পশ্চিম দিকের গৃহে ২৬ হাত উচ্চ মঞ্চের ন্যায় প্রস্তর নির্ম্মিত একটী উচ্চ আসন আছে। ইহাকে বাদসাহ তথ্‌ত বা সম্রাটের সিংহাসন কহে। এখানে বাদসাহ ও উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত অমাত্যবর্গ উপাসনা করিতেন। প্রাচীরের গাত্রে নানারূপ কারুকার্য্য ও কোরাণের শ্লোক খোদিত আছে। এই সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে একটী উচ্চ বেদী আছে। এই বেদী হইতে ইমাম সকলকে উপদেশ দিতেন। বেদী ও তাহার উপরে উঠিবার সোপান কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বল প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার অনতিদূরে একটী সমাধি আছে। এই সমাধিটী বোধ হয় ধন লোভে খনিত হইয়াছিল, তৎপরে মেরামত করিয়া রাখা হইয়াছে। মেজর ফ্রাঙ্কলিন বলেন যে, ২৬০ টী স্তম্ভের উপর এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত ছিল। তন্মধ্যে ১৫০ টী তাঁহার সময়ে (১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিল। তদুপরি বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সুন্দর গুম্বজ সমূহ অবস্থিত ছিল। তিনি বলেন যে, এই অসাধারণ মস্‌জিদের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য, চিত্রকরের তুলীর প্রয়োজন। এরূপ প্রকাণ্ড মস্‌জিদ বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোন স্থানেই নাই। এখানে আনুমানিক অন্যূন ২০ হাজার লোক একত্রে উপাসনা করিতে পারিত। বোধ হয় বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে বাদসাহ সমস্ত অমাত্যবর্গ ও সৈন্য সামন্ত লইয়া এখানে উপাসনা করিতেন। পূর্ব্বোক্ত সিংহাসনের পশ্চিমদিকে প্রবেশ-দ্বার। ইহার প্রস্তরগুলি অত্যন্ত মসৃণ ও শীতল। দ্বারের বহির্দ্দেশে একটী উচ্চ বারান্দা। এই বারান্দার দ্বারের উপরিভাগে এখনও একটী প্রস্তর-খোদিত ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি সংলগ্ন দৃষ্ট হয়। ইহা এক খণ্ড পৃথক প্রস্তর দ্বারা আবৃত ছিল। এক্ষণে সেই প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া গিয়াছে এবং হিন্দুদেবালয় লুণ্ঠনের

সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ নিদর্শন আরও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। এই মস্‌জিদের পূর্ব্বদিকে একটী মকরমুখ পয়ঃপ্রণালী সংলগ্ন আছে। ইহাও কোন হিন্দু দেবালয় হইতে নীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার বহির্ভাগে একখানি প্রস্তরে খোদিত আছে যে,সেকেন্দর সাহর আদেশানুসারে ৭৭০ হিজ্‌রীতে (১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। আদিনা শব্দের অর্থ শুক্রবার। শুক্রবার মুসলমানদিগের উপাসনার দিন। শুক্রবারের উপাসনার জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম আদিনা মস্‌জিদ।

সাতাইশ ঘর।—আদিনা মস্‌জিদের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে একটী পুষ্করিণী ও তাহার তটে একটী বাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহাকে লোকে সাতাইশ ঘর বলে। এই বাটীর প্রাচীরে সংলগ্ন পয়ঃপ্রণালী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী দর্শনে অনুমিত হয় যে, ইহা বাদসাহ বা স্ত্রীলোকদিগের স্নানাগার ছিল।

মালদহের কাট্‌রা বা দুর্গদ্বার।—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মালদহ নগর পাণ্ডুয়ার বন্দর ছিল। এই স্থানে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার ভিতরে একটী সরাই ছিল। বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের বাণিজ্য দ্রব্য এই স্থানে রক্ষিত হইত। মহানন্দার অপর পারে একটী স্তম্ভ স্থিত। ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি প্রস্তর সংলগ্ন আছে। কেহ কেহ বলেন যে, শত্রুর আগমন দূর হইতে অবগত করাইবার জন্য এই সকল প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রদীপ জ্বালান হইত।

মালদহের সোণামস্‌জিদ।—এই মস্‌জিদ মৌসুকনামা একজন সদাগরের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। তাঁহার ভ্রাতা পূর্ব্বোক্ত সরাই প্রস্তুত করেন। এই মস্‌জিদের শিলালিপির মর্ম্ম এই:—এই উপাসনা স্থান পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিল। ইহা ভারতবর্ষে কাবা নামে খ্যাত ছিল। ৯৭৪ হিজরীতে (১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) ইহা নির্ম্মিত হয়।

তাণ্ডব বা তাঁড়ার বিবরণ।

গৌড়ের ধ্বংশের ১১ বৎসর পূর্ব্বে আফগান নরপতি সলিমান সাহ করানী গৌড় নগর অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তাণ্ডানগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। গৌড়ের নিম্নে গঙ্গা-প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, বোধ হয়, উহার স্বাস্থ্যহানি জন্মে এবং এইস্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়। তৎকালে গঙ্গানদী বর্ত্তমান পাগলা নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন তাণ্ডানগর গৌড়ের দক্ষিণ পশ্চিমে ভাগীরথীর অপর পারে এবং পাগলা নদীর উত্তর পারে অবস্থিতছিল। ইহা অনেক দিন হইল পাগলার উদরসাৎ হইয়াছে। নগর অথবা তাহার কোন ভগ্নাবশেষই এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। বর্ত্তমান সময়ে মহদীপুরের পশ্চিমে পাগলা ও ভাগীরথী নদীর মধ্যে যে তাঁড়া নামক গ্রাম আছে, ইহারই সন্নিকটে প্রাচীন তাণ্ডা অবস্থিত ছিল। এই নগর বিশেষ বৃহৎ বা বহু জনপূর্ণ ছিল না, কিন্তু ইহা মোগল শাসন কর্ত্তাদিগের প্রিয় বাসস্থান ছিল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে সাসুজা আওরঙ্গজীবের সেনাপতি মীরজুমলা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রাজমহল হইতে তাণ্ডায় আশ্রয় লন এবং ইহারই নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ঢাকায় পালায়ন করেন। ইহার পরে রাজধানী ঢাকাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তদবধি তাণ্ডার নাম বিলুপ্ত হয়।

শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মা।

সুখ ও দুঃখ। (২)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, জীবের অর্জ্জিত কর্ম্ম বা অদৃষ্ট উহাদের সুখ দুঃখের কারণ। ঈশ্বর যে প্রাণি-দিগের সুখ ও দুঃখের কারণ হইতে পারেন না, তাহাও দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমরা বলিয়াছি যে, হিন্দুদর্শনের এইরূপ সিদ্ধান্তে দোষ আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই; আজ প্রধানতঃ দুইটী মাত্র দোষ ও আপত্তির আলোচনা ও সুখ দুঃখ সম্বন্ধে আর দুই চারিটী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কর্ম্ম ধর্ম্মা-ধর্ম্মভেদে দুই প্রকার। ধর্ম্মকর্ম্মের আচরণে সুখ, ও অধর্ম্ম কর্ম্মের আচরণে দুঃখ পাইতে হয়। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মের আচরণ-নিবন্ধন যে সংস্কার জন্মে, তাহাই অদৃষ্ট-পদ-বাচ্য। এখন বুঝিতে হইতেছে যে, অদৃষ্টই যদি প্রাণী-বর্গের সুখ দুঃখের বিধায়ক ও কারণ হয়, তবে এই অদৃষ্টই বা প্রথমে কোথা হইতে আসিল? যে বস্তু যাহার কারণ, সে বস্তু তাহার নিয়ত পূর্ব্বে বর্ত্তমান না থাকিয়াই পারে না। কারণ হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যখন মনুষ্যাদি সৃষ্ট হয় নাই, যখন জগতের অস্তিত্বই ছিল না, তখন অবশ্যই অদৃষ্টও ছিল না। তৎপর যখন প্রথম প্রাণী-সমূহ সৃষ্ট হইল, তখন হঠাৎ অদৃষ্টই বা কি করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া পড়িল? প্রাণী জন্মিবার পর, তবে ত সে কর্ম্ম করিয়া অদৃষ্ট জন্মাইবে? কিন্তু যখন সেই প্রাণীরই অস্তিত্ব নাই, তখন অদৃষ্টও ত ছিল না—ইহা বলিতেই হইবে। তবে কেমন করিয়া এই সুখ দুঃখ সমাকুল বিচিত্র প্রাণী-রাশি সৃষ্ট হইল? ইহা একটী গুরুতর আপত্তি। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, অদৃষ্টই যদি সুখ দুঃখাদির কারণ হইল, তবে সেই দুরন্ত অদৃষ্টের খণ্ডন হওয়া অসম্ভব। তাহা হইলেই বুঝিয়া দেখ, সমাজের অন্তরে কেমন একটী মলিন আবর্জ্জনা আসিয়া প্রবেশ করিল! সামাজিক লোকে সর্ব্বদাই প্রতি-কার্য্যে এই অখণ্ডনীয় অদৃষ্টের দোহাই দিয়া অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে! "অদৃষ্টে থাকে অন্ন মিলিবে; চেষ্টা করা বৃথা"—এইরূপ উক্তি এই অদৃষ্টবাদ হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছে!!

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এই আপত্তি দুইটী অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়-মান হইবে। প্রথম আপত্তির উত্তরে বেদান্ত-দর্শনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহারই মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। শঙ্কর এইরূপে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেনঃ—

"বিভাগাদূর্দ্ধং কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বর প্রবর্ত্ততাং নাম,
প্রাক্ তু বিভাগাদ্বৈচিত্র নিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবা-
ত্তুল্যৈবাদ্যা সৃষ্টিঃ"।

—অর্থাৎ প্রাণী সৃষ্টির পর তাহাদের কৃত কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর সুখ দুঃখের বিধান করুন্ তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণীবৈচিত্রের কারণ-স্বরূপ কর্ম্মের অসদ্ভাব হেতু সুখ দুঃখ আসিতে পারে না। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে শঙ্করাচার্য্য বলেন—

"নৈষঃ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য।"

অর্থাৎ এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কেননা সংসার অনাদি,—সৃষ্টি প্রবাহের আদি নাই। যদি জগতের আদি অন্ত থাকে, তবে উল্লি-খিত দোষটীও অখণ্ডনীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু

বীজাঙ্কুরন্যায়ে অনাদিভাবে আবহমান কাল পর্য্যন্ত জগৎ চলিয়া আসিতেছে। বীজ ব্যতীত বৃক্ষ হয় না, বৃক্ষ না হইলে বীজ হয় না; এই বীজ ও বৃক্ষের যেরূপ আদি নাই, অদৃষ্টও জগতের সেইরূপ আদি নাই। বরং সংসারের আদিমত্ব স্বীকার করিলেই দোষ হয়; কেননা আদি থাকিলে, অকস্মাৎ বিনা কারণে প্রাদুর্ভূত হওয়াতে মুক্তাত্মাদিগেরও পুনর্ব্বার জন্মিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। আরো দেখ, কর্ম্ম না হইলে শরীরের উৎপত্তি সম্ভবে না, আবার শরীর না হইলে কর্ম্ম সম্ভবে না;—এইরূপ একটী অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু সংসার অনাদি বলিলে, বীজাঙ্কুরন্যায়ে এ দোস আসিতে পারিল না। তারপর, পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে আমরা বলি যে, কার্য্য মাত্রই কারণ-সমূহের অধীন। একটী মাত্র কারণ হইতে কার্য্য উৎপত্তি হয় না। মাটী ত সর্ব্বত্রই রহিয়াছে; তবে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঘট উৎপন্ন হয় না কেন? সুতরাং বলিতেই হইবে যে, চক্র, দণ্ড, কুম্ভকার প্রভৃতি অন্যান্য কারণের অভাবে ঘট উৎপন্ন হইতেছে না। তবেই স্থির হইতেছে যে, যদি কারণ-কলাপ সমুদায় একত্র না হইলে কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তবে কেবল অদৃষ্টের বলে সংসারযাত্রা চলিবে কেন? চেষ্টাদি অপর কারণ সমূহেরও সদ্ভাব চাই। আর এক কথা, প্রতিবন্ধকের অসদ্ভাবও একটী কারণ। অদৃষ্ট, কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারে, কিন্তু মানুষ চেষ্টা দ্বারা তাহার খণ্ডন করিতে সমর্থ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোত্থাপিত আপত্তি দুইটী অকিঞ্চিৎকর এবং বলুকাগৃহের ন্যায় দৃঢ়।

এখন দেখিতে হইতেছে যে, এই সুখ দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার কি কোনও উপায় নাই? কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে মনুষ্য এই বৈষম্যের অবস্থার অতীত হইয়া যাইতে পারে? দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারিলেই মনুষ্য মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। উপাসনা বল, ভক্তিবল, নিষ্ঠাবল, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারে,—যতদিন না সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারিবে, ততদিন মনুষ্যজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। হায়! এ নিদারুণ মরীচিকার ত অন্ত নাই!! এ জল-কল্লোলের বিরাম নাই!! একটীমাত্র সুখের লহরী তোমার গাত্র স্পর্শ করিল, অমনি তুমি বাহ্যজ্ঞান হারাইলে; অমনি আবার তদপেক্ষা আর একটী সুখের লালসায় ধাবিত হইলে!! এইরূপে, সমুদয় সুখের ভাজন হইলেও তোমার আশা মিটিবে না,—তোমার বাসনার তৃপ্তি হইবে না। মন আরোও সুখ পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিবে। বিষয়-সংস্পর্শ-জনিত সুখ প্রাপ্তির বিরাম কদাচ হইবে না। তরঙ্গের পর তরঙ্গ! আন্দোলনের পর আন্দোলন! যতদিন সংসার, যতদিন, তোমার দেহ মন ও ইন্দ্রিয়, ততদিন এ বিক্ষোভের সীমালঙ্ঘন করিতে পারিবে না। বৃদ্ধ মনু সাধ করিয়া বলেন নাই—"ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"।—এ অগ্নি নিবিবার নহে; এদারুণ তৃষ্ণা অপগত হইবার নহে!!! এ পিপাসার অন্ত থাকিলে, এ গোলোক ধাঁধার দ্বার থাকিলে, চিন্তা ছিল কি? উপভোগেই যদি সুখের শান্তি হইত, তবে বলিতে পারিতাম যে "মানব! তুমি চিরজীবন সুখেরই অন্বেষণ কর"। সুধু কি

তাই? এ সুখের খেলাতেও দুঃখ আছে। অভাবই দুঃখ। একটি সুখের উপভোগজনিত আমোদ লাভ করিলে;—সেই উপভোগের সময়েই তোমার অতৃপ্ত-বাসনা, ততোধিক আর একটী সুখের লালসায় তাহার তাৎকালিক অভাব-জনিত দুঃখে কাঁদিয়া উঠে। আবার এদিকে চাহিয়া দেখ;—তুমি ঘোর ক্লেশে, যাতনায়,দারুণ-দাবানলে,অর্দ্ধ ঝলসিত হইয়া হায় হায় করিতেছ। দুই দিন চলিয়া-গেল; তোমার সে দুঃখ-বহ্নি নিবিল;—কিন্তু তুমি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরো সুখের কামনা করিতে থাকিলে! তাই ত বলি, এ মরীচিকার অন্ত নাই!! এই সুখদুঃখের অন্ত নাই, সীমা নাই। ইহারা সাগর-তরঙ্গবৎ অসীম, অনন্ত;—যাইতেছে, আসিতেছে!!!

তাই বলিতেছিলাম, এই সুখ দুঃখের তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি? যতদিন এই দুঃখ (Pain) আছে, ততদিন মানব দুঃখ নিবৃত্তির পথ খুঁজিবে,—দুঃখ যাইয়া যাহাতে সুখ হয়, তজ্জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। ততদিন তাহার পক্ষে "শান্তি" লাভ সুদূরপরাহত। আবার যতদিন এই সুখ (Pleasure) আছে,ততদিন তদপেক্ষা আরো সুখবৃদ্ধির প্রত্যাশায় মানুষ ইতস্ততঃ ঘুরিবে। ততদিন তাহার পক্ষে "শান্তি" লাভ সুদূরপরাহত। ততদিন মনুষ্যের চিত্ত-বিক্ষেপ অনিবার্য্য। নির্ম্মল শান্তি ও আনন্দ (Peace and Happiness) লাভ করা ততদিন ঘটিবে না। সুখ ও দুঃখের সীমা অতিক্রম করিতে না পারিলে প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইয়া মনুষ্য-চিত্ত প্রশান্ত-ভাব ধারণ করিতে পারে না। ঝটিকা অপগত হইলে, প্রকৃতির রুচিরতার অনুভব করা যায়। এখন আমরা দেখিব, সুখদুঃখ-জনিত চিত্ত-বিক্ষেপ নিবারণ করিয়া পরমানন্দময় শান্ত সমাহিত অবস্থা লাভ করিবার কোন উপায় আছে কিনা?

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি, কর্ম্মই মনুষ্যের সুখ দুঃখের কারণ। সুতরাং এই সুখ দুঃখ অতিক্রম করিতে হইলে, তাহার কারণের মূলোচ্ছেদ করা আবশ্যক। কর্ম্ম-ধ্বংশ করিতে পারিলে, সুখ দুঃখ আর মানবের মনে অভিঘাত উপস্থিত করিতে পারিবে না। কি করিয়া তবে এই কর্ম্ম ধ্বংশ করা সম্ভব? কর্ম্ম বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়। হিন্দুদর্শন এ কথা বারম্বার বলিয়া দিতেছে। জার্ম্মনদার্শনিক সপেনহর ও(Schopenhauer) এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

"The action of the body is simply the objectified act of the *will*. The whole body is nothing but the will objectified, *i.e.* the will become the notion or representation, the objectivity of the will."

এই (will) বা বাসনা ধ্বংশ করিবার কি কোন উপায় নাই? আছে,উপায় আছে। মানব! নিরাশ হইও না। তুমি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব; বিধাতা তোমায় সমস্ত রূপ অধিকার দিয়া সংসারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। চেষ্টা করিয়া,যত্ন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, বিধাতা তোমার মঙ্গলের জন্য,—তোমার উদ্ধারের জন্য সমস্ত আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তোমার স্বাধীনতা (Free will) দ্বারা সেই আয়োজন গুলি সংগ্রহ ও নিজের উপযোগী করিয়া লইতে পারিলেই হইল। যে কারুণিক, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার বহুপূর্ব্বে মাতৃবক্ষে দুগ্ধ-ভাণ্ডার সৃজন করিয়া তাহাতে অমৃতের ধারা পূরিত করিয়া রাখেন,—সেই মঙ্গলময় পুরুষ,—মনে করিও না যে, তোমার জন্য কিছু অপূর্ণ রাখিয়াছেন! তিনি তোমার

হৃদয়দেশে এরূপ শক্তি নিহিত করিয়াছেন যে, অনুশীলন করিলে, এই তুচ্ছাদপিতুচ্ছ তুমিও একদিন ব্রহ্মভূত হইয়া যাইতে পার! তবে উহা অনুশীলন-সাপেক্ষ। তোমার স্বাধীনতাও সেই অনুশীলনের জন্য। সংসারে সমস্তই আছে, চেষ্টা না করিলে তুমি তাহার কিছুরই অধিকারী নহ।

"* * * A world, where the food does not drop into the mouth and the stream does not leap up at the lips, and no spontaneous blankets fall on and off the shoulders with winter winds and summer heat."

তুমি গোবৎস নহ, যে ভূমিষ্ঠ হইয়াই সন্তরণ দিতে পারিবে। সন্তরণের বীজ তোমাতে উপ্ত রহিয়াছে; অনুশীলন কর দেখিবে উহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তাই বলি উপায় আছে। দর্শনশাস্ত্র তোমায় সে উপায়ও বলিয়া দিয়াছে।

বাসনা ধ্বংশ করিতে হইলে, জ্ঞানচর্চ্চা প্রয়োজনীয়। জ্ঞানাগ্নি বাসনা-জীবকে দগ্ধ করিতে সক্ষম। কিন্তু এই দুরুহ জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে হইলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও শিক্ষা করিতে হয়। একেবারেই জ্ঞানী হওয়া সহজ নহে। চিত্ত শুদ্ধি হইলে তবে তাহাতে জ্ঞানের আলোক প্রতিফলিত হয়। এই চিত্তশুদ্ধিও অভ্যাস-সাপেক্ষ। হঠাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এ রাজ্যে আসুরিক বলে কিছুই হয় না। এ রাজ্যে কৌশল ও অভ্যাস আবশ্যক। প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় কর্ম্মগুলি ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব হইলেও, তাহাদের প্রবৃত্তি-মার্গ ঘুরাইয়া দিয়া কৌশলে এরূপ করা যায় যে, ঐ কার্য্যগুলিই সেইভাবে ক্রমশঃ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া যায়। এইরূপ নিষ্কামভাবে কর্ম্মের অনুশীলন ও অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞান জন্মিলেই বাসনা ধ্বংশ হইয়া যায়। বাসনা ধ্বংশ হইলেই সুখ দুঃখজনিত চিত্তবিক্ষেপ নষ্ট হইয়া মানব মন শান্ত হইয়া যায়। কিরূপে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ভগবদ্‌গীতায় তাহার প্রণালী অতি বিস্তৃতভাবে কথিত আছে। এইরূপে জ্ঞান জন্মিলে, মানব মনে আর নূতন কর্ম্ম বীজ জন্মিতে পারে না। সুতরাং তখন শান্ত সমাহিত হইয়া মানবাত্মা, পরমাত্মার পরমানন্দ পানে বিভোর হইয়া যায়।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালার প্রাচীন কবি।

যাঁহারা স্বকীয় প্রতিভায় এই সঙ্গীতময় রসাল বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা সুদূর অতীতে শস্য-শ্যামলা বঙ্গের শ্যামল বৃক্ষ-ছায়ায় উপবেশন করিয়া বাঙ্গালীর রীতি চরিত্র, আশা আকাঙ্ক্ষা গঠন করিয়াছেন, আমরা সেই প্রাচীন কবিগণকে আর চিনি না। যাঁহারা তাঁহাদিগকে চিনিতেন, যাঁহারা তাঁহাদের মধুর কোমল কাব্যগুলি উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত করিয়া পুষ্প চন্দনে পূজা করিতেন, আমাদের সেই পূজনীয় পিতামহগণ আর নাই। তাঁহাদের সেই কাষ্ঠফলকাবদ্ধ অমূল্যরত্ননিচয় আমাদের অনাদরে ও অবজ্ঞায় কীট দষ্ট হইয়া বা পচিয়া ক্রমে পঞ্চভূতে মিলিয়া যাইতেছে। তৎসহ সেই প্রতিভাবান্ বঙ্গের কৃতী সন্তানগণের নাম চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইতেছে। এখনও যত্ন করিলে ইহাঁদের নাম কথঞ্চিৎ রক্ষা করা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশ কবিজননী। বঙ্গভাষা সঙ্গীতময়। সুদূর অতীত হইতে এ পর্য্যন্ত যে কত কবি এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। বঙ্গের প্রতি প্রদেশ, প্রতি পরগণা কবির আবির্ভাবে পবিত্র। বঙ্গের গৃহে গৃহে সঙ্গীতময় কাব্য। এমন কোন উচ্চ বর্ণের গৃহস্থ নাই, যাহার গৃহে অনুসন্ধান করিলে দুই একখানি প্রাচীন কাব্য না পাওয়া যায়। এমন কোন পরগণা নাই, যেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ দুই একজন কবি জন্মেন নাই। মুদ্রা যন্ত্রের অভাবে, কীটের প্রভাবে, অগ্নিদাহে গৃহস্থের অনাদরে, কত কাব্য যে চিরদিনের জন্য বিলয় পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও বিস্ময়কর। যত্নে সংগ্রহ করিলে যে কোন জাতির সহিত বাঙ্গালী গীতিকাব্য লইয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারেন।

বঙ্গভাষার বাল্যাবস্থায়, রামায়ণ ও মহাভারত প্রধান গীতকাব্য। ব্যাস বাল্মীকির চরণ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কত ভিন্ন ভিন্ন কবি যে রামমঙ্গল ও ভারতমঙ্গল গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। ইদানীং মুদ্রা যন্ত্রের কৃপায় কাশীরাম দাস ও পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝার নাম দিগন্ত বিশ্রুত হইলেও, যাঁহারা প্রাচীন কাব্যাদির কিছুমাত্র অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের পূর্ব্বে ও পরে বহু কবি মহাভারত ও রামায়ণ গীতে পরিণত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকের গ্রন্থ একবারে লোপ পাইয়াছে। অনেকের গ্রন্থ খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, অনেকের গ্রন্থ পূর্ণ অবস্থায় আজিও বিদ্যমান আছে। আমরা যথাসাধ্য এই সকল কবি এবং তাঁহাদের অমৃতময় কাব্যের বিবরণ পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আশা আছে, আমাদের অসম্পূর্ণতা ও অক্ষমতা কালে কোন ভাগ্যবান বঙ্গ সন্তান পূর্ণ করিবেন।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ব্যাস-প্রণীত মহাভারত গীত আকারে রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থারম্ভে কবি ব্যাসের বন্দনায় লিখিয়াছেন—

> "ব্যাসের চরণাম্বুজে মোর নমস্কার ॥
> কৃপাবান হও মোরে দেহ শক্তিদান।
> তোমার রচিত মহাভারতের গান ॥
> গাইব সতত আমি বাঞ্ছা করি মনে।
> তোমার দাসের দাস দ্বিজ ত্রিলোচনে ॥
> রচিল ভারতগ্রন্থ রচিত তোমার।
> হরিপদে সদাচিত্ত রহুক আমার ॥"
>
> আদিপর্ব্ব।

ত্রিলোচন, কিশোর বয়সে এই রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সমগ্র গ্রন্থ আমরা পাই নাই। এই জন্য ত্রিলোচনের পরিচয় ও রচনার কাল জানা যায় নাই। ত্রিলোচনের মহাভারতের যে অংশ আমরা পাইয়াছি, উহা ন্যূন পক্ষে একশত বৎসরের লেখা। যে প্রদেশে উহা পাওয়া গিয়াছে, সে প্রদেশ ত্রিলোচনের নিবাসভূমি নহে। হস্তলিখিত গ্রন্থের বিস্তৃতির কথা মনে করিলে কবিকে অন্ততঃ ২০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

ত্রিলোচনের লেখনী কবিত্বের দিব্য গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থের যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠেই তদীয় অমৃতময় কবিত্বের মধুরতায় মোহিত হইতে হয়। তাঁহার রচনার পরি-

চয় জন্য আমরা উহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।—

কৃষ্ণের বন্দনায়—

"সুশোভন শ্রীচরণে, দেখিয়ে নখের কোণে
লোমকূপে চতুর্দ্দশ পুরী।
মহিমা লাবণ্য বেশ, নিরূপণ করি শেষ
কার শক্তি কহিবারে পারি॥
নবঘন শ্যামতনু, গজকর সম জানু,
শ্যামল সুন্দর কলেবর।
পীতাম্বর পরিধান, মকরন্দ করে পান,
পাদপদ্মে ভকত ভ্রমর॥
আজানুলম্বিত কর, শঙ্খচক্র গদাধর,
সুশোভিত শোভে শতদলে।
সে চাঁদ অধরে সাজে, বিনোদ মুরলী বাজে,
বনমালা বিরাজিত গলে॥
অগোর চন্দন অঙ্গে, শোভে গোরোচনা সঙ্গে
তিলক চন্দন শোভে ভালে।
মস্তকে মুকুট মণি, সহস্র তপন জিনি,
কাণ শোভে মকর কুণ্ডলে॥
জয় প্রভু জগৎপতি, মোরে কর অবগতি,
মোরে প্রভু হও কৃপাবান্।
তোমার চরণ পদ্ম, হৃদয়ে করিয়া সদা,
চক্রবর্ত্তী ত্রিলোচন গান।

ত্রিলোচন প্রথমে, গুরু, গণেশ, কৃষ্ণ ও ব্যাসের বন্দনা, পরে মহাভারতের গুণ কীর্ত্তন ও মহাভারত নাম উৎপত্তির কারণ লিখিয়া 'মার্কণ্ডেয় মুনির বিষ্ণুমায়া দর্শন' নামক উপাখ্যান হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। কাশীরাম যেমন লোকমুখে শুনিয়া 'পয়ার' রচনা করিয়াছিলেন, ত্রিলোচন তাহা করেন নাই। তিনি নিজে সংস্কৃত জানিতেন। গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে শ্লোক উদ্ধার করিয়া অতি সরল অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটী শ্লোক ও তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

তত্রৈব গঙ্গা, যমুনা চ তত্র।
গোদাবরী তত্র, সরস্বতী চ।
সর্ব্বানি তীর্থানি বসন্তি তত্র।
যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গঃ॥

ত্রিলোচনের অনুবাদ—

জাহ্নবী যমুনা গোদাবরী সরস্বতী।
প্রভৃতি যতেক তীর্থ ধরণীতে স্থিতি॥
অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ যথায়।
সকল তীর্থের গম্য জানিহ তথায়॥

ব্যাস-রচিত মহাভারতের সহিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনেক বৈষম্য আছে। ত্রিলোচনের সহিত ব্যাসের অনেকটা মিলের সম্ভাবনা ছিল। কেননা কাশীরামের ন্যায় ত্রিলোচনকে 'কথকের' মুখাপেক্ষা করিতে হয় নাই। তবে সম্পূর্ণ মিল অসম্ভব। কেননা আধুনিক কবিদিগের ন্যায় গ্রন্থের অনুবাদ ইঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল না। মহাভারত অবলম্বনে গীত রচনাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন ও বিশেষ বিশেষ ভাবের স্ফূরণের জন্য ইঁহাদিগকে ব্যাসোক্ত কোন বিষয় পরিত্যাগ, এবং গ্রন্থান্তর হইতে কোন বিষয় সংযোজন করিতে হইয়াছে। আমরা ত্রিলোচন রচিত ভারতরত্ন অখণ্ড পাই নাই। এজন্য ক্ষুব্ধ হৃদয়ে পাঠকদিগকে ত্রিলোচনের ভারতের প্রথম অংশটি উপহার দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

"সর্ব্ব আগে বন্দিলাম শ্রীগুরুচরণ।
যার কৃপালেশে খণ্ডে ভবাদি বন্ধন॥
গুরু কৃষ্ণ এক আত্মা নাহি ভিন্ন ভেদ।
অজ শিব জানে ইহা জানে চারি বেদ॥
গুরু কৃষ্ণ এক আত্মা ভিন্ন বপু হয়।
স্বরূপ বচন ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
গুরুরূপে কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষিতিতে প্রকটে।
শ্রীগুরু করুণা হৈলে কর্ম্ম সূত্র কাটে॥
আগম নিগম শাস্ত্র যতেক পুরাণ।
যজ্ঞ হোম মহোৎসব কর্ম্ম ক্রিয়া দান॥

পর্য্যটন দরশন যতেক তীর্থাদি।
প্রভাস পুষ্কর সুরধুনী সুরনদী॥
গুরুসম তুল্যময় বেদবিধি বলে।
সর্ব্ব তীর্থ ফল পাই শ্রীগুরু সেবিলে॥
গুরু কৃপা বলে মুক্ত হয় পশুযোনি।
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম জানহ তরণী॥
সকলের পরাৎপর গুরু মহাশয়ে।
দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত কটাক্ষে হৃদয়ে॥
চক্ষুদান দিয়া গুরু করিল উদ্ধার।
কোটী কোটী দণ্ডবৎ চরণে তাহার॥
শ্রীগুরু কমল পদে আমার শরণ।
নমো গুরু মহাশয় দুর্গতি ভঞ্জন॥
আমি অতি শিশুমতি কিশোর বয়েস।
অপার মহিমা তব না জানি বিশেষ॥
যে বোলাও তাহা বলি তাহা মাত্র জানি।
শ্রীগুরুচরণ বন্দন লোটায়া ধরণী॥
গুরুকৃষ্ণ পদাম্বুজে রহ মোর মন।
শ্রীগুরু বন্দনা কহে দ্বিজ ত্রিলোচন॥"

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

কবীর-প্রকাশ।

(কবীর সাহেবের মূলদোঁহা ও তাহার পদ্যানুবাদ।)

প্রেম-অঙ্গ।

এহ্‌ তো ঘরহৈ প্রেম্‌কা খালাকা ঘর নাহিঁ।
শীশ্‌ উতরে ভুঁইধরে তব্‌ পৈঠে প্রেম মাহিঁ॥১॥

এইত প্রেমের ঘর মেসোঘর * নয়।
মাথা কাটি তার পর, মাটিতে করিয়া ভর
প্রবেশ করিতে হেথা হয়॥১॥

প্রেম ন বাড়ী উপজে প্রেম ন হাট বিকায়।
রাজা রাণা জো রুচে শীশ্‌ দেয়্‌লে জায়॥২॥

ঘরে না উপজে প্রেম হাটে না বিকায়।
রাজা রাণা ধনীগণে, রুচি হলে প্রেম ধনে
মাথা দিলে তবে প্রেম পায়॥২॥

প্রেম পিয়ালা জো পিয়ে শীশ্‌ দক্ষিণা দেয্‌।
লোভী শীশ্‌ ন দে শকে নাম প্রেমকা লেয়্‌॥৩॥

প্রেমের পিয়ালা পান যেই জন করে
মস্তক দক্ষিণা করে দান,
লোভীজন মাথা দিতে শক্তি নাহি ধরে
সে শুধু প্রেমের করে নাম॥৩॥

আয়া প্রেম কহাঁ গয়া দেখ্‌খা সব্‌ কোয়্‌।
ছিন্‌ রোঁয়ে ছিনমেঁ হঁসে সোতো প্রেম ন হোয়্‌॥৪॥

এই প্রেম এসেছিল গেল বা কোথায়,
সকলে দেখেছে সে সময়,
ক্ষণেক হাসায় আর ক্ষণেক কাঁদায়
সে প্রেমত প্রেম কভু নয়॥৪॥

প্রেম প্রেম সব্‌ কোই কহে প্রেম ন চিন্হে কোয়্‌।
আঠ পহর ভীনা রহে প্রেম কহাওয়ে সোয়॥৫॥

কথায় ত প্রেম প্রেম সকলেই বলে
কেহত চিনে না প্রেম কি যে,
সেইত প্রকৃত প্রেম যার স্পর্শ ফলে
দিবা নিশি প্রাণ থাকে ভিজে॥৫॥

প্রেমীঢূঁড়ত মৈ ফিরুঁ প্রেমী মিলে ন কোয়্‌।
প্রেমী সোঁ প্রেমী মিলে গুরু ভক্তি দৃঢ় হোয়্‌॥৬॥

কত ঘুরিতেছি প্রেমিকের অন্বেষণে
প্রেমিক মিলে না এক জন,
প্রেমিক হইলে মিলে প্রেমিকের সনে
দৃঢ় হয় গুরু-পদে মন।

জা ঘট প্রেম ন সঞ্চরে তা ঘটজান মশান।
জৈসে খাল লুহারকী শ্বাস লেত বিন প্রাণ॥৭॥

যে দেহে না হলো হায় প্রেমের সঞ্চার
সে দেহ ত নিশ্চয় মশান,
প্রাণহীন দেহে যেন নিশ্বাস তাহার
কামারের ভস্ত্রার সমান॥৭॥

* হিন্দুস্থানে একটী প্রচলিত কথা আছে "এতো মসো ঘর নয় যে অনায়াসে অবাধে ঢুকিবে?"

প্রেম বণিজ নহিঁ কর শকে চড়ে ন নামকী গৈল,
মানুষকেবী খালরী ওড়ফিরে জেয়োঁ বৈল ॥৮॥

প্রেমের বাণিজ্য নাহি জানে সেই জন,
নামের গলিতে * নাহি যায়,
মানুষের আবরণ করিয়া ধারণ,
পশুহেন ঘুরিয়া বেড়ায় ॥৮॥

প্রেম বিনাধীরজ নহী বিরহ বিনা বৈরাগ।
সত্‌গুরু বিনা মিটে নহি মন মন্‌সাকা দাগ ॥৯॥

প্রেম বিনা ধৈর্য্য শিক্ষা কভু নাহি হয়,
বিরহ বিহনে নহে বৈরাগ্য উদয়।
সদ্গুরুর কৃপা যদি ভাগ্যে নাহি জুটে,
হৃদয়ের দাগ আর কিছুতে না ছুটে ॥৯॥

জহাঁ প্রেম তহাঁ নেম নহি তহাঁ ন বুধ ব্যোহার।
প্রেম মগন জব্ মনভয়া তব্ কোন্ গিনে তিথিবার ॥১০॥

প্রেমের বাজারে নাই নিয়মের মেলা,
পীরিতির ঘরে নাই পাণ্ডিত্যের খেলা,
প্রেমের সাগরে মগ্ন হয় যবে মন
কোন্ তিথি কোন্ বার কে দেখে তখন? ১০

প্রেম পাউরী পহর কর ধীরজ কাজল দেয়্,
শীল সিন্দুর ভরায় কর এয়ো পিউকা সুখলেয়্ ॥১১॥

প্রেমের পাঞ্জুরী পর যুগল চরণে,
ধৈর্য্যের কাজল দাও যুগল নয়নে,
শীলতার সিন্দুর শিথীর'পরে পর,
প্রিয়তম সঙ্গে রঙ্গে সুখেবাস কর ॥১১॥

প্রেম ছিপায়া না ছিপে জা ঘট পরঘট হোয়্।
জোপৈ মুখ বোলে নঁহি তো নৈন দেতহৈ রোয় ॥১২॥

হৃদয়েতে হয় যদি প্রেমের বিকাশ
ঢাকিলে না রাখা যায় ঢাকি,
বদন যদি বা তার নাদেয় আভাস
কাঁদিয়া প্রকাশ করে আঁখি ॥১২॥

পীয়া চাহে প্রেমরস রাখা চাহে মান।
এক ম্যানমে দোখড়গ্ দেখাশুনা ন কান ॥১৩॥

বাসনা মনেতে করে প্রেমরস পান,
অথচ রাখিতে চাহে আপনার মান,
কথন ত দেখিনাই শুনি নাই কাণে,
দুইখানি খড়্গথাকে একই পিধানে ॥১৩॥

পিয়ারস পিয়া সো জানিয়ে উতরে নহী খুমার।
নাম অমল মাতারহে পিয়ে অমীরস সার ॥১৪॥

প্রিয়ের সে প্রেমরস যার ভাগ্যে জুটে,
নেশার আবেশ তার কখন না ছুটে,
সুধারস সার পান করি সেই জন,
নাম-মদিরায় মত্ত থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥১৪॥

কবীর প্যালা প্রেমকা অন্তর লিয়া লগায়।
রোম রোমমে রমি রহা আওর অমল ক্যা খায় ॥১৫॥

কবীর কহেন এই অন্তরে আমার,
প্রেমের পিয়ালা লাগায়েছি অনিবার,
রোমে রোমে প্রেমানন্দে ভিজা এ শরীর
বল আর কোন্ নেশা খাবেন কবীর? ॥১৫॥

কবীর ভট্টী প্রেমকী বহুতক বৈঠে আয়।
শির্ সোঁপে সো পীয়সী নাতর পিয়া ন যায় ॥১৬॥

কবীর কহেন হেন আছে বহু জন,
প্রেমের ভাঁটিতে আসি বসে অনুক্ষণ।
কিন্তু যেই মাথা দেয় সেই করে পান,
নতুবা পানের আর নাহিক বিধান ॥১৬॥

জব্ মৈঁথা তব্ গুরু নহী অব্ গুরুহৈ হাম নাহি।
প্রেমগলি অতি সাঁকরী তামেঁ দো ন সমাহি ॥১৭॥

না ছিলেন গুরু আমি ছিলাম যথন,
আমি নাই তাই গুরু আছেন এখন।
জানিও প্রেমের গলি সংকীর্ণ এমন।
একত্র চলিতে তাতে না পারে দুজন। ১৭।

নৈনোকী কর কোঠরী পুতলী পলঙ্গ্ বিছায়।
পলকোঁকো চিক্ ডাল্‌কে পিয়াকো লিয়ারিঝায় ॥১৮॥

কুঠরী করিয়া লও দুইটী নয়নে,
পুতলি পালঙ্ক তাহে বিছাও যতনে,
পলকের চিক্ টাঙ্গাইয়া চারি ধার,
প্রিয় সঙ্গে রঙ্গে কর আনন্দ-বিহার ॥১৮॥

---

* নাম সাধনের প্রণালীতে।

জব্ তক্ মরণে সে ডরে, তব লগ্ প্রেমী নাহি।
বড়ী দূরহৈ প্রেম ঘর সমঝ লেহু মন মাহি ॥১৯॥

যত দিন থাকে প্রাণে মরণের ভয়
প্রেমিক সে হইবে কেমনে ?
প্রেমের যে ঘর সেত দূর অতিশয়
ভাবিয়া দেখনা কেন মনে? ॥১৯॥

লৌলাগি তব্ জানিয়ে ছুট্ন কবহু যায়্।
জীবত্ লৌলাগিরহে মুএ মাহি সমায় ॥২০॥

অন্তরে লাগিলে প্রেম জানিও তখন
পলক লালসা নাহি টুটে।
হৃদয়ে লাগিয়া রহে জীবন্তে যেমন
মরিলেও সঙ্গে সঙ্গে চটে ॥২০॥

লৌলাগি কল্ না পড়ে আপবিসরজন দেহ্ (দেঃ)
অমৃত পীয়ে আত্মা গুরুসে জুড়ে সনেহ (সনেঃ) ॥২১॥

প্রেমিকের বিরাম বিশ্রাম কোথা আর?
আত্ম বিসর্জ্জন যার দান,
গুরু সঙ্গে প্রেম যোগে যুক্ত হ'য়ে তাঁর
আত্মা সদা সুধা করে পান ॥২১॥

জৈসী লৌ পহিলে লগী তৈসী নিবহে আওর।
আপ্নি দেহ কি কো গিনে তারে পুরুষ করোর ॥২২॥

নব অনুরাগ-স্রোত যেই বেগে ধায়।
সেভাবে বহিলে অনিবার।
আপনার দেহের দিকেতে কেবা চায়
কোটী জনে করয় উদ্ধার ॥২২॥

লাগি লাগি ক্যাকরে লাগি নাহি এক্।
লাগি সোই জানিয়ে জো করে কলেজে ছেক ॥২৩॥

প্রেমিক প্রেমিক বল, প্রেমিক কোথায়?
প্রেমিক দেখি না এক জন,
জানিও প্রেমিক সেই যেই জন হায়,
হৃদ্পিণ্ড করেছে ছেদন ॥২৩॥

লগী লগন ছুটে নহী জীভ্ চোঁচ্ জরু জায়।
মীঠা কহা অঙ্গারকো জাহি চকোর চবায় ॥২৪॥

প্রেমিকের প্রেম কভু নাহি ছুটে জানি
জিহ্বা ওষ্ঠ যদি জ্বলে যায়,
উত্তপ্ত অঙ্গার খণ্ড তারে মিষ্ট মানি
চকোর যেমন তাহা খায় ॥২৪॥

জোতু পিয়াকী প্যারণী আপনা কর লেরী।
কলহ কল্পনা মেট্‌কে চরণো চিত্ দেরী ॥২৫॥

প্রিয়র প্রেয়সী যদি হও গো সুন্দরি,
রাখ তাঁরে করিয়া আপন।
কলহ কল্পনা সব দূরে পরিহরি
চিত্ত কর চরণে অর্পণ ॥২৫॥

পিয়াকা মারগ্ কঠিন হৈ খাড়া হো জৈসে।
নাচন নিকসী বাপুরী ফির ঘুংঘট কৈসে ॥২৬॥

প্রিয়র যে পথ তাতে সুকঠিন চলা
সেই পথ যেন খাঁড়া ধার।
নাচিতে বাহির যদি হয়েছ গো বালা
কেন তায় ঘোম্‌টা আবার ? ॥২৬॥

যা খোজত ব্রহ্মা থকে সুর নর মুনি দেবা।
কঁহে কবীর শুন সাধবা কর সদ্‌গুরু সেবা ॥২৭॥

যাঁর অন্বেষণে ক্লান্ত নর ঋষি সবে,
ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ,
কবীর কহেন শুন সাধুগণ তবে
সেবা কর সদ্গুরু চরণ ॥২৭॥

এহ্ তো ঘর হৈ প্রেম্‌কা মারগ অগম অগাধ।
শীশ্ কাট্ পগ্‌তল্ ধরে তব্ নিকট প্রেম্‌কা স্বাদ ॥২৮॥

এই ত প্রেমের ঘর, সে ঘরে যে চলে
(পথ অতি অগম অগাধ,)
মাথাটী কাটিয়া রাখি চরণের তলে
তবে ত প্রেমের পায় স্বাদ ॥২৮॥

প্রেম্ পিয়ালা ভরপিয়া রাচ্ রহে গুরু জ্ঞান।
দিয়া নগাড়া প্রেম্‌কা লাল খড়ে মৈদান ॥২৯॥

প্রেমের পিয়ালা করি ভরপুর পান,
অতিশয় দৃঢ় হয় গুরুপদে জ্ঞান।
প্রেমের দামামা যাই বাজিয়া উঠিল
গুরুর সে প্রিয় শিষ্য মাঠে দাঁড়াইল ॥২৯॥

প্রেম বিকন্তা মৈ শুনা মাথা সাটে হাট।
পুছত বিলম্বন কীজিযে তত্‌ছিন্ দীজে কাট ॥৩০॥

মাথার দরেতে প্রেম হাটেতে বিকায়
এই কথা করিনু শ্রবণ,
জিজ্ঞাসিতে দেরি তবে করোনা বৃথায়
কেটে দাও তখন তখন ॥৩০॥

জোতু প্যাবা প্রেমকা শীশ্‌ কাট কর গোব।
জবতু য্যাসা করেগা তব্‌ কুছহোয তোহোয ॥৩১॥

প্রেমের পিয়াসা যদি হয়ে থাকে মনে
মাথা কেটে ফেলে দাও তবে,
এরূপ করিতে যবে পারিবে তখনে
যদি কিছু হয় তবে হবে ॥৩১॥

প্রেম্‌ প্রীতমে রঁচ রহে মোক্ষ মুক্তিফল পায়।
শব্দ মাহিঁ তব্‌ মিল রহে নহী আওবে নহি যায় ॥৩২॥

প্রেমেতে প্রীতিতে যার রুচি থাকে মনে
মোক্ষ মুক্তি ফল সেই পায়।
শব্দের সঙ্গেতে থাকি অভেদ মিলনে
আর কভু না আসে না যায় ॥৩২॥

আওর সুরৎ বিসরী সকল লৌলাগি রহে সঙ্গ।
আও জাও কাসোঁ কহুঁ মন রাতাগুরু রঙ্গ ॥৩৩॥

অন্যস্মৃতি যাহাকিছু সব গেল ভুলি
প্রেমে মগ্ন চিত্ত অনুক্ষণ,
হেথা এসো হোথা যাও কাকেইবা বলি
গুরুরঙ্গে রঙ্গিয়াছে মন ॥৩৩॥

জব লগ্‌ কথনী হম্‌ কথী দূর রহা জগদীশ্‌।
লৌলাগি কল না পড়ে অব বোল্‌না হদীস ॥৩৪॥

ততদিন বহুদূরে ছিলেন ঈশ্বর,
ছিনু যবে বক্তৃতার ঘোরে,
এবে চিত্ত প্রেমে মগ্ন নাহি অবসর,
এখন যা কথা ঠাবে ঠোরে ॥৩৭॥

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

উদ্বাহ-বিচার। (৩)

কন্যাবিক্রেতাগণের পাশব ব্যবহার এবং অতিরিক্ত পণভার হেতু সমাজে যে সকল অনিষ্টকর ব্যাপার সর্ব্বদা ঘটিতেছে, আমরা তাহার একটী তালিকা সংগ্রহ করিয়াছি; কিন্তু বাহুল্য ভয়ে সমস্ত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম না। নমুনা স্বরূপ দুই চারিটী ঘটনার কথা মাত্র পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। বর্ত্তমান সমাজ যে কি ভয়ঙ্কর হিংস্রতার আবাস স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আশা করি ইহা দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে। ঘটন সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণের নাম, ধাম ইত্যাদিও সংগ্রহ করিয়াছি। নাম প্রকাশ করিলে হয়তো অনেকেই আমাদের প্রতি রুষ্ট হইবেন, তাই ক্ষান্ত রহিলাম। আবশ্যক হইলে সময় মতে তাহাও প্রকাশ করিব।

হাবড়াতে এগার মাস বয়সের একটী কন্যা এগার শত টাকা পণ গ্রহণে ৩৪ বৎসর বয়স্ক এক যুবকের নিকট বিবাহ দেওয়া হইয়াছে; এবং বীরভূমের অন্তর্গত মোহনপুর গ্রাম নিবাসী ভট্টাচার্য্য বংশীয় কোনও ব্যক্তি ৩০ বৎসর বয়সে,পনর মাস বয়ঃক্রমের একটী মেয়ে সাড়ে সাত শত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়াছেন! এই প্রকারের অসাময়িক ও অস্বাভাবিক বিবাহ একমাত্র কন্যাকর্ত্তাগণের অর্থ-লালসা হেতুই সঙ্ঘটিত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা বেশী পণ দিতে হইবে বলিয়াই বরপক্ষও এই প্রকারের অপগণ্ড শিশু-বিবাহ করিতে সম্মত হয়। সমাজে এই প্রকারের ঘটনা অনেক ঘটিতেছে; ভবিষ্যতে আরও যে কত ঘটিবে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে?

এই ত গেল শিশু পাত্রীর বিবাহের কথা। বুড় বরের বিবাহের কথা ভাবিতে গেলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কন্যাবিক্রেতাগণ কন্যা সমর্পণের পাত্রাপাত্র বিবেচনা করেন না,তাঁহাদের কেবল টাকার দিকেই নজর। এ কথার প্রমাণ জন্য নিম্নে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছিঃ—

বর্দ্ধমানের মহারাণীর জনৈক উপগুরু ৬৩ বৎসর বয়সে ১২ বৎসর বয়ঃক্রমের একটী কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরিশালে, উত্তর সাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুরের কর বংশীয় কোনও মহাত্মা ৮৪ বৎসর বয়সে, এক সরলা বালিকার মাথা খাইয়াছেন। উক্ত জিলায় রায়েরকাঠি নিবাসী জনৈক ভট্টাচার্য্য ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ৯ বৎসরের একটী বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জ সবডিভিসনের এলাকায় বারিসার নিবাসী চক্রবর্ত্তী বংশীয় কোনও ব্রাহ্মণ ৭০ বৎসর বয়সে কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী কয়বা গ্রামের ৭ বৎসর বয়সের একটী বালিকার পাণি-পীড়ন করিয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে ষোল শত টাকা পণ দিতে হইয়াছিল। পণ প্রভাবে এই প্রকারের কত অনিষ্টকর ঘটনা যে অহরহঃ সমাজে ঘটিতেছে, তাহার খোঁজ কে লয়?

লোক আপনার পালিত গরুটী বিক্রয় করিবার সময়ও একটুকু ইতস্ততঃ করে। যাহার নিকট বিক্রয় করিতেছে, সে কি প্রকৃতির লোক, গরুটী যত্নে রাখিবে কি না, এবং উপযুক্তরূপে আহার যোগাইবে কি না, ইত্যাদি বিষয় একবার ভাবিয়া দেখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সমাজের কন্যাবিক্রেতা মহাপুরুষেরা আপন আপন আত্মজাগণকে সামান্য গরু অপেক্ষাও উপেক্ষণীয় মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেবল কন্যার দর বৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি রাখেন, তাহার সুখ দুঃখের কথা একবারও ভাবেন না। এই সকল অভিভাবকও যদি মনুষ্য নামের অধিকারী হয়, তবে আর রাক্ষস কাহাকে বলিব? ইহারা যদি জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে সম্মান লাভ করিতে পারে, তবে এই ভূ ভারতে নিরয়গামী জঘন্য লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কন্যার বাজার দর-দেখাইবার নিমিত্ত আরও কয়েকটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। ফরিদপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ঢেউখালী নিবাসী জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাড়ে তেরশত টাকায় পাত্রী ক্রয় করিয়াছিলেন। টাঙ্গাইলের এলাকাস্থ আড়ুবা নিবাসী কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তেরশত টাকা পণ দিয়া, ফরিদপুর জিলার পোড়াগাছা নিবাসী কালী কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় চৌদ্দশত টাকা মূল্যে, এবং বরিশাল জিলার ভোলা মুনসেফী আদালতের সেরেস্তাদার বাবু বিনোদলাল ঠাকুরতা মহাশয় সাড়ে বারশত টাকাপণে কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। এই প্রকারের আরও অনেক সংবাদ আমরা অবগত আছি, তাহা সম্যক রূপে উল্লেখ করা অসম্ভব।

পাত্রীর বাজার এইরকম গরম হইলে সকলের পক্ষে বিবাহ ঘটিয়া উঠা সহজ নহে। বিশেষতঃ সামান্য গৃহস্থের সংসারে তিন চারিটী অবিবাহিত পুরুষ থাকিলে, তাহাদের সকলের বিবাহ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব; সমাজে এ কথার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এমনও দেখা গিয়াছে, অর্থাভাবে পণ যোগাইতে অসমর্থ হেতু অনেক ব্রাহ্মণের ভাগ্যে এ যাত্রায় আর বিবাহ ঘটিয়া উঠিল না। কাজেই তাহাদের বংশলোপ হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে। এই প্রকারের অন্ততঃ দুই একটী ঘটনাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, এমন লোক অতি অল্পই পাওয়া যাইবে। সমাজের দুর্দ্দিন ও দুরবস্থা ইহা অপেক্ষা বেশী আর কি হইতে পারে? আজকাল মেয়ের বাজার কটুকু নামিয়াছে বটে, কিন্তু এখনকার

প্রচলিত পণ-ভার বহন করিয়া বিবাহ করাও যে সে লোকের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে।

পাত্রী বিক্রয়ের ফল, আমাদের সমাজে, বর বিক্রয়ের ফল অপেক্ষা অধিকতর বিষময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কন্যার বিবাহ দেওয়া আজ কালের হিন্দু সমাজে কষ্টকর হইলেও, এপর্য্যন্ত ভিন্ন জাতীয় পাত্রে কন্যা সম্প্রদান হওয়ার কথা শুনা যায় নাই। কিন্তু পাত্রী ক্রয় কবিতে যাইয়া, অনেক সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ জাতি কুল পর্য্যন্ত খোয়াইয়াছেন। কন্যার বাজারে দর ও কাট্‌তি দেখিয়া, অনেক ধূর্ত্ত লোকের অর্থ-লালসা জাগিয়া উঠিল। তাহারা ভিন্নদেশ হইতে নানাবিধ অন্ত্যজ জাতির কন্যাকে—অনেকস্থলে বেশ্যাদিগকে পর্য্যন্তও অর্থে বা প্রলোভনে বশীভূত কবিয়া, ব্রাহ্মণের কন্যা পরিচয় দিয়া, নানা স্থানে লইয়া চলিল। পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণ ভাষায় এই শ্রেণীর পাত্রীগণ "ভরার মেয়ে" বলিয়া অভিহিত। চক্রান্তকারিগণের কেহ পাত্রীর পিতা, কেহ পিতৃব্য এবং কেহবা ভ্রাতা সাজিয়া, দেশে যে দরে পাত্রী বিক্রয় হয়, তাহাদের আমদানীকরা পাত্রী তদপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় করিতে লাগিল। অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অভাব হেতু ঐ সকল সম্ভাদরের পাত্রী ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল হতভাগার দুরবস্থার কথা স্মরণ করিলে যুগপৎ লজ্জা ও বিষাদের উদয় হয়। ইহাদের আর্থিক অপচয়ের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, অন্ত্যজ জাতির কন্যা বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া অনেকেই সমাজচ্যুত বা জাতিচ্যুত হইয়া অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা বিবাহ-বিভ্রাট ও সমাজ-বিপ্লবের দিন আরও আসিবে কি? এই শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির নাম ধাম আমরা অনুসন্ধান দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছি; তাহা প্রকাশ করাতে সমাজের কলঙ্ক ঘোষণা ব্যতীত অন্য কোনও ফল নাই।

কতিপয় কন্যাপণ-প্রথা-সমর্থনকারী লোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ আছে। তাঁহারা বলেন, কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত থাকায় আমাদের সমাজে দুইটী উপকার সাধিত হইতেছে;—

(১ম) অনেক দরিদ্র ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করিয়া সম্পত্তিশালী হইতেছেন।

(২য়) সমাজে বাল্য-বিবাহের পরিমাণ কমিতেছে।

আমরা কিন্তু এই দুই কথার একটীকেও সমর্থন করিতে পারিতেছি না। সত্যবটে, অনেকে কন্যা বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থ লাভ করিতেছেন, কোন কোন মহাপুরুষ উপর্য্যুপরি চারি পাঁচটী পর্য্যন্ত মেয়ে বিক্রয় করিয়া, অনেক সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত করিয়া, আপনাদের অর্থ-পিপসা মিটাইতেছেন, কিন্তু অবস্থা ফিরিয়াছে কয়টী লোকের বল দেখি? না হয় মানিয়া লইলাম, অবস্থা ফিরিয়াছে কিম্বা ফিরিতে পারে। একই সমাজের একজনকে নির্ধন করিয়া আর একজন ধনী হইলে মূলতঃ লাভ লোকসান কিছুই হয় না; লাভের মধ্যে একটী ঘোর পাপকার্য্য প্রশ্রয় পায়। অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে উপায়টী সৎ কি অসৎ, ইহাও বিবেচনা করা উচিত। অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের পথ বন্ধ করা নীতিজ্ঞ ও বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। চৌর্য্য এবং দস্যুতা দ্বারাও লোক ধনী হইতে পারে; বিদেশী লোকের টাকা কড়ি চুরী বা লুঠপাট করিয়া আনিলে তাহাতে বরং দেশের মূলধন মূলতঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তবে কি চুরী এবং ডাকা-

ইতি সমাজের কল্যাণকর? কন্যা বিক্রয় যে একটী অসৎ কার্য্য, তাহা আমরা দৃষ্টান্ত এবং শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি। উহা চৌর্য্য এবং দস্যুতা হইতেও ঘৃণনীয়।

কন্যাপণ প্রথা পোষণ-কারিগণের শেষোক্ত কথাটীও নিতান্ত অমূলক। সচরাচর দেখা যায়, কন্যার অভিভাবকগণ অর্থলোভে অতি অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন; আমরা এবিষয়ের দুই একটী দৃষ্টান্তও দিয়াছি, সুতরাং এস্থলে, কন্যাপক্ষে, তাহাদের যুক্তি কোন ক্রমেই দাঁড়াইতে পারে না। মূল্য বৃদ্ধির দুরাশায় কোন কোন ব্যক্তি কন্যার বয়স বেশী করিয়া বিবাহ দেন বটে, কিন্তু ঐ প্রকারের ঘটনা শতকরা দশটী ঘটে কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ যে মন্দ অভিপ্রায়ে কন্যাগণের ঐরূপ বয়ঃবৃদ্ধি করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা ভাবিলে দেখা যাইবে, সেই বিবাহে সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইতেছে। পক্ষান্তরে, পণ যোগাইতে অশক্ত বলিয়া অনেক পুরুষ উপযুক্ত সময়ে বিবাহ করিতে পারিতেছেন না। এই ব্যাপার দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, পুরুষের বাল্য বিবাহ দিন দিন কমিয়া সমাজের উপকার সাধন করিতেছে। কিন্তু এইরূপ বাল্য-বিবাহের বাধাতে বঙ্গদেশের অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার উচ্ছন্ন হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন, কন্যার বাজার দর এই প্রকার চড়া থাকিলে বঙ্গদেশের বংশজ, শ্রোত্রীয় প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণকুল কালে একবারে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে। কামরূপ হইতে একজন লিখিয়াছেন, কন্যাপণের পরিমাণাধিক্য হেতু তদঞ্চলের ব্রাহ্মণ বংশ একবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। বিপক্ষগণ বোধ হয় মেলথাসের থিওরি আবৃত্তি করিয়া বলিবেন, ইহাও সমাজের মঙ্গলকর ঘটনা! আমরা এই মঙ্গলের পায়ে শত শত নমস্কার করি।

এই গেল এক ফল। এই প্রকার বাল্য-বিবাহ নিবারণের দ্বিতীয় ফল, অনূঢ়া বাল-বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি। অধিকাংশ স্থলে ৪০ বৎসরের পুরুষের সহিত ৭ বৎসর বয়সের বালিকার বিবাহ হয়। কোন কোন স্থলে ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে কচি বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে। আজ কালকার মানুষের গড়পরতা আয়ুষ্কাল যে রকম, তাহাতে এইরূপ বিবাহ যে বালিকার বৈধর্ব্ব দশার পূর্ব্ব সূচনা, তাহা বলা বাহুল্য। আবার, স্ত্রী পুরুষের এই রকমের অসম বয়সে বিবাহের ফল যে কত বিষময়, সে কথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

এবম্বিধ বাল্য-বিবাহ নিবারণে আরও একটী ফল আছে। এই প্রথায় অনেককে বাধ্য হইয়া, আজীবন কৌমার্য্য অবলম্বন করিতে হয়। যাঁহাদের কপালে বিবাহ ঘটে, তাঁহারাও প্রায়ই যৌবন অতীত হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারেন না। ইহাঁরা সকলেই মুণিব্রতধারী, তাহা নহে। ইন্দ্রিয়ের উদ্বেগ, অত্যাচার সকলের ন্যায় ইহাঁদিগকেও ভোগ করিতে হয়। সুতরাং ইহাঁরা যে অবসর ও সুবিধামত সমাজের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছেন না, ইহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে?

কন্যা বিক্রয় প্রথা যে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং সমাজের অহিতকারী, এ কথা আমরা কথঞ্চিৎরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। পুত্র-পণ প্রথার ন্যায় কন্যা বিক্রয় প্রথা দ্বারাও সমাজ দিন দিন হীন ও দরিদ্র হইতেছে। বিশেষতঃ পুত্র অপেক্ষা কন্যাগণ পিতা মাতার নিতান্ত মুখাপেক্ষী। সামা-

জিক নিয়মে বিদ্যাজনিত জ্ঞানে ইহারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আপনার হিতাহিত বিচারে ইহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। তাহাতে আবার অতি অপরিপক্ক বয়সে—অধিকাংশ স্থলে অতি শৈশবেই ইহাদের বিবাহ হয়। এই রূপ নিঃসহায় এবং আশ্রিত হৃদয়সম কোমল লতিকাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা কত দূর যে নৃশংসতার কার্য্য, তাহা আর কি বলিব?

আমাদের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা, ভগবানের আশীর্ব্বাদে, এই সকল ঐহিক ও পারত্রিক অহিতকর ব্যাপারের প্রতি সমাজের কর্ত্তাগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক,—সমাজে ফুল চন্দন বর্ষিত হউক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

নীতিশিক্ষা। (২)

ইংরাজ রাজত্বে নীতিশিক্ষা সম্ভব কি না?

নীতিশিক্ষা বিষয়ে গত ফাল্গুন মাসের নব্যভারতে যাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহাতে বিদিত হইবে যে, ইংরাজী চর্চ্চা দ্বারা শত বৎসরেও আমাদের উপযুক্ত নীতি শিক্ষা হইল না। আর, এই প্রণালীর শিক্ষা দ্বারা কস্মিন্ কালে এদেশীয়েরা প্রকৃত প্রস্তাবে নীতিমান হইবে, তাহারও চিহ্ন দেখা যায় না। তবে কি ইংরাজ রাজত্বে আমাদের নীতিশিক্ষা অসম্ভব? তাহাও তো বিশ্বাস করিতে মন চাহে না। ইংরাজ রাজত্বের অস্তিত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। কিন্তু নীতিবিহীন হইয়া তো থাকিতে পারিব না।

বিপন্নায়াং নীতৌ সকলমবশং সীদতি জগৎ।

নীতিবিহীন হইলে জগতের সকলই অবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমাদের সেই দশা নিকটবর্ত্তী হইতেছে। অতএব আমরা এই দুর্গতি পরিহারের জন্য ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদা প্রার্থনা করি, ইংরাজ-রাজ যথার্থ ধর্ম্মরাজের ন্যায় আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম রক্ষা করুন।

আমাদের ন্যায় অনুকূল প্রজাদিগকে লইয়া রাজা অসাধ্য-সাধন করিতে পারেন। যে গুণে সহস্র ক্রোশ অন্তরে থাকিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতের উপর অখণ্ড শাসন বিস্তার করিতেছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোক তাহা নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া অবাক্ হইয়া আছে, সেই গুণে তাঁহার রাজ্যের প্রজাদিগের নীতিপালন-ঘটিত সুখ সম্পদ ও মঙ্গল দৃশ্য সকলকেই চমৎকৃত করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই।

ইংরাজ রাজার অধীনতায় এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখ, পারসি, ও তাহাদের নানা শাখায় বিভক্ত শত সম্প্রদায়ের লোক বাস করিতেছে। সকলের পক্ষে রাজার সমদৃষ্টি এবং এক নীতি থাকা আবশ্যক। ইংরাজ ভূপতি প্রজাদিগের সহস্র প্রকার রীতি নীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম দর্শন করিতেছেন, তন্মধ্যে কোন্‌টীকে আদর ও কোন্‌টীকে অনাদর করিবেন? এই জন্য তাঁহাকে সাধারণ বিদ্যালয়ে কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনের ব্যবস্থা রাখিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিতে হইতেছে। অথচ নীতি শিক্ষার অভাবে দেশে সর্ব্বাঙ্গীন সুশাসন স্থাপন হয় না, এজন্য মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিতেও হইতেছে। যাহা হউক তথাপি ইংরাজ প্রভু নিষ্কলঙ্ক রাজ-

নীতি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, বলিতে হইবে। এবম্প্রকার বিশাল ভারত মধ্যে যে একছত্র রাজ্যাধিকার, তাহাও দুর্লভ ছিল। ঈশ্বর ইচ্ছায় তাহা সুসাধিত হইয়াছে। ভারতীয় সমস্ত রাজগণ বহুকাল হইতে বিবাদ-পরায়ণ হইয়া পরস্পরের বল ক্ষয় করিতেছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে, সেই শোচনীয় অন্তর্বিবাদের শান্তি হইয়াছে। আর কিছু না হইলেও, ব্রিটিস্‌সিংহ দ্বারা এই বিনয় স্থাপনকে অতি শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিতে হয়।

এরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজগণ এ দেশীয় রাজ্যারম্ভে আমাদিগকে নির্ব্বিবাদে কাল হরণ করিবার এক পাট্টা দিয়াছিলেন। আর দেশীয় লোকেরাও তাহার কবুলতি দিয়াছেন। দুই পক্ষে দুই প্রধান ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। পাট্টাদাতা—স্যর্ উইলিয়ম জোন্স ; কবুলতি-দাতা—জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। কবুলতির নাম—বিবাদ ভঙ্গার্ণব। (স্যর্ উইলিয়ম জোন্স জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন দ্বারা হিন্দু আইনের সার সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে একখানি গ্রন্থের নাম বিবাদ ভঙ্গার্ণব) এই বিবাদ ভঙ্গার্ণব তন্ত্রে পরম্পরায় সকলেই বশীভূত হইয়া ক্রমে সকল বিবাদ ভঙ্গ করিয়া ফেলিতেছেন। ইহাতে নীতিশিক্ষার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। এখন আশা করা যাইতে পারে যে, অতঃপর শান্তভাবে সকলে নীতি চর্চ্চা করিতে সমর্থ হইবেন।

এই আশা যদি সকলের মনে স্থান না পায়, তাহার এই কারণ বলিতে পারি যে, তাহাদের মনে এখনো বিবাদের কণা রহিয়াছে। বিবাদ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইলেই নীতিশিক্ষার পক্ষে আর কোন বাধা বা অভাব থাকিবে না। এই বিষয়ে সংশয় পরিহারের জন্য ইহা আলোচনা করা আবশ্যক যে, পূর্ব্বে কি বিবাদ ছিল ; কি প্রকারে তাহার ভঙ্গ বা নিবারণ হইতেছে ; এবং অতঃপর কিরূপ নীতিশিক্ষা সম্ভব।

১। এ দেশের রাজায় রাজায় বিবাদ। এই বিবাদানলে মোগল, পাঠান, রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় নরপতিগণ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়াছেন। দীর্ঘকালের এই কাল-অনলে এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইয়াছে,—"হে ভারতের রাজা,সর্দার ও অধিবাসীগণ! তোমরা কেহই স্বাধীন নহ। তোমরা এক চক্রবর্ত্তী রাজার অধীন। সেই চক্রবর্ত্তী রাজা বা সম্রাট তোমাদের দেশের মধ্যে কেহই নয়। অতএব তোমরা চক্ষু-শূল ত্যাগ করিয়া সুখী হও। তোমরা প্রসন্ন নেত্রে দেখ,—তোমাদের সাম্রাজ্য-শক্তি সমুদ্র পারে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। সেই অতুল শক্তির অধিকারিণী মহামহিমান্বিত শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ব্রিটনেশ্বরী। আর যাঁহারা তোমাদিগকে স্বল্পকাল মধ্যে কর-কবলিত করিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং ইংলণ্ডাধিপতি নহেন, তদ্দেশবাসী কতিপয় সমবেত বণিক্ মাত্র।" এবম্বিধ অবসন্নদশার মূল স্বরূপ হিংসা দ্বেষ ও অন্তর্বিবাদকে দূরে ত্যাগ করিয়া এক্ষণে এতদ্দেশীয়েরা নীতিপালন করাকে অতীব কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেন। কারণ তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন,—"বিপদন্তা হ্যবিনীত সম্পদঃ।"

২। হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ। এই বিবাদ কেবল হিন্দুদিগের পূর্ব্বাচরিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ঘটিয়াছিল, বলিতে হইবে। "দারুণ রক্তপাতে এবং 'জহর ব্রতের' অনল শিখায় সেই পাপের" শান্তি ভোগ হইলে

বিবাদ আপনা হইতে প্রশমিত হইয়াছে। এক্ষণে হিন্দু মুসলমান উভয়েই তুল্য তপস্বী। উভয়েই শৌচাচার-রত ও পরমার্থ-পরায়ণ। হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও বলেন,—বাসনা-নাশের দ্বারাই পরমার্থ সাধন হয়। তন্নিমিত্ত এই তিনটী অস্ত্র অবলম্বনীয়।—

খাঞ্জরে খামুসি ওসাম্‌সিরে জো।
নেজ্‌য়ে তন্‌হাই ওতর্‌কে হেজো॥

অর্থাৎ (১) মৌনব্রতরূপ খড়্গ, (২) ক্ষুধা দমনরূপ তরবারি এবং (৩) নির্জ্জনবাস ও নিদ্রাত্যাগ রূপ ভল্ল। এই তিন অস্ত্র উদ্যত (মরত্তব্) না রাখিলে কোন প্রকার বাসনাকে নষ্ট করা যায় না।

ইহাতে প্রতীতি হইবে যে, যুদ্ধ-তৎপর মুসলমানেরা এক্ষণে 'খামুসি' অর্থাৎ মৌনকে খড়্গ রূপে, 'জো' অর্থাৎ ক্ষুধা দমনকে তরবারিরূপে এবং 'তন্‌হাই' ও 'তর্‌কে হেজো' অর্থাৎ নিদ্রা ত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করাকে ভল্লরূপে গ্রহণ করিয়া বাসনা-নাশ দ্বারা পরমার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতি কথায় তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পরিপূর্ণ। তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য এই হয় যে, এমন শাস্ত্রাবলম্বী লোকেরা কিরূপে অতি নিষ্ঠুর কর্ম্ম সকল করিতে পারিত। বোধ হয়, এক্ষণে কোরাণ ও গীতা, উভয় শাস্ত্র হইতে এই এক অর্থে উপদেশ পাইব,—"শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাংসমে যুক্ততমো মতঃ।"

৩। ইংরাজী ও সংস্কৃতে বিবাদ। ইংরাজ রাজত্বের নিতান্ত প্রারম্ভে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় এ দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের শিক্ষা দানের বিধান হইয়াছিল। ১৭৮১ অব্দে স্থাপিত কলিকাতার মাদ্রাসা, ১৭৯১ অব্দে স্থাপিত বারাণসীর কলেজ, ১৮২৩-২৫ অব্দে স্থাপিত আগরা ও দিল্লীর কলেজ, এবং ১৮২৪ অব্দে স্থাপিত কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ এই বিধানের ফল। ইহার পরে ইংরাজীর প্রচলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার কন্যা-রূপিণী দেশ-প্রচলিত ভাষাও বলবতী হইয়া উঠিল। এই গোলযোগে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষগণের বিবাদে অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইলে পর ১৮৩৯ অব্দে স্থিরীকৃত হইল যে, ইংরাজী, সংস্কৃত ও দেশ প্রচলিত, এই তিন ভাষাতেই শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। তদবধি শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা, তত্ত্বাবধায়ক, পরীক্ষক, অধ্যাপক ও স্কুল-সম্পাদকগণ অবিক্ষিপ্ত চিত্তে একপথে চলিয়া আসিতেছেন এবং একমনে শিক্ষাদানের সুপদ্ধতি নিরূপণের চেষ্টা করিতেছেন। এই সুলক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, নীতি শিক্ষারও সুপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে।

৪। হিন্দু ও খ্রীষ্টান মিশনারির বিবাদ। এই বিবাদ এখনো মিটে নাই; কিন্তু মিটিবার পন্থায় আসিয়াছে। প্রথমতঃ খ্রীষ্টান মিশনরিরা এ দেশে স্কুল প্রকরণে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। মাদ্রাজ, মুম্বই, (বোম্বাই) বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম, সর্ব্ব দেশেই মিশনরিরা এ বিষয়ে অগ্রণী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকেরাও স্কুল কলেজাদি স্থাপন করিয়া মিশনরিদিগের একাধিপত্যের খণ্ডন করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা সাক্ষাৎ অর্থকরী, এ জন্য সকলে আগ্রহ পূর্ব্বক মিশনরিদিগের বিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়া থাকে। কিন্তু ছাত্রদিগকে খ্রীষ্টান করা মিশনরিদিগের মুখ্য অভিসন্ধি। এ জন্য তাঁহারা যে সকল চেষ্টা করেন, তাহা হিন্দুদিগের দৃষ্টিতে বিদ্রোহজনক প্রতীতি হয়। এই বিষয়ে

বহু বিবাদ চলিয়াছিল। মিশনরিরা অনেক আইনের সাহায্য পাইলেন। হিন্দুগণ নিরুপায় হইয়া ক্ষণিককাল ভাবিয়া ক্ষান্ত রহিলেন। পরন্তু স্বভাবক্রমে এই বিবাদ খর্ব্ব হইয়া আসিতে লাগিল। কারণ, হিন্দু সন্তানেরা আর সহজে খ্রীষ্টান হয় না। সম্প্রতি মিশনরিরা বালকদিগের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া বালিকাদিগকে খ্রীষ্টান করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই দুরাশাটুকু কাটিয়া গেলেই তাঁহাদের হস্ত হইতে হিন্দুদিগের নিস্তার হয়। মুসলমানদিগের সহিত খ্রীষ্টান মিশনরিদিগের ধর্ম্মান্তর-ঘটিত যদি বিবাদ থাকে, তাহা মৌখিক বা কেবল পুস্তকগত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় কেহ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে না; অতএব মিশনরিদিগের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য নাই বলিলেই চলে। মিশনরিদিগের খ্রীষ্টান করিবার অভিসন্ধি না দেখিলে, তাঁহাদের নিকট নিষ্কামভাবে নীতি শিক্ষা গ্রহণ করিতে সহজে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে।

৫। "দেশী" ও "বিলাতী" নামধেয় বিবাদ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় বড় জাহাজ এবং সেই জাহাজ হইতে টাকার বৃষ্টি, এদেশীয়দিগের চিত্তকে প্রথমে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। কিছুকাল পরে ইংরাজ বাহাদুর রেলওয়ে প্রভৃতি অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক বস্তুবৎ সৃষ্টি প্রকাশ করিলে এ দেশীয় লোকেরা তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও কর্ম্মপটুতা দেখিয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করে। ইহার পূর্ব্বাবধি উক্ত বাহাদুরগণ মুখে যাহা বলুন, মনে মনে এ দেশীয়দিগের সকল বিষয়েই ন্যক্কার বোধ করিতেন। ক্রমে এই ভাব আইন আদালতে ফুটিয়া পড়ে এবং "নেটিব" বলিয়া ইহাদিগের নামকরণ হয়। "নাই বলিলে সাপের বিষও থাকে না"—এই একটী কথা এ দেশে প্রচলিত আছে। সত্য সত্যই এই প্রতাপশালী জাতির অবজ্ঞায় এবং "নাই" "নাই" শব্দে এ দেশীয়দিগের শক্তি সামর্থ্য সকলই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাহারা হীন হইতে হীনতর অবস্থায় অবতারিত হইল। * এইরূপে এ দেশীয়েরা আপনাদের হীনতা হেতু স্বকীয় বা স্বজাতীয় সমস্ত বিষয়কে হেয় জ্ঞান করিয়া বিলাতী বস্তু মাত্রেরই পক্ষপাতী হয়। কিন্তু হিন্দুদিগের বহুকালের রীতি নীতি আচার ব্যবহার একবারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। তাহাতে "দেশী" ও "বিলাতী" নামে বহু বিষয়ের দ্বন্দ্ব হইতে থাকে। এই দ্বন্দ্ববাতাহত হইয়া হিন্দুসমাজ বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইবে, ইহা কাহারও বা আকাঙ্ক্ষিত, কাহারও বা আশঙ্কিত ছিল। পরন্তু সে বাত্যারও প্রশান্তি লক্ষণ দেখা যায়। "যাহা ভাল,—যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।" এই নীতি এবং তদনুগত রুচি বজায় রাখিয়া এ দেশীয়েরা বিচার করিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে স্বদেশীয় বা স্বজাতীয় কোন্ বিষয়টী ভাল, কোন্ বিষয়টী মন্দ। যাহা প্রকৃতার্থে উৎকৃষ্ট, তাহা রক্ষা বা গ্রহণ করিতে হিন্দুদিগের আপত্তি হইতে পারে না। এই ব্যবস্থায় "দেশী-বিলতী" বা স্বজাতীয়-বিজাতীয় বিবাদের

* রাজা রামমোহন রায় ১৮৩১ অব্দে ইংলণ্ডে গিয়া পার্লেমেণ্টের সভ্যদিগের নিকট এই দরবার করিয়াছিলেন যে, আপনারা ভারতবাসীদিগের উপযুক্ত মর্য্যাদা বিধান করুন, তাহাদের সদ্গুণাবলী উজ্জীবিত হইবে। The English works of Raja Ram Mohun Roy Vol. II. Pages 593, 594.

মীমাংসা হইয়া যাইবে, এবং সুশিক্ষা ও সদাচার অবাধে চলিতে থাকিবে,—এমন বিবেচনা হয়।

৬। আপনা আপনি বিবাদ বা ভিক্ষারি বিবাদ। রাজায়-রাজায় যে বিবাদ হইত, সে কথা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। আপনা-আপনি বিবাদও তাহারই প্রতিরূপ;—কেবল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, এই প্রভেদ। ভিক্ষার অরি, এই অর্থে ভিক্ষারি বা ভিখারি শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের এই বিবাদের প্রকৃতি ঐ শব্দে বিলক্ষণ অভিব্যক্ত হয়। বর্ত্তমান কালের নিয়মানুসারে যে ভিক্ষারিরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দলে দলে এক বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়, তাহারা এক এক মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণের উপলক্ষে আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত পরস্পরকে শত্রু মনে করিয়া কি প্রকার কোলাহল ও পরস্পর কটুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাভের জন্য পরস্পরের সেইরূপ হানাহানি বা কাড়াকাড়ি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। জ্ঞানানুশীলন বিষয়েও আমরা ঐরূপ পরপ্রত্যাশী। ইতিহাস, ভূতত্ত্ব ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ে আমরা ইংরাজী ঢোলের কাঁসি বাজাইয়া থাকি। তাহাতেই আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে দম্ভ ও মত্ততার সীমা থাকে না। এই বিষয়েও আমাদের মধ্যে বিবাদের প্রশমন হইতেছে। আমরা বুঝিতেছি যে, পরস্পর বিবাদ ও কোলাহল করিলে মুষ্টিভিক্ষাও মিলিবে না; দ্বারবান হাঁকাইয়া দিবে; আর পরের চক্ষুতে দেখা এবং নিজের চক্ষুতে দেখায় বহু অন্তর।

ভারতে এই সকল বিবাদ থাকিতে থাকিতে যে নীতি শিক্ষার সমুচিত ফল লাভ হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আর এই সকল বিবাদের মীমাংসা হইয়া গেলে এদেশে যে সুমহৎ নীতি তন্ত্রের উদয় হইবে, তাহাতে পৃথিবীর পক্ষে নূতন শ্রী আবির্ভূত হইবে, এমনও বলা যায়। "ইংরাজ রাজত্বে বাঘে বলদে একত্র জল খায়" এই বাক্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই বাঘ ও বলদ পরস্পরের দিকে আড়ে আড়ে চাহিয়া থাকে, ইহাও সত্য। আর সুযোগ পাইলে এই শোণিত-পিপাসু বাঘ যে বলদের স্কন্ধে দন্ত পরামর্শ না করে, তাহাই বা কে বলিবে? কিন্তু নীতি-মাহাত্ম্যে এমন শুনা যায় যে, তৎপ্রভাবে বাঘ ও বলদ সদ্ভাবে পরস্পরের গাত্র লেহন করিতে থাকে। ভারতের পক্ষে এই দৃশ্য অসম্ভব নহে। সুনীতি ও সদ্ধর্ম্মের এইরূপ অমৃতময় ফল ভারত-বৃক্ষে পূর্ব্বকালে প্রসূত হইয়াছিল, পরেও জন্মিতে পারিবে। ইংরাজ রাজত্বের গুণে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, পারসি, শিখ এবং আজিকার উন্নত ব্রাহ্ম প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা এক মাতার পুত্রের ন্যায় নির্ব্বিবাদে ভারতের কল্যাণ এবং আত্ম কল্যাণ সাধনে রত হইলে, পূর্ব্বকালীন সেই স্বর্গীয় সদ্ভাবের দৃশ্য কি পুনরাবির্ভূত বোধ হইবে না? আর তদ্দ্বারা পৃথিবীর পক্ষে কি নূতনতর শিক্ষাদান সংরচিত হইবে না? ভারতবর্ষ বহুল নূতন পদার্থের উৎপত্তি স্থান। এস্থানের নীতিতন্ত্রও সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা, মাধুর্য্য ও কল্যাণ বহন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

শ্রীভগবদ্‌গীতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

সন্ন্যাস যোগ।

"নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তি মব্রবীৎ॥" (স্বামী)
অধ্যায়াভ্যাং কৃতো স্বাভ্যাং নির্ণয়ঃ কর্ম্মবোধয়োঃ।
কর্ম্ম তত্ত্যাগয়োর্দ্বাভ্যাং নির্ণয়ঃ ক্রিয়তেঽধুনা।" (মধু)

অর্জ্জুন—

কর্ম্মের সন্ন্যাস কৃষ্ণ, যোগ পুন আর
করিলে প্রশংসা তুমি; এ দুয়ের মাঝে
শ্রেয় যাহা—কহ মোরে নিশ্চয় করিয়া। ১

শ্রীভগবান—

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ—হয় উভয়েই
মুক্তির কারণ; কিন্তু তাহাদের মাঝে
কর্ম্মযোগ শ্রেয়স্তর—কর্ম্মত্যাগ হতে। ২

---

(১) কর্ম্মের সন্ন্যাস—শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিশেষ পরিত্যাগ (শঙ্কর)। সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপার বিরতি রূপ জ্ঞানযোগ (বলদেব)।

যোগ—শাস্ত্রীয় কর্ম্ম বিশেষের অনুষ্ঠান (শঙ্কর)। সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপাররূপ কর্ম্মানুষ্ঠান (বলদেব)।

শ্রেয় যাহা—চতুর্থ অধ্যায়ের ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩ ২৪, ৩৩, ৩৭ ও ৪১ শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অধ্যায় শেষে অর্জ্জুনকে কর্ম্ম-যোগ অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্থিতি ও গতি যেমন পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ যুগপৎ এক সময়ে হয় না, তেমনি কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসন্ন্যাস পরস্পর বিরোধী। ইহাদের মধ্যে এক সময়ে একেরই সাধনা সম্ভব। এই জন্য এ উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেয়, তাহা অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (শঙ্কর)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, প্রথম চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মযোগ কর্ত্তব্য। তাহাদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে জ্ঞানযোগের সহায়ে আত্মদর্শন লাভ হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও কর্ম্মনিষ্ঠা শ্রেয়, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। আর চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হই-য়াছে যে, কর্ম্মযোগের জ্ঞানাংশ কর্ম্মাংশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়, তাহা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্যই অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন হইয়াছে (রামানুজ)

(২) সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ—মুক্তির কারণ—পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, জ্ঞানহীন সন্ন্যাস বা শুধু কর্ম্মত্যাগ অতি নিকৃষ্ট। ইহাতে কোন ফল নাই। এই স্থানে এরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসের কথা উপদিষ্ট হয় নাই। প্রকৃত সন্ন্যাস দুই রূপে হইতে পারে। প্রথমতঃ, সাংখ্য জ্ঞানে আত্মার স্বরূপ—তাহার নিষ্ক্রিয় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া, কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া আত্মাতে অবস্থান হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও জ্ঞান লাভ হেতু সেই কর্ম্মে আত্মার অকর্ত্তৃত্ব অনুভব করিয়া কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত থাকা যাইতে পারে।

এই স্থলে কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস বুঝিতে হইলে দুই একটী দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিতে হয়। মানুষের সাধারণতঃ দুই রূপ শক্তি আছে ধরিয়া লওয়া যায়। এক জ্ঞানশক্তি,আর এক কর্ম্মশক্তি। কেহ কেহ বলেন, জ্ঞানশক্তি আত্মার স্বরূপ, আর কর্ম্মশক্তি আত্মার গুণ বা ধর্ম্ম নহে, ইহা প্রকৃতি হইতে জাত ও প্রকৃতির অধীন। সুতরাং আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে হইলে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ সহজ কথা নহে। কদাচিৎ কখন এমন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহার জ্ঞানশক্তি পূর্ণ বিকাশিত ও কর্ম্ম-সম্পূর্ণ সংযত। এরূপ লোক অনায়াসে কর্ম্মত্যাগ করিয়া "নিত্যবোধ স্বরূপ" আত্মাতে বা জ্ঞানে অবস্থান করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষমাত্রে কত-

কটা প্রবৃত্তি লইয়া ও প্রবৃত্তির অধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই প্রবৃত্তি পূর্ব্ব জন্মসংস্কারজও বোধ হয় কতকটা পিতৃমাতৃজ। এ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, ইহার মূল বাসনা, ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বা বিতৃষ্ণা উৎপাদন করে। আমাদিগকে নিজ সুখলাভ করিতে ও দুঃখ দূর করিতে প্রবৃত্ত করায়। এই প্রবৃত্তিই আমাদিগের কর্ম্মশক্তি উৎপাদন করে। ইহাই আমাদের জ্ঞানশক্তিকে মলিন বা অভিভূত করিয়া রাখে। যাহাদের স্বভাব জড় তামস ভাবাপন্ন, তাহাদের জ্ঞানশক্তি সম্পূর্ণ অভিভূত। যাহাদের প্রকৃতি তত জড় ভাবাপন্ন নহে, যাহারা রজঃ শক্তি বলে নহে, যাহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ কর্ম্মমুখী, তাহারাও শুদ্ধজ্ঞানে অবস্থান করিতে পারে না। তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক কর্ম্মবৃত্তি সংযত করিয়া কর্ম্মহীন হইয়া থাকিতে পারে না।

প্রায় সকল লোকেই এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের কর্ম্মযোগ অবলম্বনীয়। এই কর্ম্মযোগ সাধনার মূলমন্ত্র আত্মজয়। ইহার জন্য স্বার্থ একেবারে বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা করিতে হয় 'সর্ব্বভূত হিতে রত' হইয়া লোক সংগ্রহার্থ কার্য্য করিতে হয়, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিয়া 'সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা' হইতে শিক্ষা করিতে হয়, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করিয়া—কাম ক্রোধ বেগ সম্বরণ করিয়া—রাগ দ্বেষ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া 'সাম্যে' অবস্থান করিতে হয়। এই স্বার্থত্যাগ ও আত্মজয় হইতে ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হয়। সে অবস্থায় কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী থাকেন।

প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য চিত্তের নির্ম্মলতা নিতান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বে আমাদের জ্ঞান শক্তি ও প্রবৃত্তিজ কর্ম্ম শক্তির কথা যে বলা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ এই কর্ম্ম শক্তির অধিক স্ফূর্ত্তিতে জ্ঞান শক্তি মলিন হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রবৃত্তি দমন করিয়া এই কর্ম্মশক্তির সংযম শিক্ষা করিতে হয়। তাহা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণে তাহাতে অধ্যাত্ম জ্ঞান স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হয়।

এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, জ্ঞান উৎপত্তি সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেন যে, প্রমাণ ও পরীক্ষার দ্বারা আমাদের জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধি হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ সকল জ্ঞানের মূল। এই মতানুসারে প্রকৃত আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কেন না, শুধু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ তর্ক, বা যুক্তির দ্বারা এই জ্ঞান লাভ হয় না। প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্ম বা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা জর্ম্মান পণ্ডিত-প্রধান কাণ্ট নিসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেন।

আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত দার্শনিক মত এই যে, এই জ্ঞান অনাদি অনন্ত। ব্রহ্মই এই জ্ঞানময় বা চিন্ময়। জীব চিত্তে এই জ্ঞান প্রতিফলিত হয়। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, ততই এই জ্ঞান পরিষ্কাররূপে স্ফূর্ত্ত হইতে থাকে। নির্ম্মল দর্পণে সূর্য্য প্রতিবিম্ব যেমন পূর্ণ প্রকাশিত হয়—নির্ম্মল চিত্তে সেইরূপ আত্মজ্ঞানও পূর্ণ বিকশিত হয়। কোন কোন বিলাতী পণ্ডিতও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। স্পাইনোজা, কুঁজে, হেগেল প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত এই মতের পক্ষপাতী। তাহার পর চিত্ত নির্ম্মল হইলে আর নিত্য নৈমিত্তিক শাস্ত্রীয় কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু তখন জ্ঞান পরিপাক জন্য ধ্যানযোগ আবশ্যক হয়। ধ্যান পরিপাকে প্রকৃত বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, আত্মদর্শন হয়।

গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, আমাদের বুদ্ধি প্রথমতঃ বিক্ষিপ্ত বা অব্যবসায়াত্মিকা থাকে। পরে সাধনা দ্বারা আমাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে। এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি দুইরূপ; সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি। সাংখ্য বুদ্ধির ফল জ্ঞানযোগ; তাহার পরিণাম সন্ন্যাস; ও তাহা হইতে ধ্যানযোগ বলে "সমাধিতে অচলা বুদ্ধি" হইয়া 'যোগ' বা ব্রহ্ম নির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। সেইরূপ যোগবুদ্ধি হইতে কর্ম্মযোগে রত হওয়া যায়। তাহার পরিপাক জ্ঞান, তাহা হইতে সন্ন্যাস ও শেষে ধ্যানযোগে সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়।

এস্থলে যে কথা বলা হইল, ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, জ্ঞান উৎপত্তির পূর্ব্বে কর্ম্মসন্ন্যাস বৃথা। জ্ঞানের দ্বারা আত্মার অকর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে হয়। এই অকর্ত্তৃত্ব উপলব্ধিই প্রকৃত সন্ন্যাস। সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ের দ্বারাই এই জ্ঞান লাভ হয়। নতুবা কর্ম্ম করা বা কর্ম্মত্যাগ করা উভয় স্থলেই আত্মকর্ত্তৃত্ব বোধ বা অভিমান থাকে। যতদিন

আত্ম কর্তৃত্ব থাকে, ততদিন সাধনার অবস্থা। কেন না কর্তৃত্ববোধ বা অভিমান দূর করিবার জন্যই সাধনা। যখন অভিমান দূর হয়, আত্মকর্তৃত্ব বোধ নষ্ট হয়, তখন কর্ম্ম করা বা কর্ম্ম ত্যাগ করা সমান কথা। তখন কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন হয়। ইহাই প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাস অবস্থা। কর্ম্মযোগে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও এই সন্ন্যাস অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে।

আর একরূপ সন্ন্যাসের কথা শঙ্করাচার্য্য উল্লেখ করিযাছেন। বেদান্ত বাক্যার্থ উপলব্ধি হইলে ক্রমশ নিদিধ্যাসন পরিপাকে যে অদ্বৈত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাহাতে জীব ও ব্রহ্মে ঐক্য জ্ঞান জন্মে, যাহাতে জগৎ মিথ্যা ধারণা হইয়া কেবল একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান মাত্র অবশেষ থাকে,যাহাতে এ জগৎ জ্ঞান বা দ্বৈত জ্ঞান একেবারে লোপ হইয়া যায়—সেই জীবন্মুক্ত নিস্পন্দ অবস্থায় কোনরূপ কর্ম্ম সম্ভব হয় না। কিন্তু এইরূপ কর্ম্ম সন্ন্যাস অবস্থা বা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান গীতায় কোথাও স্পষ্ট করিয়া উপদিষ্ট হয় নাই। গীতার পূর্ণ মুক্ত পুরুষের আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ভগবান, তিনি কেবল চিন্ময় বা চিদানন্দময় নহেন, তিনি পূর্ণ সচ্চিদানন্দময়। তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়া কেবল জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করেন না বা কেবল পূর্ণ আনন্দে নিমগ্ন থাকেন না। তিনি কর্ম্মে রত।

তিনি নিজে কর্ম্মহীন হইয়াও—লোক হিতার্থ—জগৎ রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন। সুতরাং তাঁহার দিব্য জন্ম কর্ম্ম বুঝিলে—কর্ম্ম তত্ত্বের আমরা গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারি। অর্থাৎ আমরা যদি সাধনা সিদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারি—তথাপি সে অবস্থায়ও আমরা লোক সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিব। তখন মুক্ত হইয়াছি বলিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিব না। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিলে বা ব্রহ্মে অবস্থান করিলেও এই জন্য কর্ম্ম পথে বাধা হয় না।

অতএব গীতা হইতে আমরা এই মহতীতত্ত্ব জানিতে পারি যে, সাধনার প্রথম অবস্থা হইতে জ্ঞান লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের কর্ম্মযোগ কর্ত্তব্য। তাহার পর জ্ঞান লাভ হইলে, নিজে নিষ্ক্রিয় হইয়াও—জগতের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম-শক্তি যদি আমাদের প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়—তবেই তাহা দূষণীয়; কিন্তু যদি ইহা এই নির্ম্মল সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান দ্বারা চালিত হয়—তবে তাহাতে কোন দোষ নাই। কেননা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মের দোষ নষ্ট হইয়া যায়। শাস্ত্রে আছে,জীব মায়া বা প্রকৃতির দ্বারা বশীভূত বা মোহিত, আর ঈশ্বর এই মায়ার বা প্রকৃতির নিয়ন্তা। জীব ও প্রকৃতিজ কর্ম্মশক্তির অধীন না হইয়া—জ্ঞান দ্বারা তাহাকে নিয়মিত করিলে—ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়—বা মুক্ত হয়, এ কথা বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এই শ্লোকে গীতায় যে কর্ম্ম সন্ন্যাস ও যোগের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা সাধনা অবস্থার কথা। অর্জ্জুনের প্রশ্নের মর্ম্ম এই যে, জ্ঞান লাভের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য —না কর্ম্মযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ইহারই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, উভয় মার্গেরই শেষ পরিণাম এক—তবে কর্ম্ম মার্গ শ্রেয়, কেননা জ্ঞান-মার্গে একেবারে—অর্থাৎ কর্ম্মযোগের পূর্ব্বে অবলম্বন করিলে তাহাতে বিশেষ কষ্ট আছে।

স্বামী এই শ্লোক এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"আমি বেদান্তবিদ্ আত্মতত্ত্বজ্ঞের জন্য কর্ম্মযোগের কথা বলি নাই। ইহাদের কর্ম্ম সন্ন্যাস প্রয়োজন, কেবল অবিবেকী দেহাত্মবিদ্‌দিগের সংশয় ছেদ জন্য পরমাত্মজ্ঞানের উপায়ভূত কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিযাছি। এবং কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে যাহার আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহার কর্ম্ম সন্ন্যাস-বিহিত—ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়েই ভূমিকা বা অধিকারীভেদে তুল্যরূপে উপকারী।"

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "অনাত্মবিদ্‌দিগের পক্ষে কর্ম্ম সন্ন্যাস হইতে পারে না—তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এজন্য যাহারা আত্মবিদ্, তাহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগ কোনটী শ্রেয়—অর্জ্জুনের ইহাই জিজ্ঞাস্য—অনেকে এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে। কেননা প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইলে কর্ত্তৃত্বজ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান থাকে না—সুতরাং তখন কর্ম্মযোগ সম্ভব হয় না। এইজন্য অর্জ্জুনের প্রশ্নের অর্থ এই যে, কর্তৃত্বজ্ঞান থাকা কালে—অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ ও কর্ম্ম ত্যাগ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়; এবং দ্বিতীয় শ্লোকে তদণুসারেই ভগবান উত্তর দিয়াছেন।"

রামানুজ বলেন, "যে জ্ঞানযোগশক্ত, তাহার

জে'ন সে নিত্য সন্ন্যাসী—দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা
নাহি যায়; হে অর্জ্জুন, দ্বন্দ্বহীন যেই
অনায়াসে হয় মুক্ত বন্ধন হইতে। ৩
"সাংখ্য আর যোগ ভিন্ন"—কহে বালকেরা,
পণ্ডিত না কহে কভু। উভয়েরি ফল
হয় লাভ—ভালরূপে একে আস্থা হলে। ৪
সাংখ্য হতে যেই স্থান হয় লাভ, হয়—
তাই লাভ যোগ হতে; সেই ত দেখেছে
সাংখ্য আর যোগ এক যে ইহা হেরেছে। ৫

পক্ষেও কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয় সাধনই মোক্ষের কারণ।"

বলদেব বলেন, "যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষেও কর্ম্মযোগ দোষাবহ নহে; কেননা কর্ম্মযোগে জ্ঞান উৎপন্ন করে, ও জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহাকে দৃঢ় করে, এবং তাহা সুকর ও প্রমাদ শূন্য।"

(৩) নিত্যসন্ন্যাসী—সেই কর্ম্মযোগীই নিত্য সন্ন্যাসী (শঙ্কর রামানুজ) সেই বিশুদ্ধ চিত্ত কর্ম্মযোগী জ্ঞানযোগনিষ্ঠ অর্থাৎ কর্ম্মান্তর্গত আত্মানুভবজাত আনন্দ পরিতৃপ্ত (বলদেব, রামানুজ)। পরমেশ্বরার্থ অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান কালেও যে রাগদ্বেষ শূন্য থাকে, সেই নিত্যসন্ন্যাসী (স্বামী)। সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও নিত্যসন্ন্যাসী থাকে (মধু)।

বন্ধন—সংসার (স্বামী),জ্ঞানের বন্ধন (মধু)।

(৪) সাংখ্য—অর্থাৎ কর্ম্মসন্ন্যাস; পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত কর্ম্মসন্ন্যাসের প্রতিশব্দ স্বরূপ 'সাংখ্য' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (শঙ্কর)। সাংখ্য—জ্ঞাননিষ্ঠা ও তদঙ্গ সন্ন্যাস (স্বামী)।

উভয়েরই ফল—নিঃশ্রেয়স ফল (শঙ্কর)। আত্মাবলোকন রূপ ফল লাভ পক্ষে কর্ম্মযোগ সাংখ্যযোগের অপেক্ষা করে না (রামানুজ)। সাংখ্যযোগে যেরূপ মোক্ষ লাভ হয়, কর্ম্মযোগেও জ্ঞান দ্বারে সেইরূপ মোক্ষলাভ হইতে পারে (স্বামী)।

ভালরূপে আস্থা হলে—সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে (শঙ্কর)। নিজ অধিকার অনুসারে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে (মধু)।

(৫) সাংখ্য হতে যেই স্থান—সাংখ্য প্রব-

কিন্তু হে অর্জ্জুন, যোগ বিনা এ সন্ন্যাস
হয় বড় দুঃখে লাভ; যোগযুক্ত মুনি
অচিরেতে ব্রহ্মেতেই করেন প্রয়াণ। ৬

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

চনে আছে, "জ্ঞানান্ মুক্তিঃ (২।২৩), এবং "বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ" (২।২৪) আর "সমাধি সুষুপ্তি মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা"। (৫।১১৬)। অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, মিথ্যা-জ্ঞান বন্ধনের কারণ, আর সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষে, ব্রহ্মরূপ লাভ হয়।

তাই লাভ যোগ হতে—সাংখ্য ও যোগ, এ উভয়ের একটা নিবৃত্তি রূপ ও অপরটী প্রবৃত্তি রূপ বলিয়া ভিন্ন হইলেও—উভয়ের শেষ পরিণাম একই (বলদেব)। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসে যেমন মোক্ষ হয়, তেমনি জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়ভূত ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, নিজ ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিলে, পরমার্থ জ্ঞান সন্ন্যাস লাভ দ্বারা সেই ফলই লাভ হয় (স্বামী, শঙ্কর)। মধুসূদন বলেন, যদি কাহাকেও একেবারে সন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া মুক্তিপথে যাইতে দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বজন্মে তাহার কর্ম্মযোগ হেতু চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল। কেননা শাস্ত্রে আছে,

যান্যতেঽন্যানি জন্মানি তেষু নূনং কৃতং ভবেৎ।
সৎকৃত্য পুরুষেণেহ নান্যথা ব্রহ্মণি স্থিতিঃ।"

সেইরূপ যাহারা এখন কর্ম্মনিষ্ঠারত ভবিষ্যতে বা অন্য জন্মে তাহাদের জ্ঞান নিষ্ঠা হইবে, ইহা বলা যায়। (এই অর্থ সংকীর্ণ বোধ হয়)।

সেই ত দেখেছে—সেই সম্যক্ দর্শী পণ্ডিত। (মধু)।

(৬) অর্জ্জুন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ ইহার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়ঃ? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছিল, কর্ম্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞান লাভের পূর্ব্বেই কর্ম্মযোগ, কর্ম্ম সন্ন্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ—কিন্তু জ্ঞান লাভের পরে পারমার্থিক সন্ন্যাস বা সাংখ্যযোগই শ্রেয় (শঙ্কর)। চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ কর্ম্ম সন্ন্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ (স্বামী, এইরূপ বলিবার কারণ কি, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

পবিত্র কোরাণের সত্যতা। (১)

এসলাম-ধর্ম্মের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকট অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই দাবি করিয়া আসিতেছেন যে, কোরাণ ঈশ্বর-প্রেরিত ও কোরাণের প্রত্যেক শব্দ ঈশ্বর-বাণী। এসলাম-ধর্ম্মাবলম্বিগণ এই দাবি যে বর্ত্তমান সময়ের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগেরই নিকট করিয়া আসিতেছেন, তাহা নহে; তাঁহারা ১৩০০ বৎসর হইতে এই দাবি পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিকট, তাঁহাদের শত সহস্র গুরুতর বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও, আজ পর্য্যন্ত জাজ্জ্বল্যমান রাখিয়াছেন। পবিত্র কোরাণের এই দাবি সাব্যস্থ করাইবার জন্য এসলাম যে সকল প্রমাণ দর্শাইয়া আসিতেছেন, উক্ত প্রমাণগুলি এরূপ নহে যে, তাহা কেবলমাত্র প্রকারান্তরে বিশ্বাস করিয়া লইবার জন্য অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে; বরঞ্চ তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের এসলাম-ইতিহাস বা এই পবিত্র কোরাণ সম্বন্ধে কিঞ্চিতমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, ঐ সকল প্রমাণের দ্বারায় কোরাণের ঐ দাবি সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করা গিয়াছে। পবিত্র কোরাণের ঐ দাবি অন্যান্য উদাহরণের দ্বারায় প্রমাণ করাইবার পূর্ব্বে, ব্যক্ত করা আবশ্যক যে, কোরাণে এই দাবির পরিপোষক কোনরূপ প্রমাণ বা উক্তি আছে কি না?

এই দাবির পোষকতায় কোরাণ হইতে যে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহার সার মর্ম্ম এই, অর্থাৎ কোরাণ এই কথা বলিতেছেন, "আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি ও আমি স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। যদ্যপি ইহাতে কেহ কোন প্রকার সন্দেহ করেন, তবে তিনি নিজে কিম্বা তিনি যাঁহাকে এই কার্য্যের নিমিত্ত অত্যন্ত উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিবেন, তাঁহার দ্বারায় এই কোরাণের কোন এক পংক্তির সদৃশ রচনা করিয়া আনয়ন করুন। তাহা কদাচ পারিবেন না।" কোরাণের এই উক্তির দ্বারা এসলাম স্পষ্টই প্রমাণ করাইয়া দিতেছে যে, এই পবিত্র কোরাণ ঈশ্বর-প্রেরিত, ঈশ্বর বাণী ও অলৌকিক গ্রন্থ। এই প্রকার গ্রন্থ রচনা করা মনুষ্যের অসাধ্য।

কোরাণের এই উক্তিটীকে যদি ন্যায়শাস্ত্র (Logic) মতে বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার এইরূপ বর্ণনা হইবে; অর্থাৎ "এই-প্রকার বাক্য কোন মনুষ্য রচনা করিতে পারে না" "যে প্রকার বাক্য মনুষ্য রচনা করিতে পারে না, তাহা ঈশ্বর-বাক্য।" "এইজন্য এই প্রকারের বাক্য (অর্থাৎ কোরাণ) ঈশ্বর-বাক্য"। প্রথম দুইটী বর্ণনা যদ্যপি সত্য প্রমাণ হইয়া যায়, তাহা হইলে শেষ বর্ণনাটী আপনা আপনি সহজেই বিনা প্রমাণে প্রমাণিত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রথম দুইটী বর্ণনা এরূপ সহজ নহে যে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি শুনিবামাত্রই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এই জন্য ঐ দুইটী বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করা আবশ্যক। প্রথম পদ অর্থাৎ "এই প্রকার বাক্য মনুষ্য রচনা করিতে পারে না;" ইহার প্রমাণ দ্বিবিধ। প্রথম ঐতিহাসিক, দ্বিতীয় জ্ঞান-

সঙ্গত। কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করাকে আমি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলি না। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ এসলাম ধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্ব লইয়া তাহার যে ইতিবৃত্ত যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যে সকল ইতিহাস জ্ঞানবান পাঠকগণের নিকট বিশ্বাসের যোগ্য, আমি তাহাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্বন্ধের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, প্রথমতঃ ইহাই প্রমাণ করা আবশ্যক হইতেছে যে, যে কোরাণ বর্ত্তমান সময়ে এসলাম সমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা বাস্তবিক সেই প্রাচীন কোরাণ কিনা, যাহা আরবি পায়গাম্বরের সময়ে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারই জীবিতকালে সম্পূর্ণ হইয়াছিল ?

এই প্রমাণটী অতি সহজেই হইয়া যাইতে পারে। কারণ পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত ও বিদ্বান, খ্রীষ্টান, ইহুদি, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভৃতি যাবতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি-গণ, যাঁহারা এসলাম ধর্ম্মের বিষয় কিঞ্চিৎ মাত্রও অবগত আছেন, তাঁহারা কোনমতেই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, এসলাম-ধর্ম্ম আবিষ্কারক আরব্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাষাও আরবি ছিল এবং এই পবিত্র কোরাণও আরবি ভাষায় আরব্যদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ১৩০০ বৎসর হইল এই কোরাণ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহার বিশ্বাসীগণের সংখ্যাও কুড়ি কোটীর অধিক। দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান সম্প্রদায় সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ প্রভৃতিতে বিস্তৃত রহিয়াছেন। এ কথা স্বীকার্য্য যে, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে যেরূপ অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে নানা শাখা হইয়াছে, তদ্রূপ এসলাম ধর্ম্মেও নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়া পরস্পরে বিভিন্ন হইয়া আছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত এস-লাম-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নিকট কোন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন কোরাণ দৃষ্টিগোচর হয় না, কোরাণ সর্ব্বত্রই একই প্রকারের রহিয়াছে। কোন স্থানের কোন সম্প্রদায়ের কোরাণ যে কোন দেশ বা যে কোন সম্প্রদায়ের দ্বারায় লিখিত হউক না কেন, তাহাতে এক শব্দেরও প্রভেদ বা পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় নাই। যদি এই প্রকার পরিবর্ত্তন বা প্রভেদ হইত, তাহা হইলে সেই প্রভেদ ও পরিবর্ত্তন সেই দেশের সেই সম্প্রদায়ের সেই সময়ের কোরাণে থাকিত ; পূর্ব্ব সময়ের কিম্বা অন্য দেশবাসী-দিগের কোরাণের সহিত কদাচ ঐক্য হইত না। এইরূপ পরিবর্ত্তিত কোরাণ আজ পর্য্যন্ত কোনও স্থানে পাওয়া যায় নাই! অতএব এই প্রমাণের দ্বারায় এসলাম প্রমাণিত করিয়া দিতেছে যে, যে কোরাণ এই সময়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা বাস্তবিকই সেই কোরাণ, যাহা আরবি পায়গাম্বরের জীবিতকালে অব-তীর্ণ ও সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তাহাই বিনা পরি-বর্ত্তনে আজ পর্য্যন্ত এসলাম-সমাজে-জাজ্বল্য-মান রহিয়াছে।

এস্থলে এসলাম ধর্ম্মের কোন শত্রু, এস-লাম ধর্ম্মের ইতিহাসে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত, এরূপ সন্দেহ বা দোষারোপ করিতে পারেন যে, হাজরাত ওস্‌মান, যিনি কোরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রণম্য, তিনিই কোরাণ সংগ্রহ কালীন তাহাতে কোন প্রকার যোগ বা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন, এবং সেই সময়ে সমস্ত মুসলমানগণ তাঁহারই অধীনস্থ থাকায়, তাঁহার কৃত কার্য্যের উপর কেহ কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই,

বা করিতে পারেন নাই। এসলাম ধর্ম্মের ইতিহাস বা ক্রিয়াকলাপের প্রতি সম্যক্‌রূপে দৃষ্টি করিলেই এ অমূলক সন্দেহ তিরোহিত হইয়া যায়। এস্থলে পাঠকগণের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, হাজ্‌রাত মহম্মদের (দারূদ্‌) জীবিত সময় হইতে এসলাম সমাজে কি প্রকার কোরাণের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে? মহম্মদ প্রতিদিন ৫ বার উপাসনার (নামাজের) সহিত কোরাণ পাঠ করা সমস্ত মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্বরূপ পরিগণিত করিয়া গিয়াছেন;—কোরাণের শিক্ষা মুসলমানগণের সত্যপথ-প্রদর্শক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, ইহা ভিন্ন কেবল মাত্র কোরাণ পাঠ করাকে একটী মহাপুণ্যের কার্য্য বলিয়া নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া আরব্য উপদ্বীপের সমস্ত স্ত্রী ও পুরুষগণ, যাঁহারা আরবি পায়গাম্বরের জীবিত সময়ে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলেই সাধ্যমত কোরাণ মুখস্থ রাখিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন কোরাণ বেদ কি বাইবেলের ন্যায় অত্যন্ত বৃহৎ পুস্তক নয় বলিয়া এবং আরবি ভাষাতেই কোরাণ অবতীর্ণ হওয়ায়, সকল মুসলমানের পক্ষে কোরাণ মুখস্থ রাখা অত্যন্ত সহজ ছিল। কোরাণ অবতীর্ণকালে আরবদেশে কোন প্রকার লেখা পড়ার সরঞ্জাম ছিল না; এদিকে কোরাণ মুখস্থ ও স্মরণ রাখিবার জন্য আরবি পায়গাম্বরের বিশেষরূপ তাড়না ছিল। সুতরাং তৎকালের মুসলমানগণ, যতদূর সম্ভব, সকলেই কোরাণ মুখস্থ রাখিতেন। এসলাম ইতিহাস্‌ ও হাদিশ্‌ সকলের দ্বারা বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, আরবি পায়গাম্বরের জীবিতকালে সাহাবাদের মধ্যে শত শত লোক এরূপ বর্ত্তমান ছিলেন, অতি বিশুদ্ধরূপে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের কোরাণ মুখস্থ ছিল। স্বীকার্য্য, বর্ত্তমান সময়ের কোরাণের ন্যায় তাৎকালিক কোরাণে কোন প্রকার খণ্ড, কি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় আদির কোন নির্দ্দেশ ছিল না; কিম্বা সমস্ত কোরাণ এক পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, আরবি পায়গাম্বরের সময় সমস্ত কোরাণ একেবারেই অবতীর্ণ হয় নাই। তাহা আবশ্যক মত, কতক কতক করিয়া, অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যখন যে পরিমাণে অবতীর্ণ হইত, তাহা কোন অস্থি বা চর্ম্মাদিতে লিখিয়া রাখা হইত। সাহারাগণ তাহা মুখস্থ করিয়া লইতেন এবং পায়গাম্বর সাহেবও নিজে স্মরণ রাখিতেন। উক্ত সময়ে কোরাণ মুখস্থ রাখিবার প্রথা এরূপ দৃঢ়তর ছিল যে, আরব দেশের বনবাসী জাঙ্গলি বদ্দু জাতিরাও উপাসনা ও পাঠের জন্য কোরাণ সাধ্যমত স্মরণ রাখিয়াছিল। কিন্তু ঐ বদ্দু জাতি বা হেজাজ হইতে দূরদেশবাসী মুসলমানগণের উচ্চারণ, মক্কা, মদিনাবাসীদিগের উচ্চারণ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ছিল। ইহার কারণ এই যে, হয়ত তাঁহারা পবিত্র কোরাণের শুদ্ধ উচ্চারণ জানিতে পারিয়াছিলেন না, কিম্বা জঙ্গলি, বদ্দু, কি স্মরণ-শক্তি-বিহীন লোকেরা তাহাদের স্বীয় দেশে কোন প্রকার ভ্রম বশতঃ কোরাণকে অশুদ্ধরূপে পড়িয়া থাকিবেন। যখন শত শত আন্‌সার ও মহাজেরিনগণ * এবং অন্যান্য আরব দেশের

* টীকা। আন্‌সার ও মহাজেরিন তাঁহাদিগকে বলে, যাহারা হাজ্‌রাত মহম্মদের (দারূদ) মক্কা হইতে মদিনা যাইবার কালে সঙ্গে গিয়াছিলেন ও মদিনায় যাঁহারা হাজ্‌রাতকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

নিকটস্থ সহবাসীগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া এই ধর্ম্ম-পুস্তককে আপনাদের পবিত্রাণের একমাত্র সম্বল জানিয়া সাধ্যমত অন্যান্য লোকদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন, প্রেরিত পুরুষের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত, কোরাণের বহু সংখ্যক হাফেজ বর্ত্তমান ছিল। অনন্তর হাজ্‌রতের পরকাল গমনের পর হাজ্‌রাত আবুবাকার খালিফার পদে অধিষ্ঠিত হইবার কালে মোশা এনামা ফির্জ্জাবের* যুদ্ধে অনেকগুলি কোরাণের হাফিজ নিহত হইয়া যাওয়ায়,হাজ্‌রাত উমারের পরামর্শমতে হাজ্‌রাত আবুবাকার, এই প্রকারের যুদ্ধে সমস্ত হাফিজগণ নিহত হইয়া গেলে ভবিষ্যতে কোরাণের কতকাংশ বা সম্পূর্ণ লোপ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় সশঙ্কিত হইয়া, যে সমস্ত কোরাণ হাজ্‌রাতের জীবিতকালে অস্থি চর্ম্মাদিতে লিখিত হইয়া একটী বাক্সে অতি যত্নে রক্ষিত ছিল, ঐ বাক্সটীকে জনৈক কোরাণের হাফেজ শাবিতের পুত্র জায়দের দ্বারায় আনাইয়া ও অন্যান্য উপযুক্ত কোরাণের হাফিজের দ্বারায় ঐ সমস্ত রক্ষিত কোরাণকে ঐক্য করাইয়া ও মিলাইয়া অতি বিশুদ্ধরূপে একত্রিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি কোরাণের ভাবী বিনাশ-আশঙ্কা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় খালিফা হাজ্‌রাত ওস্‌মানের সময়ে (যাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে অর্থাৎ যিনি কোরাণ সংগ্রহকারী পদবিতে বরিত আছেন) ইহা জানিতে পারা গেল যে, যে "এরাক" ও "শ্বাম" প্রভৃতি দেশবাসিগণের কোরাণ পাঠে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা হইয়াছে। "শ্বাম" অধিবাসীগণ বলিতেছিলেন যে, আমরা যে কোরাণ আসাওয়াদের পুত্র মেকদাদের নিকট পাঠ করিয়াছি, তাহাই সটীক এবং "এরাক" বাসীগণ বলিতেছিলেন যে,আমরা যে কোরাণ আবুমুশা আশোয়ারির নিকট পাঠ করিয়াছি, তাহাই বিশুদ্ধ। আরও অন্যান্য দেশবাসিগণও এই প্রকার কোরাণ পাঠে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা করিয়াছিলেন। ইহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, সে সময় তাঁহারা কোরাণের শ্রেণীবদ্ধতায় ভুল এবং কোরাণের শুদ্ধ উচ্চারণে (কেরাতে) কোন প্রকার বিভিন্নতা করিয়া থাকিবেন। এই ভুল ও বিভিন্নতা সকল দূরীকরণ মানসে হাজ্‌রাত ওস্‌মান, যে কোরাণ হাজ্‌রাত আবুবাকার হাফিজগণের দ্বারায় প্রেরিত পুরুষের জীবিত সময়ের কোরাণের সহিত ঐক্য করাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। ঐ কোরাণ হাজ্‌রাত পায়গাম্বারের সহধর্ম্মিণী বিবি *হাফ্‌জার নিকট হইতে আনাইয়া, তাহা* হইতে কয়েকখণ্ড অবিকল নকল করাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং যে সকল কোরাণে বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল, ঐ সমস্ত কোরাণকে একত্রিত করিয়া ভবিষ্যতের বিভিন্নতা নিবারণের জন্য আগুনে পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। পাঠকগণের এস্থলে বেশ স্মরণ আছে যে, হাজারত পায়গাম্বরের জীবিত সময়াবধি অনেকগুলি কোরাণের হাফিজ বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই হাজারাত ওসমানের প্রতি এরূপ দোষারোপ করিতে পারিলেন না যে, তিনি কোরাণে কোন প্রকার ভুল বা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কোরাণের শুদ্ধ উচ্চারণে (কেরাতে) যে বিভিন্নতা হাজারাত ওসমান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,তাহাও সটীকরূপে তিনি কোরা-

* মোসাএনামা যে সকল ব্যক্তি নিজকে পায়গাম্বর দাবি করিয়া অতি গুরুতররূপে যুদ্ধ করিয়াছিল।

ণের টীকায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই অবস্থায় পাঠকগণ কি প্রকারে হাজারাত ওসমানের প্রতি এরূপ দোষারোপ করিতে পারেন যে, তিনি কোরাণ সংগ্রহ করিবার সময় কোন প্রকার সংযোগ বা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন? পাঠকগণ ইহাও দেখিবেন যে, পূর্ব্বে যে সকল বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল এবং যে সকলকে হাজারাত ওসমান কোরাণের টীকাতে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, সে বিভিন্নতা সকল এরূপ নহে যে, যাহার দ্বারায় কোরাণের প্রকৃত অর্থের কোন ইতর বিশেষ হইতে পারে। ঐ বিভিন্নতাগুলি প্রত্যেক জ্ঞানবান লোকমাত্রই দেখিয়া মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, এই বিভিন্নতা কোন বিভিন্নতাই নহে। ক্রমশঃ

শ্রীসৈয়দ আবদুল গফার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

ঝালোয়াড়।

১

আর না, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!
"চুপ্ রহো—কহো মৎ—ওির্ নেহি মেহলৎ,"
পোহাও মোহের রাত, ঘুচাও সংসার!
আজো হা হ'ল না হোস্,এ যে কামলার দোষ—
ঝিনুকে দেখিছ, রাণা, চুনী ঝালোয়াড়!
দু'চক্ষে আঙুল দিয়া, ভুল দিছে দেখাইয়া,
হা অন্ধ বান্ধব তব—তারে ভাব আড়?
কর এ গার্হস্থ শেষ, পর বানপ্রস্থ বেশ,
হিন্দু তুমি—ক্ষত্র তুমি—কি খেদ তোমার?
আর না, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!

২

আর না, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!
আর না,আর না,রাণা! দাঁড়াও—দেখনা,কাণা,
দাঁড়াইয়া রাজদূত আঘাতিছে দ্বার!
সোণার সিন্দুক খুলে 'ও কি ও দেখিছ তুলে'—
হোহোহো সে ইন্দ্রপ্রস্থী সনন্দ তোমার?
আজো হো হো কাণ যুড়ি,বাজে সে অভয়-তূরী,
সেই বিশ্বজিতে রাজরাজেশ্বরী মা'র!
চোখে ছাঁদা,কাণে ধাঁধা—এহেন না-ছোড়-বাঁধা
হে দূত, এদেশ ছাড়া দেখেছ কি আর?
বিনে অস্ত্র-চিকিৎসায়, কভু কি ঘুচিবে হায়
হিন্দুস্থানী হা-খাইর আঁখি-অতীসার!
কও না সঙ্গিনে ফুঁড়ি, চক্ষু দুটো নিক্ খুঁড়ি'—
আর দেখিবে না, দূত, সনন্দ তোমার!
আর না, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!

৩

আর না, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!
আর কি ভাবিছ ছাড়, নামাও কিরীট ভার,
এ যে মুক্তি—মহামুক্তি সমুখে তোমার!
হোহোহো! দিওনা চিত, কাঁদে মূর্খ বেদবিৎ—
"দিবে ম্লেচ্ছে, মহারাণা! ব্রহ্মাবর্ত্ত তা'র?"
ভোল সে প্রতাপ, ভীম, রাজসিংহ অপ্রতিম,
ভোল ভূত-কথা, রাণা, রাজপুতানার!
ভোল সে ব্রহ্মণ্য বল, ভাঙ্গিয়াছে দলে দল
অযুত যবন-মুণ্ড পদাঘাতে যার!
স্মৃতি আলেয়ার আলো,কাল রাত্রি করে কালো
মূঢ় তুমি মহারাণা! চাহ মুখ তার?
এইত ডাকিনী স্মৃতি,কু-ডাক ডাকিছে নিতি,
বিদ্রোহী কি, ব্রিটানিয়া, ভারত তোমার?
এ গৌরব-গম্বুজ, কর বজ্রে দুরমুজ,
পাড়াইয়া পিশাচীরে ভাঙ্গ তার হাড়!
উপাড় ও শিরঃশূল অনন্ত অতীত মূল,
চতুর্যুগব্যাপী অই ইতিহাস তার!
দিয়ে যে বিচিত্র চুম, ব্রিটানি, লওয়ালে ঘুম
ম্লেচ্ছ-লেলিহান খড়্গ ক্ষিপ্ত খালসার,
দেও তা ঝালিম-মুখে—ঝিমাক্ নিঝুম্ সুখে,
বাড়ুক্ ভারত-ভূমে বাঙ্গালীর ঝাড়্!
পৃথ্বীরাজ পৃথ্বী রবি, একা তাঁর চাঁদ কবি,
শত শিবা হবে ভাট ভবিষ্যে তোমার!
মা ভৈঃ, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

ফুল-শয্যা।

(কোন আত্মীয়ের ফুল-শয্যা উপলক্ষে)

মধুর ফাল্গুন মাস, প্রকৃতির চারু হাস
উঠেছে ফুটিয়া ওই বসন্ত প্রসূনে।
নাহিক গ্রীষ্মের ক্লেশ, ক্ষীণবল শীতাবেশ,
বহিছে মলয়ানিল মৃদুসঞ্চরণে।

পুষ্পগুচ্ছ স্তরে স্তরে, ধরণীর কলেবরে,
পুষ্পময় প্রকৃতির শোভা অতুলন।
সৌন্দর্য্য-কুহক-জাল, প্রস্ফুট বসন্তকাল,
প্রতিবিম্ব দেখাইছে জল স্থল বন।
ক্ষুদ্র গৃহকোণে আজি, পুষ্প আভরণে সাজি,
স্বরগের প্রীতিময় মোহময় হাস,
স্মিতবিম্বাধরে তার, অতুল সৌন্দর্য্য ভার,
অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের ললিত বিকাশ।
স্বরগের কি বারতা এনেছ, "চম্পকলতা,"
প্রেমের রহস্তকথা কল-কণ্ঠে তব,—
"শরতের" শূন্য মনে মধুহীন এ জীবনে
ঢাল সঞ্জীবনী সুধা নিত্য অভিনব।
প্রাণে প্রাণে মেশামিশি, সুখেতে কাটুক্ নিশি,
নূতন মিলন-তান বাজুক এবার।
যেন নব উষা-সনে প্রণয়-নন্দন-বনে
প্রেম-কল্প-তরুতলে শিখয়ে সংসার।
নীরস কঠিন ধরা, কঠোর কর্ত্তব্য ভরা,
কুসুমিত হোক্ তব প্রেমপরশনে।
হাত-ধরাধরি করি, সাধের সংসারতরী,
বহি যাবে ধীরি ধীরি প্রেম-ঐকতানে!
শ্রীমথুরানাথ সিংহ।

কুমুদ।

সারা রাত হেসে খেলে প্রভাতে অবশ হয়ে,
আমি আঁচল বিছায়ে ভূঁয়ে রহিয়াছি শুয়ে।
হায় চুলগুলি খসে গেছে এলো মেলো হয়ে,
হায় ভ্রমর পলায়ে গেছে গান গেয়ে গেয়ে।
বুঝি আঁখি-জলে ধুয়ে গেছে অলক্তের রাগ,
পরে আছি মরে আছি কাঁদিতেছি কেঁদে বাঁচি,
বলি শ্যামা পাখী ডেকে তোলে এ কোন্ সোহাগ
মারুত চুমিতে আসে, রেণু ঢেলে দেয় বাসে,
ওই দয়েল লুকিয়ে হাসে বেশ আছি শুয়ে,
আহা কে তোরা জাগাস মোরে গান গেয়ে
গেয়ে।

এই বুকে ছিল কত, পদ্মরাগ মরকত,
হায় ঝড়িয়ে পড়িয়ে গেছে আঁচলের বা'র।
পুলিনে পুলিনে ভাসি, ভাসায়ে অমৃতরাশি,
আজ খেলিছে লহরী বুঝি সেই মুকুতার
সেই মণিমরকত, প্রভাতে প্রতিভা হত,
রবি উজ্জল বালুকা খণ্ড প্রশান্ত বেলায়।
আমি নামে শুধু বেঁচে আছি আধ মড়া হয়ে,
এই অনিমিখ্ আঁখি লয়ে পথ পানে চেয়ে।
আজ্ যখন ডুবিবে রবি উদয় অচলে,
হেথা আসিবে গোধূলি বালা এলোমেলো চুলে,
বাল্য সখি সে আমার, মণি-কাননের হার,
আহা আসিবে আমারি তরে ছুটাছুটি করে,
এবে বুঝিবা ঘুমিয়ে আছে স্বরগের দ্বারে,
অথবা আমারি তরে নক্ষত্রের রাশ
সুখে গাঁথিছে, শিখিছে বসি জ্যোছনার হাস।
দিবসের আলো খানি, দুহাতে সরায়ে রাণী,
আহা আমারি আমারি তরে আসিবেক ধেয়ে
হাতে ক'টি ফল ক'টি ফুল জল টুকু নিয়ে।
গোধূলির কোলে বসি, আসিবে শরতশশী,
সবে রাশি রাশি অংশু মালা উপহার দিয়ে,
তাই আছে অনিমিখ আঁখি পথ পানে চেয়ে।
এই বুকে ধ্রুবতারা, ঢালিবে অমৃতধারা,
সুখে আমিও ডাকিব তারে আঁখি চাপা দিয়ে।
কি কথা বলিতে মোরে, জ্যোছনা আসিবে ধীরে,
পথে হাসিবে মলয়ানিলে স্বরগের মেয়ে,
সুখে আমিও হাসিব তার মুখপানে চেয়ে॥
শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

জীবন।

(ক)

দুদিনের তরে কি জীবন
দুই দিনে ফুরাইয়া যায়?
প্রভাতের কুসুম যেমন
রবি করে মধ্যাহ্নে শুকায়?

(১)

কুসুমের মত প্রভাত বেলায়
কত আশা লয়ে ফুঠে উঠে হায়!
না পূরিতে সেই সব আশা
না মিটিতে প্রাণের পিপাসা,
না গাইতে প্রেম, সহিয়ে যাতনা
না জানাতে শত, বিরহ-বেদনা
বুকে রেখে বুকের বাসনা
হৃদে লয়ে অপূর্ণ কামনা
শুষ্ক বৃন্ত হ'তে খসিয়া যায়
মানবের এ জীবন হায়!

(২)

অথবা কালের অনন্ত সাগরে
রহিয়া রহিয়া মুহূর্ত্তের তরে
আবার তাহাতে মিশিয়া যায়
ক্ষণহারী জলবিম্ব প্রায়?

(৩)

অথবা আকাশে আনন্দের দেশে
যথা ক্ষণতরে নক্ষত্র ফুটিয়া
আঁধার সাগরে পুনঃ খসি পড়ে,
মিশে যায় কে জানে কোথায়!
মানব জীবন তাঁহারি প্রায়?

(৪)

এই যদি মানব জীবন,
তবে হায় কেন অকারণ,
দুদিনের তরে, ধূলা ঘর ক'রে
বাসনা-পুতুলে আনন্দে সাজায়
কাল সাগরের মোহন বেলায়,
শত বার ভাঙ্গে গড়ে শতবার
গায় কতবার হৃদয় তাহার
"কিছু না কিছু না সমুদয়
চরাচর মিছা মায়াময়"
তবুও আবার তাহাই চায়
পরাণ তার পাগল প্রায়?
এই ভাবে কত ছুটিয়া ছুটিয়া
নিরাশায় কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া
অবসন্ন মনে আকুল পরাণে
সংসারের স্রোতে ডুবিয়া যায়!
কেবা তার পানে ফিরিয়া চায়?

(৫)

এই যদি মানব জীবন
তবে বল কেন অকারণ
দুদিনের যশ, মান অভিমান
তার তরে এত তৃষিত পরাণ?
তবে কেন মোহের নিদ্রায়
চিরমগ্ন; জাগিতে না চায়?

(খ)

না, না, এই মানব জীবন
নহে মাত্র নিশার স্বপন;
নহে এ সংসার মোহের আগার
নহে জগতের কার্য্য সমুদয়
অর্থ-শূন্য বাল্য-খেলা প্রায়।

(১)

বিধির ইচ্ছায় মানব হেথায়
এই দেশ হ'তে অনন্তের পথে
সবে তারা করিবে প্রয়াণ
এই জীবনের প্রথম সোপান।
নিজ কর্ম্মফল, ভুঞ্জিবে সকল
এই জীবনের পরীক্ষার স্থল;
সুখ দুঃখ তাঁহারি প্রেরণ
পাপ পুণ্য তাঁহারি সৃজন।
প্রেম, ভক্তি, দয়া, স্বার্থ, মোহ, মায়া,
দুই পথ তাঁহারি বিধান
তিনি এই জগতের প্রাণ।

(২)

সাহসে নির্ভর করি
হৃদে তাঁর নাম স্মরি
স্বীয় কার্য্য করিলে সাধন;
সংসারের দুঃখ শেষে
লভে জীব পর-দেশে
চিরশান্তি—অনন্ত-জীবন।

শ্রীবিহারিলাল গুহরায়।

কি তুমি?

কি তুমি, ঊষার আলো, ফুলের সুবাস ধার;
বিহগের সুধাকণ্ঠ, স্নিগ্ধ জ্যোতি জ্যোছনার।
কিগো তুমি, দিবসের আনন্দিত হাসি রাশি,
নিশার সুখের স্বপ্ন নয়নে বেড়াও ভাসি।
শরতের পূর্ণশশী, মৃদু ঊর্ম্মি যমুনার;
বসন্তের হাসি রাশি, অশ্রুধারা বরিষার।
কি তুমি সুদূর বনে মোহিনী বাঁশির সুর,
সাগরের গভীরতা, হিরকের কহিনুর।
প্রভাত-অরুণ-রশ্মি, মলয়ের সমীরণ,
আকাশের ধ্রুবতারা স্থির রাখ প্রাণমন।
কি তুমি যুবার প্রেম, বালকের সরলতা,
অনলের আকর্ষণ, কুসুমের পবিত্রতা।
তুমি সেই পারিজাত, স্বর্গের সুন্দর ফুল,
কেন গো মানব তুমি, বুঝি বিধাতার ভুল।

শ্রীশৈবলিনী দেবী।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। বিবাসিনী—(উপন্যাস) শ্রীরামশঙ্কর রায় প্রণীত। এই পুস্তকখানি উৎকল ভাষায় রচিত। প্রাচীন স্থপতিবিদ্যা, পূর্ত্ত-কার্য্য এবং শিল্পনৈপুণ্যে উৎকলদেশ জগৎ-বিখ্যাত। প্রাচীন সাহিত্যের গৌরবও উৎকলে যথেষ্ট আছে। পরাধীনতায় দেশের সকল গৌরবই দিন দিন ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়; উড়িষ্যার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। কোনার্কের বালুকাময় মরুক্ষেত্রে, একাম্রকাননের মালভূমিতে, পুরীর সমুদ্রতটে, ধউলি, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির নির্জ্জন প্রদেশে, কাটজুড়ীর তটভূমিতে, অথবা নাম করিয়া কত বলিব, সমগ্র উৎকলদেশে যে প্রতিভা আজিও পরিস্ফুট রহিয়াছে, তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইল? অবশ্য শিল্পাদিতে উৎকলের যত গৌরব, সাহিত্যে তত নহে। কিন্তু তবুও উড়িষ্যার প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিলে যে একটা কাব্য-প্রিয়তা এবং সাহিত্য-সেবার তন্ময়ত্ব দেখা যায়, একালে তাহা কই? উৎকলবাসীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে কেবল "তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ" শব্দিত হইতেছে। এ কালের শিক্ষায় যে নূতন রকমের সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, সে সাহিত্য উড়িয়া ভাষায় অতি অল্প। যাহা কিছু আছে, তাহাও খাঁটি উড়িয়ার লেখনী প্রসূত নহে বলিয়া বড়ই দুঃখ হয়। বামড়া এবং ময়ুরভঞ্জের রাজা যে প্রকার সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, তাহাতে আশা হয়, একদিন উৎকলের সাহিত্য সুপুষ্ট হইয়া সম্বলপুর হইতে চাঁদবালী পর্য্যন্ত, ময়ুরভঞ্জ হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত এক জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে।

উপরে বলিয়াছি যে, উৎকলের একালের সাহিত্য খাঁটি উড়িয়ার দ্বারা বড় অধিক পরিচালিত নহে। অথচ সকলেই উৎকলবাসী। কিন্তু মূলতঃ প্রধান প্রধান লেখকেরা (বামড়ার রাজা ব্যতীত) বিদেশীয়। সুকবি রাধানাথ রায় হইতে এই সমালোচ্য গ্রন্থলেখক রামশঙ্কর রায় পর্য্যন্ত সকলেই বিদেশীয়। আমি এ গণনায় অসার "কইলি" লেখক এবং কটক সহরের অদ্ভুত বর্ণনাকারীদিগকে বাদ দিয়াছি। ক্ষুদ্র দেশ বলিয়াই কেহ কেহ তাহাদের নাম জানে, এই মাত্র। বামড়ার রাজা, রাধানাথ রায় এবং মধুসূদন রাও কবিতা লিখিয়া বিখ্যাত। রাধানাথ রায় মহাশয়ের বাঙ্গালা কবিতাবলি বঙ্গদেশে আদৃত এবং মধুসূদন রাও মহাশয়ের নব্যভারতে প্রকাশিত 'ঋষিচিত্র' সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই সুকবি। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, রাধানাথ বাবুর কবিত্ব শক্তি, বাঙ্গালায় বর্ত্তমান সময়ের কোন কবি অপেক্ষা ন্যূন নহে; এবং তাঁহার চন্দ্রভাগা একালের যে কোন কবির উৎকৃষ্ট কবিতার সহিত প্রতিযোগীতা করিতে পারে। কিন্তু একালের বিশেষ সাহিত্য "নবেল", এ পর্য্যন্ত রামশঙ্কর বাবু ভিন্ন অন্য কেহ লেখেন নাই। উপন্যাসের বিষয়ীভূত গল্পটী যে প্রকার মনোরম, বর্ণনাও তেমনি সরস হইয়াছে। উপন্যাস ভাল হইলে সর্ব্বজন-প্রিয় হয়, কাজেই ইহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চা যত বৃদ্ধি পায়, এমন আর কিছুতে নহে। আমরা আশা করি, রামশঙ্কর বাবুর বিবাসিনী উৎকলের সর্ব্বত্র আদৃত হইবে। অবশেষে গোটাকতক ক্ষুদ্র রকমের ত্রুটীর কথা উল্লেখ করিব। ১ম; মুদ্রাঙ্কন দোষ। কটক প্রিন্টিং কোম্পানির মত বিখ্যাত ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াও যে বিবাসিনীতে এত বানান ভুল রহিয়া গিয়াছে, এটা ভাল কথা নয়। ২য়; স্থানে স্থানে ভাষা দোষও দৃষ্ট হইল; সেটা কাহার অনবধানতার ফলে? ৩য়তঃ; গ্রন্থকার অনেক স্থানে বড় অতিদীর্ঘ প্রাকৃতিক বর্ণনা করিয়াছেন। এ প্রকার বর্ণনা সুধু অনুপযোগী, তাহাই নয়; ইহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতিও জন্মিতে পারে।

ভারত, মিসর ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। (২)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভারতের সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে গ্রীশ, মিসর ও আরব, এই তিন দূরদেশ প্রধানতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতে সংসৃষ্ট হইয়াছিল। সেই দেশবাসিগণ তদ্দ্বারা শুদ্ধ যে অতুল ধনের অধিপতি হইয়াছিল, এমত নহে, ভারতের জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া নিজ নিজ দেশ ভারত-সভ্যতায় আলোকিত এবং আর্য্য-ধর্ম্মের দেব-দেবীর অর্চ্চনায় ভূষিত করিয়াছিল। সকলেই জানেন, গ্রীশ এবং মিসরের প্রাচীন ধর্ম্ম প্রণালীর সহিত আর্য্যজাতির পূজা পদ্ধতির কত সৌসাদৃশ্য। আরবেতিহাস পর্য্যালোচনায়ও প্রতীত হয়, মহম্মদ জন্মিবার পূর্ব্বে আরবেরা বহুকাল হইতে দেবদেবীর অর্চ্চনা করিত। মোসেস্ যখন মিসর হইতে স্বদেশে আগমন করেন, তখন তিনি আরব দেশে সেই অর্চ্চনাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আসেন। মহম্মদের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে মক্কানগরে কাবা (Caabah) নামক বিখ্যাত দেবালয়ে কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খ্রীষ্ট জন্মিবার অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ডায়োডোরস সিকিউলস (Diodorus Siculus) এই দেবালয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। এই দেবালয় জেমজেম (Zemzem) নামক প্রসিদ্ধ উৎস পার্শ্বে স্থাপিত ছিল। এব্রাহ্যাম-পত্নী হ্যাগার (Hagar) স্বীয় পুত্র ইসমাইলের সহিত এই উৎস দর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালীন মক্কানগরে তাঁহার দেহ পতন হয়। দশ ঘর পুরোহিত বংশ এই কাবার দেবসেবায় নিয়োজিত ছিল। কোরিশ নামক সেই পুরোহিত বংশ হইতে মহম্মদের জন্ম হয়। আরবদেশময় দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও মক্কার দেবালয়ই প্রধান তীর্থস্থান ছিল। বৎসরে বৎসরে মক্কার মেলা দেখিতে দেশবিদেশ হইতে দলে দলে যাত্রী আসিয়া সেই তীর্থ স্থানকে ধূমধামে পরিপূর্ণ করিত। কার্লাইল (Carlyle) বলেনঃ—

"Mecca became the fair of all Arabia and thereby indeed the chief staple and warehouse of whatever commerce there was between the Indian and the Western countries,—Syria, Egypt, even Italy. It had at one time a population of 100,000 men; buyers, forwarders of those Eastern and Western products, importers for their own behoof of provisions and corn."

"মক্কাই সমুদায় আরবদেশের ব্যবসা-স্থান ছিল। সিরিয়া, মিসর এমত কি, ইটালী পর্য্যন্ত সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের সহিত ভারত বাণিজ্যের এই প্রধান স্থান। তথায় লক্ষ লক্ষ লোক খরিদ বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নানা দ্রব্যজাত এবং শস্যাদি আমদানি ও রপ্তানি করিত।"

ভারতবাণিজ্যে নিযুক্ত শত সহস্র আরবীয় বণিক এই মহানগরেই যাতায়াত করিত। সেই বণিকগণের সহিত সুতরাং ভারতীয় সভ্যতা এবং পূজাপদ্ধতিও আরবে আসিয়া প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মিসররাজ ওসিরিস আরবীয় নাইসা নামক স্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে ভারত-যশে আকৃষ্ট হইয়া ওসিরিস নিজে ভারতে গিয়া তথায় আর এক নাইসা নগর স্থাপন করিয়া আসেন। ওসিরিস আরবে বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়া ভারতে গিয়া সেই শিক্ষার সম্পূর্ণতা সম্পাদন করেন।

পরে মিসরে গিয়া তিনি মিসর ধর্ম্মের সূত্র-পাত করেন। শ্লিগেলের মতে মিসরসভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা হইতে সমুৎপন্ন।

তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে,ভারতবাণিজ্য-সূত্রে যে আরব,মিসর ও গ্রীক জাতি প্রাচীন ভারতের সহিত লিপ্ত ছিল,তাহাদেরই দেশে আর্য্য সভ্যতা,জ্ঞান ও ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কই, আর কোন দেশে সে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উদয় হয় নাই ত ? যদি বল,যেরূপে ভারতে জ্ঞানধর্ম্মের সঞ্চার ও উন্নতিসাধন হইয়াছে, সেইরূপেই প্রাচীন গ্রীশ, মিসর ও আরবে তাহা সঞ্জাত হইয়াছিল। সেই তিন দেশ ব্যতীত যদি অন্য কোন দেশে আর্য্যধর্ম্ম ও পূজাপদ্ধতি দেখা দিত, তাহা হইলে সে যুক্তি একদিন সারবতী বলিয়া গ্রাহ্য হইত; কিন্তু যখন ভারতসংস্পৃষ্ট জাতি ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে সে প্রকার পূজাপদ্ধতি দেখা যায় না, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, তাহা ভারতসংস্পর্শেরই ফল-স্বরূপ। মোসেস মিসর হইতে ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে আসিয়া তাহা কেমন প্রচার করেন, তৎ-প্রণীত গ্রন্থমধ্যেই তাহা উক্ত হইয়াছে। এই ইহুদী ধর্ম্মের আলোক তৎকালে চারি-দিকেই বিকীর্ণ হইয়াছিল। তাহা কৃষ্ণসাগ-রের উপকূলেও গিয়াছিল। সেই উপকূল-বাসিগণ ওডিনের (Odin) সহিত স্ক্যাণ্ডিনে-ভিয়ায় স্বদেশীয় বিদ্যালোক ও ধর্ম্মপদ্ধতি প্রচার করেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্মপদ্ধতি উত্তর ইউরোপে প্রচা-রিত হইয়াছিল। ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার এইরূপে ইউরোপময় নানা সূত্রে সংসিদ্ধ হইয়াছে।

ওদিকে ভারতে শাক্যসিংহ উঠিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানালোকে পুরাতন ও জর্জ্জরিত আর্য্যধর্ম্মে এক নূতন জীবন সঞ্চারিত হই-য়াছে। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। নববলে ও নববীর্য্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে উন্মত্ত হইয়া অশোকরাজ খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধ দ্বিশতবৎসর পূর্ব্বে দেশবিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার শাসনে (Edicts) প্রকাশিত,তিনি পঞ্চ যবন-রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক বিস্তারের জন্য প্রচারক পাঠাইয়া দিলেন। সেই পঞ্চ যবন রাজ্যের নাম সিরিয়া, মিসর, ম্যাসিডন, সাইরিণ এবং ইপাইরস। এই সমস্ত দেশ ভারতে তখন যবন-রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল।

সিরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন হইল। নূতন বলে বৌদ্ধধর্ম্ম মৃতপ্রায় ইহুদী ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত করিল। অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এসিনিস্ (Essenes) নামে বিখ্যাত হইলেন। এসি-নিসগণ সিরিয়াদেশে মৃতসাগরের (Dead Sea) পশ্চিম দিকে বাস করিতেন। এই এসিনিসগণের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন।

ইউরোপীয় ইতিহাস-বেত্তাগণের নিকট আমরা জানিতে পারি যে, প্রাচীন ইজিপ্ট ইউরোপীয় সভ্যজগতের জ্ঞান-গুরু ছিলেন। যে গ্রীশ এককালে জ্ঞান-গৌরবে পূর্ব্বতন ইউরোপীয় অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার পণ্ডিতগণ ইজিপ্ট হইতেই শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেন। থেলিস হইতে প্লেটো পর্য্যন্ত যত প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত সকলেই ইজিপ্টের বিদ্যালয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া স্বদেশে মহা যশস্বী হইয়াছিলেন *। অন্যান্য গ্রীক

*এই সকল বিখ্যাত পণ্ডিত ইজিপ্টে গিয়াছিলেন।—Thales, Pythagoras, Democritus, Empedocles and Plato তাঁহারা সকলেই নব নব বৈদিক মতের প্রচারক।

দার্শনিকগণ আবার তাঁহাদের নব নব মতে দীক্ষিত হন। গ্রীশ রোমের শিক্ষাগুরু-ছিলেন। রোমের সাম্রাজ্য-বিস্তারের সহিত তাহার জ্ঞানেরও প্রচার হইয়াছিল। সুতরাং সমস্ত ইউরোপ জ্ঞানলাভের জন্য ইজিপ্টের নিকট সাক্ষাৎ এবং পরম্পরা সম্বন্ধে ঋণগ্রস্ত ছিলেন।

এদিকে ভারতের জ্ঞানাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গ্রীশ এবং ম্যাসিডনের সুধীগণ এলেক-জাণ্ডারের (Alexander) সঙ্গে ভারতে আসিতে কষ্ট বোধ করেন নাই। এরিষ্টটল (Aristotle) আসিয়া এদেশীয় ন্যায় বিদ্যার যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, গ্রীশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে ডালপালা দিয়া নিজ মতে সাজাইয়া প্রচার করিয়া দিলেন। পির্হো (Pyrrho) ভারতীয় যতিগণের (Gymnosophists) সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় মোহিত হইয়া গিয়া-ছিলেন। তিনি তাঁহাদের মুখে বেদান্তের মায়াবাদ শুনিয়া ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অসিদ্ধতা বুঝিয়াছিলেন। তাই পির্হো স্বদেশে আসিয়া সংশয়বাদের (Sceptical School) নেতা-স্বরূপ হইলেন। ভারতের ঐশ্বর্য্য এইরূপে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাঁহার জ্ঞান-দীপের রশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল।

সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধ গ্রীশ পতিত হইল; কিন্তু তাহার জ্ঞানালোক নিবিল না। সেই জ্ঞানদীপ ভঙ্গ হইয়া আলোক পড়িল—রোমে এবং জুডিয়ায়। জিনোর (Zeno) মহান্ উপ-দেশ সকল রোমের অস্থিমজ্জাকে শক্ত করিয়া দিল।— গেলিলি (Galilee) যখন অনেক যবনের বাসভূমি হইয়াছে, গ্রীক দর্শন ও বিদ্যা যখন প্যালেষ্টাইনের চারিদিকে আলোচিত হইতেছে, যখন নিকোলস, জোসেফস (Nicholas, Josephus) প্রভৃতি অনেক বড় বড় ইহুদী গ্রীক দর্শনে সুপণ্ডিত হইয়া গ্রীক মত সকল জুডিয়ার সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন, যখন দুই শত বৎ-সর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীগণ প্যালে-ষ্টাইনের চারিদিকে বৈদিক জ্ঞানালোচনায় বিলাসী এবং ঘোর বিষয়ী ধনলুব্ধ ইহুদীগণকে লজ্জা দিতেছেন, যখন তাহাদের মতামত সর্ব্বত্র প্রবেশ লাভ করিতেছে, এমত সময়ে যীশুর জন্ম হইল।

লোকে বলে যীশু পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু পুরাতন বাইবেল-জ্ঞানে তিনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রফেটগণ তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তিনি হিব্রুভাষা ভাল জানি-তেন না। হিব্রু মিশ্রিত সিরীয় ভাষায় তিনি কথা কহিতেন। সেই ভাষায় বৌদ্ধ মতামত অনেক প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল। যে গেলিলিতে তিনি বাস করিতেন, তথায় অনেক জাতীয় লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ফিনিসীয়, সিরীয়, আরব এবং গ্রীকেরা তথায় ইহুদীগণের সহিত একত্র থাকিত।

ইহুদীজাতীয় প্রফেটগণের মধ্যে ইলি-য়সের (Elias) নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই প্রফেটকে লোকে দেবতুল্য জ্ঞান করিত। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক যোগ-সাধনায় গিরিগুহায় বাস করিতেন। তাঁহার শান্ত আশ্রমে দ্বেষহিংসা ছিল না। বন্য মৃগ-গণ তথায় হিংসাপরিত্যাগ করিয়া সুখে বিচরণ করিত। তিনি সময়ে সময়ে কেবল ব্যুত্থানকালে যখন যোগভঙ্গ হইত, তখন এক একবার গিরিগুহা হইতে বিনির্গত হইয়া

লোকলোচনের সাক্ষাৎ হইতেন। তাঁহার সম্বন্ধে E. Renan কি বলিতেছেন, দেখুন—

"This giant of Prophets and his rough solitude of Carmel, where he shared the life of wild beasts, dwelling in the hollow of the rocks, whence he issued like a thunder bolt to make and unmake kings had become, by successive transformations, a sort of superhuman being, sometimes visible, sometimes invisible and one who had not tasted of death It was generally believed that Elias would return and restore Israel"

এই যোগ সাধনা জুডিয়া মধ্যে কোথা হইতে আসিল?

জন (John the Baptist) আর এক জন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি [illegible] চর্ম্মে শরীরাবৃত করিয়া যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি কেবল [illegible] বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। এই দেখুন, Renan তাঁহার সম্বন্ধে কি বলেন—

From his infancy John was subjected by vow to certain abstinence. The desert by which he was, so to speak, surrounded, attracted him from early life. He led there a life like that of a Yogi of India, clothed with skins or cloth of camel hair having for food only locusts and wild honey."

এই জন, বৌদ্ধগণের "অভিষেককে" পবিশুদ্ধির উপায় জ্ঞান করিতেন। তাহার মতে পাপক্ষালনের নিমিত্ত আন্তরিক অনুতাপই যথেষ্ট নহে, দেহ পর্য্যন্ত পবিত্র করা চাই। চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহশুদ্ধি চাই। "স্নান" দেহশুদ্ধির নিদর্শন মাত্র, শুধু দেহশুদ্ধি নহে, আন্তরিক চিত্তশুদ্ধিরও নিদর্শন। পূর্ব্বে কেবল জলস্পর্শ করাইয়া ইহুদীধর্ম্মে লোককে গ্রহণ করা হইত। জন একেবারে অবগাহন স্নানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই স্নানরীতি ভারতে বরাবর ছিল। আর্য্যধর্ম্মে স্নান সমস্ত ধর্ম্ম সংস্কারের পূর্ব্বে আবশ্যক। বৈদিক ধর্ম্মে স্নান চতুর্ব্বিধ বারুণ্য, বায়ব্য, আগ্নেয় এবং ব্রাহ্ম। ব্রহ্মচর্য্যান্তর সমাবর্ত্তন সময়ে স্নানকারীকে "স্নাতক" বলে। বৌদ্ধধর্ম্মের "অভিষেক" বৈদিক রীতিমাত্র। জন এই স্নানের নিয়ম কোথা হইতে পাইলেন? তিনি যোগিবেশেই বা কিহেতু সাজিলেন? লোকে জ্ঞান করিত, তিনি পূর্ব্বজন্মে ইলিয়স (Elias) ছিলেন, কেবল কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন। এই জন্মান্তরের কথা বা কোথা হইতে আসিল? Renan এ কথার রহস্য এইরূপ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন—

"In fact, might there not in this be a remote influence of the Munis of India? Perhaps some of those wandering Buddhist monks who overran the world, as the first Franciscans did in later times preaching by their actions and converting people who knew not their language, might have turned their steps towards Judea, as they certainly did towards Syria and Babylon On this point we have no certainty Babylon had become for sometime a true focus of Buddhism. Boudasp (Bodhisattva) was reputed a wise Chaldean, and the founder of Sabeism. Sabeism was, as its etymology indicates, Baptism—that is to say the religion of many baptisms the origin of the sect still existing called christians of St John or Mendaites."

বাস্তবিক এ সমস্তের রহস্য পর্য্যালোচনা করিলে ভারতীয় মুনি ঋষিদিগের বিষয় স্মরণ হয়। তাঁহারা যেন [illegible] এ স্থানে তাঁহাদের শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। যে সমস্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া, তৎপরবর্ত্তী কালের ফ্র্যান্সিস্ক্যান নামক খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীগণের ন্যায়, পৃথিবীর চারিদিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তদীয় ভাষানভিজ্ঞ বিদেশীগণকে কেবল ধর্ম্মাচার ও সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান প্রভাবে শিষ্য করিতেন, বোধ হয়, তাহাদের মধ্যেই কোন কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জুডিয়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ব্যাবিলন এবং সিরিয়াতে গিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের জুডিয়াতে যাওয়ার কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ব্যাবিলন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব ক্যাল্ডীয় জ্ঞানী

বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনিই শেব ধর্ম্ম (Sabeism) প্রতিষ্ঠিত করেন। শেব ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তি-লভ্যার্থই 'অবগাহন স্নান সংস্কার'। এই শেব ধর্ম্মই বহু স্নান সংস্কার সম্পন্ন "বাপ্তিস্ম" ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্ম হইতেই বিখ্যাত সেটজন সম্প্রদায়ভুক্ত 'মেনডাইটস' নামক খ্রীষ্টানগণের উৎপত্তি।"

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বৌদ্ধ অশোক স্বধর্ম্ম প্রচারার্থ সিরিয়ায় কতিপয় বৌদ্ধকে প্রেরণ করেন। তাঁহারাই দলবল বৃদ্ধি করিয়া সিরিয়া এবং ব্যাবিলনকে নিজ ধর্ম্ম প্রচার-কার্য্যের কেন্দ্র স্বরূপ করিয়াছিলেন। জন তাঁহাদেরই একজন মন্ত্র শিষ্য হইয়া বৌদ্ধ অভিষেক প্রণালী গ্রহণ পূর্ব্বক "বাপ্তিস্ম সংস্কার" প্রচার করেন। জন সিরিয়া দেশেই "মৃত সাগরের" পূর্ব্ব-দিকে থাকিতেন। ইলিয়স (Elias, প্রফেট এই বৌদ্ধযোগী হইয়া গিরিগুহাবাসী হইয়াছিলেন। Renan স্পষ্ট না বলুন, এ কথার আভাস দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আভাস ফুটাইয়াই আমরা এ কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

সকলেই জানেন, যীশু জন কর্ত্তৃক দীক্ষিত হন। যতদিন না তিনি জনের মন্ত্র-শিষ্য হইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার হৃদয় খুলে নাই। জন তাঁহাকে অভিষেক করিয়া লইয়াছিলেন। এই জন কারাবাসের নিগ্রহও সহ্য করিয়া অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি সিংহাসনের মায়ায় প্রলোভিত হয়েন নাই। কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম-শিক্ষা প্রভাবে জনের এতদূর নিবৃত্তি জন্মিয়াছিল।

অন্য দিকে মিসর-ধর্ম্ম হইতে জুডিয়ায় বৈদিক ধর্ম্মের অনেক আলোকপাত হইয়াছিল।* যীশু জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই ইহুদী ফাইলোর (Philo) মত জুডিয়ার সর্ব্বত্র আলোচিত হইয়াছিল। তিনি গ্রীক দর্শনে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ইজিপ্টে গিয়া তথাকার ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। মিসর-ধর্ম্মে এক জন সুদক্ষ পণ্ডিত বলিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন। তাঁহার অনেক শিষ্য জুডিয়ায় মিসর-ধর্ম্মমতের উপদেশ দিতেন। মিসর-বিদ্যার আলোচনার সঙ্গে বৈদিক মত সকল জুডিয়াতে সুপ্রচারিত হইয়াছিল। যীশুর মন যে এই শিক্ষা প্রভাবেই নামমান হয় নাই, এমত কথা কে বলিতে পারে? স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যে তিনি অবশ্যই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

Renan বলেন—

"The writings of Philo have the inestimable advantage of showing us the thoughts which, in the times of Jesus, stirred souls occupied with great religious questions. Philo lived, it is true, in quite a different sphere of Judaism from Jesus; yet, like him, he was quite free from the Pharisaic spirit which reigned in Jerusalem. Philo is, in truth, the elder brother of Jesus. He was sixty two years of age when the prophet of Nazareth had reached the highest point of his activity, and he survived him at least ten years."

"যীশুর সময়ে ধর্ম্মচিন্তাশীল লোকের মনে যে যে মহান্ ধর্ম্ম কথার উত্থাপন ও আলোচনা হইত, ফাইলোর গ্রন্থাবলি তাহার অদ্বিতীয় প্রমাণ। যীশু জুডিয়ার মধ্যে থাকিয়া ইহুদী ধর্ম্মাচারের যেমন সকলই দেখিতে পাইতেন, ফাইলো দূরে থাকিয়া তেমন পাইতেন না সত্য, তথাপি জেরুসালেমের ধর্ম্মপুরোহিত ফ্যারিসিগণের যেরূপ বাহ্যাড়ম্বর পরিপূর্ণ, সাত্ত্বিকতাশূন্য, অবিশুদ্ধ ধর্ম্মাচার ও ব্যবহার ছিল, সেই মলিনতা হইতে যীশু যেমন বিমুক্ত ছিলেন, ফাইলোও তদ্রূপ। বাস্তবিক, ফাইলো যেন যীশুর অগ্রজ ভ্রাতা ছিলেন। যখন যীশুর ক্রিয়া কলাপের গৌরব চূড়ান্ত সীমায় আসিয়াছিল, তখন ফাইলোর বয়ঃক্রম বাষট্টি বৎসর, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি অন্যূন দশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।"

যীশু অভ্যুদয়ের ঠিক পূর্ব্ব কালে ফাইলোর মত সকল তখনকার পাশ্চাত্য সভ্য সমাজের সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিল। ব্যাবিলন

ও সিরিয়া হইতে সিসিলী পর্য্যন্ত পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহার মত সকল আলোচনা করিতেন। জুডিয়াতেও ফাইলোর স্কুল (ধর্ম্ম প্রচার মন্দির) স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য হইত; কারণ, ইহুদী হইবাও তিনি গ্রীক দর্শনের আলোকে মিসরধর্ম্মের মতামত পরিস্থাপন করিয়াছিলেন এবং মিসরধর্ম্মেব মতামত তাৎকালিক বৈদিক বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সমঞ্জসীভূত হইত। সে সময়ে সিরিয়ায় সর্ব্বজাতিব সম্মিলন হইযাছিল। সিডন এবং টাযারের ফিনিসিয়গণ, আবব ও ইজিপ্টবাসী, ব্যাবিলন ও পারস্য দেশীয়েরা ইহুদীগণেব সহিত সিরিয়ায় একত্রিত হইয়াছিল। এই সিরিয়ার সংস্পর্শে আসিয়া একদা মহম্মদ অদ্বয় ব্রহ্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতি মধ্যে তাহা প্রচাব করিয়াছিলেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না, আমাদের "মিশ্রদেশ" এই সিরিয়া ছিল কি না? অনেকের অনুমান, সিরিয়াই মিশ্রদেশ; কেহ কেহ বলেন, মিসরই মিশ্রদেশ বলিয়া পরিচিত। এই সিরিয়ার উপকণ্ঠে জন (John) বাস করিতেন এবং ইলিয়স একদা যোগসাধনে গিরিগুহা মধ্যে দেহ রাখিয়াছিলেন। জিসস, জনের নিকট দীক্ষিত হইয়া টাইবিরিয়স হ্রদের (Lake of Tiberius) চারিধারে জেলেদের সঙ্গে বহু দিন মিশ্রিত হইয়া অনেককে নিজ মতে আনিয়াছিলেন। জোসেফস বৃদ্ধ বয়সে যে যোগী বান্নুর (Banou) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তিনি শাকান্ন ভোজন এবং বৃক্ষপত্রের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সিরিয়ার মরুদেশে নিজ আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এসময়ে যেমন একদিকে অনেকে গ্রীক দর্শনের অনুবর্ত্তন করিতেন, অনেকে আবার ফাইলোর স্কুলে জ্ঞানলাভ করিতেন, অন্যদিকে অনেকে তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের সন্ন্যাস গ্রহণে যোগী হইয়া গিয়াছিলেন। কি ইহুদী বিদ্যা ও ধর্ম্ম, কি গ্রীক দার্শনিক তত্ত্ব, কি আরব ও মিসরধর্ম্ম, সকলই তাৎকালিক বৈদিক বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া ইহুদীজাতি মধ্যে যে জ্ঞানরাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, সেই জ্ঞানের প্রভাব ও গৌরবে সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রতিবোধিত হইয়াছিলেন। জনের গ্রন্থ আরবদেশে লিখিত, এবং আরবীয় জ্ঞানশক্তি তাহাতে সঞ্চারিত ছিল। যদিও ইহুদীজাতি বিজাতীয় ধর্ম্মের ও বিজাতীয় জ্ঞানের বিদ্বেষী ছিলেন, তথাপি সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে সেই ধর্ম্ম ও জ্ঞান তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইত। যীশু সেই বিজাতীয় কলঙ্কস্পর্শ হইতে যে একেবারে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, এমত অনুমিত হয় না। তিনি জনের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বৌদ্ধেরা যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিতেন, যাহা তাহাদের গ্রন্থে অনেক স্থলে বিদ্যমান ছিল, যীশুও সেইরূপ পন্থাবলম্বন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক যীশুর Parables ইহুদী ধর্ম্ম-সাহিত্যের এক নূতন সামগ্রী। তিনিই তাহার প্রথম পথ দেখান। কোথা হইতে তিনি Parables পাইয়াছিলেন? তৎকালে বৌদ্ধেরা যদি সিরিয়ায় না থাকিত, তাহাদেরও উপদেশরীতি যদি তদ্রূপ না হইত, তবে একদা বলা যাইতে পারিত, তাহা যীশুর স্বরচিত শিক্ষারীতি। যীশুর চরিতাখ্যায়ক Renan কি বলিতেছেন, শুনুন—

"It was in the Parable, especially, that the Master excelled. Nothing in Judaism could have served him as a model for that charming style. It was a creation of his. No doubt, there are to be found in Bhud-

dhist books some parables precisely of the same tone and of the same form as the gospel parables; but it is hard to allow that a Bhuddhist influence had any effect on them."

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেওয়া রীতিতেই আমাদের গুরুর মত গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহুদী ধর্ম্ম গ্রন্থাবলিতে এমত কিছুই ছিল না, যে আদর্শ হইতে তিনি সেই মনোহর রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে রীতি তাঁহারই সৃষ্টি। বৌদ্ধগ্রন্থাবলিতে নিশ্চিত সেই রীতির অনেক দৃষ্টান্ত ছিল—যাহা ঠিক তদনুরূপ, ঠিক সেই ধরণের ও সেই প্রকৃতির—তথাপি যীশুর গল্পাবলি যে বৌদ্ধগল্পাবলির অনুকরণ, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় না।"

সাদৃশ্য আছে বলিয়াই যে যীশুর গল্পচ্ছলে শিক্ষারীতি বৌদ্ধরীতি হইতে গৃহীত হইয়াছিল, একথা বলিতে Renan সাহসী নহেন। অথচ তিনিই বলিয়াছেন, অনেক বৌদ্ধ-ভ্রমণকারী সিরিয়া এবং ব্যাবিলনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। এসিনিস ধর্ম্ম-সম্প্রদায় তাহার ফল। জনও যে একজন এসিনিস ছিলেন, এমত আভাসও তিনি দিয়াছেন। জিসস্ জনের শিষ্য। অথচ জিসসের নিকট যে বৌদ্ধ উপদেশ-রীতি একেবারে অপরিচিত ছিল, একথা তিনি কেন মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিলেন না, আমরা বুঝিতে পারি না? তাঁহার সেই রীতি পরিচিত হইবার অন্য কারণও আছে।

জন, এণ্টিপস্ (Antipas) কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইয়া নিগৃহীত এবং নিহত হন। সেই নৃশংস রাজার ভয়ে যীশু কোন স্থানে দুদিন স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি তজ্জন্য নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কে বলিতে পারে, তিনি এই সময়ে ভারতাঞ্চলে আইসেন নাই? সে যাহা হউক, তাঁহার জীবনী লেখকেরা বলেন, গুরু জনের (John) মৃত্যুর পরই তিনি এণ্টিপসের ভয়ে মরুদেশে গিয়া অনেক দিন অতিবাহিত করেন। এই দেখুন Renan এর কথা—

"Jesus, fearing an increase of ill will on the part of Antipas, took the precaution to retire to the desert. Many people followed him there."

সিরিয়ার মরুদেশে যে সকল আশ্রম ছিল, যীশু তথায় ভ্রমণ করিয়া পালাইয়া বেড়ান। এই সকল আশ্রমে বান্নুব (Banou) ন্যায় অনেক বৌদ্ধমতাবলম্বী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সম্ভবতঃ এই সন্ন্যাসীগণের নিকট হইতে এবং জন কিম্বা বান্নুর ন্যায় যোগীগণ হইতে যীশু গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিবার রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক, যীশু জুডিয়া মধ্যে যে জ্ঞানরাজ্যে বাস করিতেন এবং তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যাহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তিনি সেই জ্ঞান ও সংস্পর্শের ফল। তিনি পুরাতন বাইবেলের উপদেশ বিলক্ষণ জানিতেন। মোসেসের গ্রন্থাবলির তথ্য তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। প্রফেটগণের গ্রন্থ ও বাইবেলান্তর্গত ধর্ম্মগীত সকল তাঁহার প্রবৃত্তিকে প্রভূত বলে উত্তেজিত করিয়াছিল। তিনি ইহুদীধর্ম্মের সারমর্ম্ম ও সাত্ত্বিক ভাব বিলক্ষণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিলেল (Hillel) সিরাকের পুত্র জিসস (Son of Sirach) * এবং ইহুদীধর্ম্মের ধর্ম্মযাজক র‍্যাবিগণ (Rabbis) যীশুকে অনেকাংশে গড়িয়া আনিয়াছিল। তাঁহার খ্রীষ্টান জীবনী লেখকগণ তাঁহার গৌরব বাড়াইবার জন্য হাজার কেন বলুন না যে, তিনি কিছুতেই মিশিতেন না, কোন কথায় থাকিতেন না, কিন্তু Renan দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার

* তৎকালে তাঁহারা অতি সাত্ত্বিক লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

উপদেশ মধ্যে তদানীন্তন ইহুদীজগৎ ও জ্ঞানরাজ্য সমস্তই আভাসিত এবং প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি না মিশিলে কি হইবে, জগৎ তাঁহাতে মিসিয়াছিল। এজগতে কেহ একেবারে অবিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। গৃহে একাকী থাকিলে কি হইবে, বাহিরের বায়ু যে সর্ব্বত্র বহিতেছে। যিনি যে কালে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাকে সেই কালের সামাজিক শক্তিতে অবশ্য নীয়মান হইতে হয়, যে সমাজ দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত থাকেন। সেই সমাজের জ্ঞানবায় তাঁহার মানসক্ষেত্রে নিশ্চয় প্রবাহিত হয়। যীশুও অবশ্য এই সাধারণ নিয়মের অধীন ছিলেন, এবং সেই নিয়ম পরতন্ত্র হইয়া তিনি অনেক বিষয়, অজ্ঞাতভাবেই হউক, বা জ্ঞাতসারেই হউক, পরের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। Renan বলিতেছেন—

"There is no one so shut in as not to receive some influence from without * * * We should say, there are great moral influences running through the world like epidemics without distinction of frontier and race. The interchange of ideas in the human species does not take place only by books or by direct instruction. Jesus was ignorant of the very name of Buddha of Zoroaster and of Plato. He had read no Greak book, no Bhuddhist Sutra, nevertheless there was in him more than one element, which, without his suspecting it, came from Bhuddhism, Parseeism or from the Greek wisdom. The great man, on the one hand, receives every thing from his age, on the other, he governs his age.

* * * * * *

Jesus, doubtless, sprang from Judaism but he proceeded from it as Socrates did from the schools of the Sophists, as Luther from the middle ages, as Lamennais from Catholicism, as Rousseau from the eighteenth century. A man belongs to his age and race even when he re-acts against his age and race.

"সম্পূর্ণরূপে বহিঃসম্পর্ক রহিত হইয়া কেহ থাকিতে পারে না। ধর্ম্মের এত তরঙ্গ পৃথিবীতে বহিতেছে যে, সে তরঙ্গ হইতে কোন জাতি বা কোন দেশ অব্যাহতি পায় না। মহামারীর ন্যায় তাহা সর্ব্বদেশেই ব্যাপ্ত হয়। শুদ্ধ গ্রন্থ বা সাক্ষাৎ মৌখিক উপদেশেই লোকের কথাবার্ত্তা চলে না। বুদ্ধদেব, জোরোয়াস্তর এবং প্লেটোর নাম পর্য্যন্ত হয় ত জিসস শুনেন নাই। কোন গ্রীকগ্রন্থ বা বৌদ্ধসূত্র, তিনি হয় ত পড়েন নাই, তথাপি জিসসের অন্তরে এমত অনেক বিষয় ছিল, যাহা তাহার অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধসূত্র পার্সীধর্ম্ম অথবা গ্রীক দার্শনিকতত্ত্ব হইতে গৃহীত হইয়াছিল। যে যুগে বড়লোকেরা জন্মগ্রহণ করেন, এক পক্ষে যেমন তাঁহারা সেই যুগের ফল, অন্য পক্ষে আবার তাঁহারা সেই যুগের নিয়ামক। জিসস নিশ্চয় ইহুদী ধর্ম্মোৎপন্ন, কিন্তু তিনি সেই ধর্ম্মের সেইরূপ ফল, যেমন সক্রেটিস, সোফিষ্ট দর্শনের, লুথর মধ্যযুগের, ল্যামেনে ক্যাথলিক ধর্ম্মের এবং রুসো অষ্টাদশ শতাব্দীর ফল। লোকে জনসাধারণের এবং নিজ কালস্রোতের বিরুদ্ধে যাইলেও তাহাকে সেই কালেরই লোক বলিতে হইবে।"

তবেই Renan স্পষ্টই বলিতেছেন, জিসস্ নিজ সময়ের এবং সমাজের ফল। এক কালে যখন বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড হিন্দুসমাজে অনেকাংশে ব্যভিচারে পরিপূর্ণ হইয়া প্রকৃত সাত্বিকধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তখন যেমন বুদ্ধদেব সমুত্থিত হইয়া বৈদিক জ্ঞানাত্মক ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজে সাত্বিকতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আবার যখন বৌদ্ধ এবং অপরাপর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের শুষ্ক জ্ঞানালোচনায় এবং সাত্বিকতাশূন্য ক্রিয়া কাণ্ডে ভারতীয় হিন্দু সমাজে বৈদিক নিষ্ঠা তিরোহিত হইয়াছিল, তখন যেমন ভগবান্ শঙ্কর ভারতে প্রকৃত বৈদিক নিষ্ঠা ও ধর্ম্মপথের পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন, এককালে বঙ্গসমাজে যখন প্রকৃত সাত্বিক ধর্ম্ম নানাবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের তামসিক আচারে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তখন যেমন চৈতন্যদেব প্রকৃত পবিত্রতা ও ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়া সাত্বিক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, জিসস্ তেমনি বাহাড়ম্বর-

পূর্ণ ইহুদী সমাজে প্রকৃত সাত্ত্বিক ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি লোকের মনে আন্তরিক নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উদাত্ত ধর্ম্মনীতি সকল তাঁহার মনে আন্তরিক ধর্ম্মভাব আরও উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিল। জনের উপদেশে তিনি ইহুদী ধর্ম্মের বহির্দ্দেশ হইতে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি নূতন কিছুই করেন নাই। পুরাতন জর্জ্জরিত ইহুদীধর্ম্মে তিনি নূতন প্রাণ-সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। সেই কার্য্যে তিনি কেবল ভগবানের সহায়প্রার্থী হইয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইযাছিলেন। তিনি ভগবানকে অহরহঃ ডাকিতেন এবং তাঁহাকে এতদূর নিকটস্থ ভাবিতেন, যেন তিনি তাঁহারই অঙ্কে সর্ব্বদা রহিয়াছেন, এরূপ জ্ঞান করিতেন। তিনি ভগবানকে পিতার মত প্রীতি করিতেন এবং সেই প্রীতি লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ভগবৎপ্রেম চৈতন্যদেব শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিও সেই প্রেমের ঈষৎ মাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়া ইহুদী সমাজে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। এই ভগবৎপ্রেম ও শরণাসক্তি জিসস্ কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন? তাঁহার ভগবানে পিতৃজ্ঞান ও প্রেম কোথা হইতে আসিল? জিসসের চরিতাধ্যায়কেরা বলেন, এই ভগবৎপ্রেম ও শরণাসক্তি জিসসের নিজ সম্পত্তি। কিন্তু জিসস্ কি তাৎকালিক ধর্ম্মসংসার হইতে অবিচ্ছিন্ন ছিলেন, এবং সেই ধর্ম্মসংসারে কি সেই আসক্তি ও প্রেম বিদ্যমান ছিল না যে বলিতে হইবে, জিসস্ তাহা কোথাও হইতে শিক্ষালাভ করেন নাই? হিলেল, সিরাকের পুত্র জিসস্ এবং সাত্ত্বিক ব্যাবিলীণ তাঁহাকে কি শিক্ষা দিয়াছিলেন? পুরাতন বাইবেলোক্ত ধর্ম্মগীত এবং জবের গ্রন্থে কিরূপ ধর্ম্মভাবের উত্তেজন হইত? নিজ গুরু জন এবং এসিনিসগণের বৈরাগ্যের দৃষ্টান্তপ্রভাব কি? বৌদ্ধধর্ম্মের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিবৃৎ তত্ত্ব কি খ্রীষ্টধর্ম্মীয় পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মার অনুরূপ তত্ত্ব নহে? Arthur Lillie বলেন, জিসস্ যে ত্রিবৃৎ তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধ—জগৎকারণ রূপে পিতা, ধর্ম্ম—পরমাত্ম-জ্ঞান এবং বাক্য রূপে পুত্র এবং মানবের পবিত্রতা সাধন ও জীবের সহিত পরমাত্মার মিলন জন্য যেমন সঙ্ঘই উপায় তদ্রূপ খ্রীষ্টধর্ম্মীয় পবিত্র-প্রেতাত্মা। এই পিতা পুত্রের ভাব খ্রীষ্টধর্ম্মে ওতপ্রোত হইয়া আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক এবং এসিনিসগণ সিরিয়া এবং ব্যাবিলনে বৈদিক ধর্ম্মের জ্ঞান, পবিত্রতা ও সন্ন্যাসধর্ম্ম চারিদিকে প্রচার করিয়াছিলেন। কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি বৌদ্ধগণ বিরোধী; তাহারা কেবল চিত্তশুদ্ধি, বিষয়বৈরাগ্য ও জ্ঞানের মাহাত্ম্য ভালরূপে বুঝিয়াছিলেন। বিষয়াসক্তি সন্ন্যাসীর নিতান্ত অপ্রীতিকর। বৌদ্ধধর্ম্মের এই সমস্ত নীতি জন (John) গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন এবং তদীয় শিষ্য যীশুকে তাহা বিধিমত শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই জন্য আমরা যীশুর উপদেশ মধ্যে বিষয়-বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধি ও আন্তরিক পবিত্রতা সাধনের ঔচিত্য, কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি বিদ্বেষভাব, ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং তজ্জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শরণাপন্ন হইয়া * তাঁহারই প্রেমে ভোর হইয়া থাকা—এ সমস্তই দেখিতে পাই। জুডিয়া এবং সিরিয়াতে ভারতীয় জ্ঞান ও ধর্ম্ম, কি বৌদ্ধগণ, কি এসিনিসগণ, কি গ্রীক

* গীতার ১৮ অ, ৬২ এবং ৬৬ শ্লোক দেখ।

পণ্ডিতগণ, কি মিসর ধর্ম্মমতাবলম্বিগণ, সকলেই প্রচার করিয়াছিলেন। পুরাতন বাইবেলেও ভারতীয় বৈদিক জ্ঞান নিহিত ছিল; কারণ, তাহা মোসেস্ লিখিত গ্রন্থাবলিরই বিস্তার মাত্র। জবের গ্রন্থ আরবীয় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। যীশু জুডিয়া এবং সিরিয়াতে লালিত এবং শিক্ষিত, সুতরাং তাঁহার উপদেশ সমূহ যে বৌদ্ধধর্ম্মভাবে এবং কিয়ৎপরিমাণে বৈদিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

বৌদ্ধেরা যেমন ত্রিবিধ তত্বের উপদেশ দিতেন, ফাইলোর শিষ্যগণও সেই শিক্ষা দিতেন। কেহ কেহ এজন্যও বলেন, ফাইলোর ত্রিবাদ হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মীয় ত্রিবিধ তত্ব গৃহীত হইয়াছে। যীশু মিসর ধর্ম্মমত হইতে শুদ্ধ যে ত্রিবিধ তত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এমত নহে, তাঁহার (Doctrine of Faith) যাহাকে ভক্তিবাদ বলিলে ঠিক হয় না, কারণ, হিন্দু ভক্তিবাদ আরও বিস্তৃত ও গুরুতর বিষয়, কিন্তু যাহাতে ভক্তিবাদের কথঞ্চিৎ আভাস আছে—তাহাও মিসর ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। একথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (১)

"Nature and God are the companions that no one can ever quit, change as man may his place, his age, his society they fill the very path of time on which he travels and the fields of space into which he looks."

দর্শন-শাস্ত্র যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি আবহমান কাল হইতে মানবমনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। যুক্তির প্রভাবে মনুষ্য অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত বিষয় নির্দ্ধারণে সক্ষম হয়। এতাদৃশ মহিমান্বিত যুক্তি যে দার্শনিকতত্বের মূলীভূত ভিত্তি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যুক্তির কষ্টি-পাথরে যে জ্ঞানের পরীক্ষা না হইয়াছে,—সে জ্ঞান অন্ধ; —সে জ্ঞানে মনুষ্যের অনুসন্ধিৎসু মন কদাচ নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে না। পণ্ডিতপ্রবর প্রবর (Kant) বলেন, অজ্ঞাত-পদার্থের নির্ণয়ে (Knowledge of the unconditioned) প্রমাণ ও যুক্তি বড় একটা কার্য্যকরী নহে। ভারতীয় দর্শনকারগণ কিন্তু একথা স্বীকার করেন না। ইঁহারা কেবলমাত্র প্রমাণ ও যুক্তি বলেই জ্ঞেয় পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অদৃশ্য, অজ্ঞাত ব্রহ্ম-পদার্থ ও পরকালাদির নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে, ইঁহারা ইউরোপীয় মনীষীগণ অপেক্ষা এবিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইঁহারা প্রমাণ ও যুক্তি বিষয়ে কতদূর পারদর্শী, সে কথা বারান্তরে বলিব। আজ আমরা দেখিব, হিন্দুদর্শন এই জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। "ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কি প্রকারে—কি কৌশলে—কিরূপ যন্ত্রে—কোথায় থাকিয়া কি দিয়া নির্ম্মাণ করিলেন? যদি এই সকল বিষয় বুদ্ধিতে আরোহণ করাইতে চাও, তবে যুক্তিকুশল সংস্কৃতাত্মা পুরুষের আন্তর-সৃষ্টির দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর—সমাহিত হইয়া চিন্তা কর—বুঝিতে পারিবে যে, ঈশ্বর কি প্রকারে কি কৌশলে এই বিচিত্র

জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, শক্তি, পরিমাণ কিছুরই ইয়ত্তা করা যায় না"। একজন ইংলণ্ডীয় বৃদ্ধ পণ্ডিত বলেন যে,

"We find that our thought seizes, with instinctive persuation, on two opposite aspects of existence,—that which *appears* and that which *is*—the transient phenomenon and the abiding ground. Phenomena alone, supported by no nucleus of the *real* would be as but flaping drapery hanging upon no solid form, but folded round the empty outline of a ghost."

হিন্দুদর্শনও এই কথাই বলেন। জগৎ ও ব্রহ্ম, নিত্য ও অনিত্য—এই দুইটাই মনুষ্য জ্ঞানের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র পদার্থসঙ্কুল জগৎ, একটী অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন মহান্ চৈতন্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত";—সেই ঋতও সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে পদার্থ-পুঞ্জ সৃষ্টি হইয়াছে। উপাদান পরিণত হইয়াই, নূতন পদার্থ অভিজাত হইয়া থাকে। কর্ত্তা পুরুষ, উপাদান লইয়াই নূতন পদার্থের গঠন করেন, ইহাই ত জাগতিক নিয়ম। 'কর্ত্তৃত্ব' কাহাকে বলে? "কর্ত্তৃত্বঞ্চ তদুপাদান-গোচরাপরোক্ষ জ্ঞান-চিকীর্ষা কৃতিমত্বং"। উপাদান বিষয়ক প্রত্যক্ষ, চিকীর্ষা বা গঠনেচ্ছা এবং তদ্বিষয়ক কৃতি বা যত্ন,—এই তিনটী লইয়াই কর্ত্তৃত্ব। যিনি যে পদার্থের কর্ত্তা হউন্, তাঁহারই এতিনটীর আবশ্যক। মৃত্তিকারূপ উপাদান হইতে ঘট নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে, কুম্ভকারের মৃত্তিকার প্রত্যক্ষজ্ঞান, ঘট-নির্ম্মাণের ইচ্ছা এবং নির্ম্মাণ বিষয়ক যত্ন,—এই তিনটী অবশ্যই থাকিবে। সেই জন্যই কুম্ভকারকে আমরা ঘটের কর্ত্তা বলি। তবে এ পরিদৃশ্যমান্ জগতের উপাদান কে? জগৎ-কর্ত্তা পরমেশ্বর, কিরূপ উপাদানকে পরিণত করিয়া এ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন? কিরূপ উপাদান লইয়া, বিধাতা এই পদার্থ-পুঞ্জ নির্ম্মিত করিয়াছেন?

এজগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট। জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরের অসাধারণ 'কর্ত্তৃত্ব'। সেই কর্ত্তৃত্বের ফলেই এই জগৎ কার্য্যাকারে আবির্ভূত হইয়াছে। জগৎ কার্য্য, এবং ব্রহ্ম উহার কারণ। হিন্দুদর্শন সমূহ, স্বীয় স্বীয় বিভিন্ন প্রণালী অনুসারে এই কার্য্য-কারণের তত্ত্ব ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। কার্য্য-কারণবাদের জটিল তর্কের মধ্যে আজ আমরা প্রবেশ করিব না; সে কথা পৃথক্ এক প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আজ্ কেবল, প্রধানতঃ ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত এই দর্শনত্রয়ের জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে কিরূপ কারণ-নির্দ্দেশ ও সৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরের কিরূপ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। ভিন্ন ২ দর্শন কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; তাহারই কতিপয় মত লইয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

হিন্দুদর্শনানুসারে, কারণ প্রধানতঃ তিন প্রকার। (ক) উপাদান বা সমবায়ী কারণ (Substantial or material cause)। (খ) নিমিত্ত কারণ (Instrumental cause)। (গ) অসমবায়ী কারণ (Non-substantial or immanent cause)। আমরা উপাদান ও নিমিত্তকারণ সম্বন্ধেই দুই এক কথা বলিয়া প্রবন্ধের অবতারণা করিব। সাংখ্য ও বেদান্ত যাহাকে উপাদান কারণ বলেন, ন্যায়দর্শন তাহাকেই সমবায়ী কারণ বলিয়াছেন। যাহার সহিত সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম উপাদান কারণ।

উপাদান কারণের সহিত নিমিত্ত কারণের প্রভেদ এই যে, জায়মান কার্য্যের শরীরে উপাদান কারণ সংযুক্ত থাকে। নিমিত্ত কারণটী সেরূপ থাকে না। ঘটরূপ কার্য্যের উপাদান কারণ মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত কারণ দণ্ড, সলিল, কুম্ভকার প্রভৃতি। ঘটরূপ কার্য্যের শরীরে মৃত্তিকারূপ উপাদান সংলগ্ন থাকিবে, কিন্তু নিমিত্ত কারণের সংস্রবও থাকিবে না। ফলতঃ, যে দ্রব্যের গাত্রে কার্য্য জন্মে, বা যে দ্রব্য বিকৃত হইয়া কার্য্য জন্মায়, তাহারই নাম উপাদান। কারণে যে কার্য্য শক্তি বিলীন হইয়া থাকে, সে উপাদান কারণেই থাকে, নিমিত্ত কারণে নহে।

"Instrumental cause is the active effective agent, while substantial cause is passive, yielding itself to be acted on by it."

এখন দেখা যাউক, জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বর কিরূপ কারণ। ন্যায়মতে ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না। এ মতে, পরমাণু জগতের উপাদান কারণ, এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ মাত্র। পরমাণু রূপ উপাদান লইয়াই, জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর সংযোগাদি ক্রিয়াবলে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। সাংখ্য-প্রণেতা কপিল স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও, তাঁহার "পুরুষ" কেই বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করা যাইতে পারে। অথবা, সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জলের মতে, ঈশ্বরই প্রকৃতি ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা ও উহাদের সংযোগে-বিধানকর্ত্তা। যাহাই হউক, সেশ্বর সাংখ্য বা নিরীশ্বর সাংখ্য উভয় মতেই, প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। ঈশ্বর বা পুরুষ নিমিত্ত কারণ মাত্র। পুরুষ সংযোগে, অথবা ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে, উপাদানভূত প্রকৃতিই পরিণতা হইয়া এই জগতের আকারে পরিণত হইয়াছে। বেদান্ত একটু বিভিন্ন পথে গিয়াছেন। তাঁহার মতে, জগৎ মিথ্যা—অবিদ্যা-কল্পিত বা অধ্যস্ত—বলিয়া একমাত্র ব্রহ্মই, জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে, অবিদ্যাশক্তি জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন এবং সঙ্গে ২ ব্রহ্মও তাহাতে বিবর্ত্তিত হইয়া আছেন। এই অবিদ্যা, কল্পিত বা মিথ্যা পদার্থ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অবিদ্যা উপাদান কারণ হইলেও, ব্রহ্মই বাস্তবিক উপাদান কারণ। সুতরাং ইঁহার মতে, ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থ মিথ্যা বলিয়া, একমাত্র ব্রহ্মই, জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এমতে, ব্রহ্ম জগতের কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না। এই ত্রিবিধ দর্শনের মতেই, জগৎসৃষ্টি-কার্য্যে আর একটী নিমিত্ত-কারণ স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার নাম সৃজ্যমান-প্রাণী-কৃত কর্ম্ম বা অদৃষ্ট। অর্থাৎ উপাদান কারণ ও অদৃষ্টাদিরূপ নিমিত্ত কারণ সহকৃত হইয়া, ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন। অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে যে কিরূপ গুরুতর দোষ হয়, তাহা আমরা বিগত চৈত্র-সংখ্যার নব্যভারতে "সুখ ও দুঃখ" নামক প্রবন্ধে প্রতিপাদন করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে, আমরা পাঠককে সেই প্রবন্ধটীও পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। সংক্ষেপে এইরূপ বিবরণ দিয়া, এখন আমরা উপরোক্ত দর্শন সমূহের মত সকল পৃথক্ ২ বিশ্লেষ করিয়া একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। আমরা এই প্রবন্ধে, সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন্ দর্শনের "প্রণালী" কিরূপ, তদ্বিষয়ে আলোচনা

করিলাম না। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই যে, এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন্ দর্শন কিরূপ "কারণ" নির্ণয় করিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শন মাত্র।

প্রথমতঃ ন্যায়-মতেরই অনুসরণ করা যাউক। ন্যায়মত এইরূপঃ—জগতের ঘট পটাদি প্রত্যেক পদার্থই অবয়ব-বিশিষ্ট (Extended)। দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত সাবয়ব-পদার্থই সংযুক্ত বা মিলিত হইয়াই আত্মলাভ করিয়া থাকে। তন্তু সমূহ মিলিত হইয়া পটের উৎপত্তি হয়। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত পদার্থ সাবয়ব, তাহারা সমস্তই তৎসমান-জাতীয় দ্রব্যের একত্র মিলনেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক সাবয়বী পদার্থকে বিশ্লেষ বা বিভাগ করিতে করিতে যে স্থলে বিভাগ কার্য্য শেষ হয়, সেই পদার্থের অতীব সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য চরম অংশ বা অবয়বকে পরমাণু বলা যায়। বস্ত্র অবয়বী পদার্থ; সূত্র সেই বস্ত্রের অবয়ব। অর্থাৎ সূত্রগুলি মিলিত বা সংযুক্ত হইয়াই বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছে। আবার সূত্র অবয়বী; অংশু তাহার অবয়ব। এইরূপ অংশু অবয়বী; তদংশ তাহার অবয়ব। এইরূপে ক্রমে বিভাগ করিতে করিতে যেস্থলে আর বিভাগ হইবে না, তাহাই পরমাণু-পদ-বাচ্য। গিরি সমুদ্রাদি সমস্ত জগৎ সাবয়ব; সুতরাং সাবয়ব বলিয়া তাহাদের আদি ও অন্ত আছে। সুতরাং পরমাণুই জগতের কারণ। বিভাগের একটী শেষ স্থান স্বীকার করিতেই হইবে। কেন না, অস্বীকার করিলে প্রকাণ্ড পর্ব্বত ও ক্ষুদ্র সর্ষপের পরস্পর পরিমাণগত কোন ভেদই থাকে না। উভয়ই সমান হইয়া পড়ে। ন্যায়মতে, পরমাণু নিরবয়ব; সুতরাং নিত্য। কেন না, যাবতীয় সাবয়ব পদার্থের বিনাশ দৃষ্ট হয়। পরমাণু নিরবয়ব; সুতরাং একটী পরমাণু যে অন্য আর একটী পরমাণু হইতে বিভিন্ন, ইহা প্রতিপাদনের জন্য, নৈয়ায়িকেরা "বিশেষ" নামে, পরমাণুগত একটী ভেদক ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন*। ইঁহাদের মতে, পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজের চতুর্ব্বিধ পরমাণু কল্পিত হইয়াছে। সৃষ্টিকালে, অদৃষ্ট রূপ নিমিত্ত কারণের সদ্ভাব ও প্রভাব হেতু, ঐ সমস্ত পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। সেই ক্রিয়াবলে, একটী পরমাণু অন্য একটী পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়। ইহাকেই দ্ব্যণুক বলে। এই দ্ব্যণুক দৃশ্য পদার্থ। এইরূপ দ্ব্যণুকাদিক্রমে পরিদৃশ্যমান্ বায়ু, অগ্নি, শরীর, ঘট, পর্ব্বত প্রভৃতি নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইঁহারা বলেন যে, কারণে যে গুণ বর্ত্তমান থাকে, কার্য্যে তাহারই সমান জাতীয় গুণ সংক্রমিত হয়। ভিন্ন জাতীয় গুণ আইসে না। সুতরাং ব্রহ্ম, জগতের উপাদান কারণ হইলে, জগৎরূপ কার্য্যে কারণের গুণ-চৈতন্য সংক্রমিত হইত। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, পরমাণুই এই জগতের উপাদান। অদৃষ্টের ন্যায়, ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ মাত্র। কেবল অদৃষ্ট কারণ হইতে পারে না, কেন না পুরুষ কর্ম্মের বা অদৃষ্টের নিষ্ফলতা দৃষ্ট হয় (ন্যায়সূত্র ৪।১।১৯); আবার কেবল ঈশ্বরও কারণ নহেন, কেন না তাহা হইলে পুরুষেচ্ছা ব্যতিরেকেই ফল হইতে পারিত (ন্যায়সূত্র, ৪।১।২০-২১); অতএব অদৃষ্টেরও সহকারিতা আবশ্যক। প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে, সংক্ষেপে এ সমস্ত কথা বলিতে হইল।

* এই জন্য কণাদ ন্যায় গ্রন্থের নাম "বৈশেষিক"।

অতএব দেখা গেল যে, ন্যায়মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এবং পরমাণু উপাদান কারণ।

দ্বিতীয়তঃ, সাংখ্যদর্শনের মতানুসরণ করিয়া দেখা যাউক্। ইহার মতেও প্রকৃতি উপাদান কারণ। সুখ দুঃখ ভোগের বীজ-ভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল ভোগের জন্য এবং অপবর্গ-লাভের জন্য,প্রধান ও পুরুষের সংযোগ হয়। "পুরুষার্থ প্রবর্ত্তিকা প্রকৃতিঃ," এবং "পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তং"। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সিদ্ধির জন্যই প্রকৃতি, কার্য্যাকারে পরিণত হয়। অথবা সেশ্বর সাংখ্যমতে পুরুষ বা জীবাত্মার অদৃষ্টের জন্য বা ভোগার্থ, ঈশ্বরই প্রকৃতি পুরুষে সংযোগ ঘটাইয়া দেন। এবং সংযোগ ফলে মহৎ ও অহঙ্কারাদি ক্রমে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হয়। গীতারও এইরূপ মত বলিয়া বোধ হয়। পুরুষ বাস্তবিক, অসঙ্গ উদাসীন। কিন্তু প্রকৃতিসংযোগহেতু, প্রকৃতির সুখদুঃখাদি স্বীয় আত্মাতে আরোপিত হইয়া, পুরুষ ও সুখী দুঃখী জ্ঞান করে। "যোগঃ অবিবেক কৃততাদাত্ম্যাধ্যাসঃ" (শ্রীধর স্বামী)—অর্থাৎ পুরুষে অজ্ঞানজনিত তাদাত্ম্যাধ্যাস, বা প্রকৃতিস্থ হেতু প্রকৃতির গুণারোপকেই প্রকৃতি পুরুষ যোগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। পুরুষের অদৃষ্টই এই সংযোগের কারণ। "কর্তৃত্বাদিকং অচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি, যথা বৎসাদৃষ্টবশাৎ গুল্পপয়সঃ ক্ষরণং"। পুরুষ-সন্নিধান আছে বলিয়াই, প্রকৃতির 'কর্তৃত্ব বলিয়া বোধ হয়; আবার প্রকৃতি-সন্নিধান আছে বলিয়াই পুরুষের 'ভোগ' হয়। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রকৃতিই ভোগ্য অদৃষ্টরূপ নিমিত্ত কারণ-যুক্ত-পুরুষের ভোগের জন্য, এই জগদাকারে পরিণতা হইয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সেশ্বর-সাংখ্য মতেও প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। এই প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণে কার্য্যজননী শক্তি লুক্কায়িত ছিল।

তৃতীয়তঃ, বেদান্ত-দর্শন। এমতে, একমাত্র ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। কিন্তু এমতের বিস্তৃত বিবরণ আর এক দিন বলিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

রাজগৃহ।

আপনি রাজগৃহের কথা শুনিতে চাহিয়াছেন*। রাজগৃহ আমি কখন দেখি নাই। আপনার চিত্ত-বিনোদন ও অনুসন্ধানে সাহায্যের জন্য সংগ্রহ করিয়া একয়টী কথা লিখিলাম।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে রাজগৃহ পবিত্র ও প্রসিদ্ধ স্থান। মহাভারত ও পুরাণে রাজগৃহের উল্লেখ আছে। ফাহিয়ান ও হুয়েন্থসাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং মহাবংশে রাজগৃহের ইতিহাস পাওয়া যায়। কনিংহাম

* আমি বিগত চৈত্রমাসে রাজগিরি গিয়াছিলাম। অনুসন্ধানের সাহায্যের জন্য বন্ধুবর শ্রীযুক্তবাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী, এম্-এ, মহাশয়ের নিকট রাজগৃহ সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নব্যভারতে প্রকাশ করিলাম। ইহার পর রাজগিরির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব। ন, স,।

ও অন্যান্য প্রত্নবিতেরা রাজগৃহ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। রাজগৃহের অপর নাম গিরিব্রজ। পাঁচটি পর্ব্বতে রাজগৃহ পরিবেষ্টিত, এজন্য রাজগৃহের নাম গিরিব্রজ হইয়াছিল। সে পাঁচটি পর্ব্বতের নামও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা বৈভার, বিপুল, বৃষভ বা পাণ্ডব, গৃধ্রকূট বা চৈত্যক ও ঋষিগিরি এই নামগুলি গ্রহণ করিলাম।

বৈভারো বিপুলশ্চৈব রত্নকূটো গিরিব্রজঃ
রত্নাচল ইতিখ্যাতা পঞ্চৈতে পাবনা নগা।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব রাজতে
সরস্বতী পুণ্যতোয়া পুণ্যারণ্যাদ্বিনিঃসৃতা॥ বায়ুপুরাণ

বহুকাল পর্য্যন্ত মগধের রাজধানী ছিল বলিয়া, ইহার নাম রাজগৃহ হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

বায়ুপুরাণে লিখা আছে :—

কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।
চ্যবনস্যাশ্রমঃ পুণ্যঃ পুণং রাজগৃহং বনম্॥

মহাভারতের মতে উপরিচর বসু রাজগৃহের জঙ্গল কাটিয়া যজ্ঞ করিয়া এখানে একটি নগর স্থাপন করেন। রামায়ণেও একথার উল্লেখ আছে :—

কুশাম্বস্তু মহাতেজাঃ কৌশাম্বীমকরোৎপুরীম্।
কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরঃ চক্রে মহোদয়ং॥
অমূর্ত্তরজসো নাম ধর্ম্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্ণাম গিরিব্রজম্॥
এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ॥
সুমাগধী নদী রম্যা মগধান্ বিশ্রুতো যযৌ।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে॥

তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ রাজগৃহে মগধের রাজধানী স্থাপন করেন। বসু-প্রতিষ্ঠিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ গিরিব্রজের বহির্ভাগে উত্তরদিকে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। জরাসন্ধের সিংহাসন এই রাজগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাক্যসিংহের জীবিতকালে পাটলি গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হয়। মিথিলার ব্রিজিদিগের প্রাদুর্ভাব সঙ্কুচিত করিতে গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে পাটলিগ্রামে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদায়াশ্ব রাজগৃহ হইতে রাজধানী তুলিয়া আনিয়া পাটলিপুত্রে স্থাপিত করেন। তদবধি রাজগৃহের পতিত দশার প্রারম্ভ। বড়লি সাহেব অনুমান করেন, বিহারের নিকটবর্ত্তী কুশাগ্রপুর রাজগৃহের পূর্ব্বে মগধের রাজধানী ছিল। কনিংহাম বলেন, কুশাগ্রপুর রাজগৃহের নামান্তর মাত্র। শাক্যসিংহের প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে বিম্বসর রাজগৃহের রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র অজাত-শত্রুও রাজগৃহে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণ উদয়াশ্বকে অজাত-শত্রুর পৌত্র এবং মহাবংশ পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উদয় খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে জীবিত ছিলেন।

বৈভার গিরির দক্ষিণ পৃষ্ঠে প্রাচীন শতপর্ণী গুহা। এইখানে বুদ্ধদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরে বৌদ্ধদিগের প্রথম সভা সমাহূত হয়। আজকাল ইহার নাম সোণ-ভাণ্ডার। তিব্বতীয় গ্রন্থে ইহার নাম ন্যগ্রোধ গুহা। হুয়েন্থসাঙ বলেন, ইহা বৈভারের উত্তর পৃষ্ঠে অবস্থিত ছিল। বৃষভ পাণ্ডব বা রত্নকূটের পার্শ্বে পিপ্পল গুহা অবস্থিত ছিল। ভোজনান্তে বুদ্ধদেব এইখানে নির্জ্জনে বসিয়া সমাধিগত হইতেন। ইহা শতপর্ণী গুহার আধ ক্রোশ পূর্ব্বে। ইহার উপর আজকাল একটি ক্ষুদ্র জৈন মন্দির দেখা যায়। বিপুলগিরির শিরোদেশে একটি বৃহৎ চৈত্যের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহাভারতে ইহাকেই চৈত্যক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গৃধ্রকূট ও

ঋষিগিরির উপর অনেকগুলি জৈন মন্দির এখন দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজগৃহের উষ্ণপ্রস্রবণের কথা প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা সরস্বতী নদীর উভয় কূলে অবস্থিত। কতকগুলি বৈভার গিরির পূর্ব্বপাদে, অন্যগুলি বিপুল গিরির পশ্চিম পাদে অবস্থিত। বৈভারের উষ্ণপ্রস্রবণের নাম গঙ্গা-যমুনা, অনন্তঋষি, সপ্তঋষি, ব্রহ্মকুণ্ড, কাশ্যপঋষি, ব্যাসকুণ্ড ও মার্কণ্ডকুণ্ড। বিপুলগিরির উষ্ণপ্রস্রবণের নাম সীতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, গণেশকুণ্ড, চন্দ্রমা কুণ্ড, রামকুণ্ড ও শৃঙ্গীঋষিকুণ্ড। শৃঙ্গীঋষি কুণ্ডকে মুসলমানেরা মকদুমকুণ্ড নাম দিয়া আপনাদের করিয়া লইয়াছে। ইহার পার্শ্বে চিল্লাসা নামে এক পীরের সমাধি স্তম্ভ অবস্থিত আছে। এই পীর প্রথমে আহীর জাতীয় হিন্দু ছিলেন,তখন নাম ছিল চিলোয়া—মুসলমান হইয়া চিল্লাসা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রস্রবণের মধ্যে সপ্ত ঋষি প্রস্রবণের জল সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ। প্রাচীন রাজগৃহ বা পুরাণ রাজগিরির আড়াই মাইল উত্তরপূর্ব্বে বিখ্যাত গৃধ্রকূট। এখন ইহার নাম শৈলগিরি। বর্ত্তমান রাজগৃহের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে প্রাচীন রাজগৃহ অবস্থিত ছিল। অজাত-শত্রুর পিতা শ্রেণীক বিম্বুসর নূতন রাজগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই "নূতন" রাজগৃহ সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল।

রাজগৃহের সাত মাইল উত্তরে বিখ্যাত নালন্দের বিশ্ব বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। * নালন্দের এখন নাম বড়গ্রাম বা বড়া গাঁও। কনিংহাম বলেন, এই নালন্দে সারিপুত্রের জন্ম হয়। হুয়েন্থসাঙের মতে নালন্দের দুই ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে কলপিনাক গ্রামে সারিপুত্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মৌদ্গল্যায়নেরও জন্মগ্রাম নালন্দ। একথাও সত্য নহে। নালন্দের দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কুলীক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বর্ত্তমান জগদীশপুরের নিকট এই গ্রাম অবস্থিত ছিল। এক সময়ে নালন্দ এত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল যে,পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল বিদেশে নালন্দের অংশ বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকিবে।

নালন্দ মঠের দক্ষিণে একটা বৃহৎ দীর্ঘিকা ছিল। শুনা যায় নালন্দ নামে এক নাগ এইখানে বাস করিতেন। তাঁহার নাম হইতে এই স্থানটীর নালন্দ নাম হয়।†

সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন্থসাঙ্গ ভারত পর্য্যটনে আগমন করেন, তিনি আসিয়া রাজগৃহ ভগ্নাবস্থায় দেখিত পান। সেই ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে এখন কোথায় কোথায়ও পতিত আছে। কিন্তু অধিকাংশই হিন্দু, জৈন ও মুসলমানের ধর্ম্মালয় বা দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। এখন আর সে স্তূপ দৃষ্টে প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির নির্দ্দেশের উপায় নাই।

হুয়েন্থসাঙ্গ বলেন, গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বুদ্ধদেব সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিক-সূত্র প্রচার করেন। রাজগৃহের অনতিউত্তরে কারণ্ডবেণুবন অবস্থিত ছিল। ইহার উত্তরেই কারণ্ডহ্রদ। ইহার উত্তর পশ্চিমে নূতন রাজগৃহ। চীন পরিব্রাজক নূতন রাজগৃহকেও ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন।

* "Nalanda which afterwards became the representative of Buddhism in Central India was founded by two upashaka brothers Mudgar-Gorrina and Shankar. At first Abhidharma was taught at Nalanda but afterwards it was the principal chosen seat of Mahayan."—Taranath.

† এই স্থলে বসাইবার জন্য রাজগৃহের একখানি ম্যাপ ক্ষীরোদ বাবু প্রেরণ করিয়াছিলেন; ম্যাপ খানি প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হইতেছে, একারণ এস্থলে দেওয়া হইল না। রাজগৃহের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সহিত এই ম্যাপ দেওয়া যাইবে। ন.স.।

পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান নালন্দকে সামান্য একটি গ্রামমাত্র দেখিয়াছিলেন। দুইশত বৎসরে নালন্দ সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য ও বজ্রগুপ্ত রাজার যত্নে নালন্দের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। হুয়েন্থসাঙ এইরূপে নালন্দের বর্ণনা করিয়াছেন:—

"গুণবান ও ক্ষমতাবান সহস্র সহস্র শ্রমণ নালন্দে বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে শত শত জনের সুখ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহারা পবিত্র ও অনিন্দনীয় চরিত্র। যুবা বৃদ্ধ তাঁহারা সকলে দিবারাত্র ধর্ম্মালোচনা করেন। তর্কশাস্ত্র শিখিবার জন্য দূরস্থ নগর হইতে পণ্ডিতেরা এখানে আগমন করেন। অনেকে নালন্দ বিহারের ছাত্র বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া বিদেশে অর্থ ও সম্মান উপার্জ্জন করে।

প্রাচীন ও নূতন ন্যায় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইলে, কেহ নালন্দবিহারের আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার পায় না। কত বিদেশীয় পণ্ডিত বিহারের দ্বাররক্ষকদিগের নিকট তর্কে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। দশ জন প্রবেশার্থীর সাত আট জন প্রবেশাধিকার পায় না। অদ্যাপি অনেকে ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতী, স্থিরমতী, প্রভামিত্র, জীনমিত্র, জ্ঞানচন্দ্র, শীঘ্রবুদ্ধ ও শীলভদ্রের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব লাভ করে।

বিহারের চতুর্দ্দিকে শত শত স্তূপাবশেষ পতিত রহিয়াছে। দক্ষিণপার্শ্বে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি অবস্থাপিত রহিয়াছে। পশ্চিম পার্শ্বে বুদ্ধবিহার। গন্ধপাত্র হস্তে লইয়া অবলোকিতেশ্বরকে কখন কখন বুদ্ধবিহারে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। অবলোকিতেশ্বর বিহারের দক্ষিণপার্শ্বে একটি বিহারে বুদ্ধদেবের নখ ও কেশ রক্ষিত আছে। ব্যাধিগ্রস্ত লোক এখানে আসিলে ব্যাধিমুক্ত হয়। ইহার একপার্শ্বে একটি অদ্ভুত বৃক্ষ আছে। উহা পাচ ছয় হাত উচ্চ। বুদ্ধদেব দন্তধাবন করিয়া দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষেপ করিলে, ঐ কাষ্ঠ নবজীবন লাভ করিয়া এই বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। সহস্রাধিক বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু এবৃক্ষের কেহ কখন হ্রাস বৃদ্ধি দেখে নাই। এক পার্শ্বে রাজা বালাদিত্য প্রতিষ্ঠিত বিহার। ইহা আয়তন ও সমৃদ্ধিতে বোধিমূলস্থ মহাবিহারের অনুরূপ। এক পার্শ্বে পূর্ণ বর্ম্মরাজা প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্ত্তি। উহা উচ্চতায় পঞ্চাশ কি ষাট হাত। এক পার্শ্বে শিলাদিত্য প্রতিষ্ঠিত একটি পিত্তল-নির্ম্মিত বিহার। এইরূপ কতশত বিহারে নালন্দ শোভমান হইয়াছে।"

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

অনুকারী অবতার।

কোনও দেশে কোনও ব্যক্তি, ক্রিয়া বা গুণ বিশেষে প্রতিপত্তি লাভ করিলে, সেই দেশের লোকেরা সেই প্রকার কর্ম্ম করিয়াই অথবা "প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির" অনুকরণ করিয়াই বিখ্যাত বা কার্য্যকুশল হইতে প্রয়াস করে। সংসারের এই রীতি এবং নীতি। ধর্ম্ম জগতেও এই রীতির অন্যথা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অনুকরণ করা সর্ব্বথা অন্যায় নহে, কিন্তু অনুকরণ দ্বারা সত্যকে অসত্য অথবা অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা, ধর্ম্ম ও ন্যায়-বিরুদ্ধ। অনেকে অবতার-

দিগের অনুকরণ করিয়া জগতে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের ইতিবৃত্ত এ পর্য্যন্ত একাধারে সংগৃহীত বা প্রকাশিত হয় নাই। মহম্মদের জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরে অনেক অনুকারী অবতারের অভ্যুদয় হইয়াছিল; খ্রীষ্টসম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় ঋষভক মুনির পুত্র নাহুশ "দ্বিতীয় রাম" বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় নিহত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের সার্দ্ধ ত্রিমাস পরে নন্দবর্ষাণ গ্রামে এক ব্যক্তি "শ্রীকৃষ্ণের আত্মা" বলিয়া ঘোষিত হওয়ায়,যদুকুলোৎপন্ন অম্বারিষ্ঠের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চৈতন্যের মৃত্যুর পরে শান্তিপুর নবদ্বীপ এবং কাটোয়ায় অনেকে দ্বিতীয় চৈতন্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। অম্বিকা কালনা নামক এক নগরে ঐ সময়ে নিস্তারিণী নাম্নী এক ব্রাহ্মণী ছিল, সে বলিত "শ্রীচৈতন্যের আত্মা আমার দেহে আসিয়া পৌছিয়াছে। আমিই এখন শ্রীচৈতন্য"। তথাকার লোকেরা এই ব্রাহ্মণীকে হত্যা করে। নিস্তারিণী ডাকিনী (ডাইন) উপাধিতে বিশেষিতা হইত। খ্রীষ্ট ও মহম্মদের সমকালে এবং তাঁহাদের মৃত্যুর পরে যে সকল ব্যক্তি "মিথ্যা অবতার"বলিয়া পরিঘোষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ইতিবৃত্ত বাঙ্গালা ভাষায় এপর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই; এই কৌতুককর বিবরণ পড়িবার যোগ্য।

খ্রীষ্টের জীবিতাবস্থায় দুই ব্যক্তি যিশু বলিয়া পরিচয় দেয়; একের নাম পলোনিয়স্, ইহার গ্রীশে নিবাস ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম বার্-জিজশ,য়িহুদী জাতি হইতে এব্যক্তি উৎপন্ন হয়। ইহাদের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। বার্-জিজশের উল্লেখ বাইবেলে আছে। খ্রীষ্টের মৃত্যুর তিনবর্ষ পরে থিউদাস নামে এক ব্যক্তি অভ্যুদিত হয়, ইহার চারি শত শিষ্য হয়, কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যে সকলেই প্রবঞ্চক বলিয়া নিহত হয়। ইহার পরে গালিলি দেশীয় য়ুদাস নামে এক ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, তাহারও ঐদশা হয়। (১) খ্রীষ্ট-শিষ্য ফিলিফ ভ্রমণ করিতে করিতে সেমেরিয়া নগরে উত্তীর্ণ হয়েন এবং শিমন নামে একব্যক্তিকে দেখিতে পান। শিমন "মন্ত্রসিদ্ধ এবং যাদুকর" বলিয়া প্রথম প্রথম লোকের নিকট পরিচয় দিত,অবশেষে "ভবিষ্যদ্বক্তা" বলিয়া পরিচয় দেয়। (২) ফিলিফ, যুক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ বাদানুবাদ দ্বারা সিমনকে পরাস্ত করেন। সিমনের হৃদয়ে খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য এমন দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয় যে,সে অবশেষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যায়। হেরোদশ নামে এক য়িহুদী রাজসিংহাসনে আরোহণ করতঃ মুকুট ধারণ করিয়া আপনাকে প্রথমে ঈশ্বর,তদনন্তর দ্বিতীয় খ্রীষ্ট বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। ইহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে,স্বর্গ হইতে দূত আসিয়া হেরোদেশের ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারে। (৩) মাসিদোনিয়া হইতে (সেণ্ট্) সাধু পল এবং সাধু লুকাস পরিভ্রমণ করিতে করিতে পথে এক স্ত্রীলোককে দেখিতে পান, এই স্ত্রীলোক "অবতার" বলিয়া পরিচয় দিয়া কুসংস্কারসম্পন্ন লোকের নিকট হইতে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিত। পল ইহাকে সংশোধন করেন। ইহাতে যাহাদের স্বার্থের হানি হইয়াছিল, তাহারা পলকে প্রহারিত ও

(১) বাইবেলের Acts of the Apostles গ্রন্থের Chap. V. শ্লোক 34 হইতে 37 দেখ।

(২) Acts of the Apostles Chap. VIII. Verses 5 to 25 দেখ।

(৩) Acts of the Apostles Chap. XII Verse. 21.

বন্দীকৃত করিতে ত্রুটি করে নাই। (৪) সেকেন্দরা নগরের আপোলোশ নামে এক য়িহুদী সদ্বিদ্বান অনুকারী অবতার বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেই জন্য ক্রমে সাধু পলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি আপনার উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন করেন এবং খ্রীষ্টের শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। ইহার অনেক বৎসর পরে য়িহুদীরা আবার খ্রীষ্টের অনুকরণ করে, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হয় নাই। সাধুপলের বাক্‌তায়, তর্কে, যুক্তিতে, চরিত্রে, অনুকারী অবতারেরা এরূপ মোহিত হইয়াছিল যে, তাহারা আপনাদের কৃত্রিম শাস্ত্র সমূহ ভস্মীভূত করিতে বাধ্য হয়। বাইবেলে লিখিত আছে—

"Many of them also which used curious arts brought their books together, and burned them before all men: and they counted the price of them, and found it fifty thousand pieces of silver. So mightily grew the word of God and prevailed"—Acts of the Apostles. Chap. XIX. Verses 19-20.

ভস্মীভূত গ্রন্থের মূল্য ৫০ হাজার মুদ্রার কম ছিল না।

মুসলমান ধর্ম্মের স্থাপয়িতা মহম্মদ সম্বন্ধে জর্জ্জ সেল লিখিয়াছেন "যে উপায়ে মহম্মদ স্বকীয় প্রতিপত্তি উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিল, আসিয়ার অনেকে সেই উপায়ে ক্ষমতা ও যশোপার্জ্জনে ত্রুটি করে নাই। (৫) মহম্মদের জীবিতাবস্থায় যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অবতারত্বের প্রবল সমকক্ষতা করিয়াছিল, মোসেলামা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুসলমানেরা সাধারণতঃ ইহাকে 'মিথ্যাবাদী' বলিয়া পরিচিত করে। মোসেলামা, হানিফা বংশ হইতে উৎপন্ন এবং ইয়ামানা প্রদেশের এক প্রধান ব্যক্তি। হিজরির নবম বর্ষে হানিফাগণ ইহাঁকে দৈত্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং ঐ বৎসরে ইনি আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া ইহা ঘোষণা করেন যে, "আমি পৃথিবীকে মূর্ত্তি পূজার দণ্ড হইতে বাঁচাইবার জন্য এবং একমাত্র ঈশ্বরের পূজার বিস্মৃতি জন্য ধরাতলে অবতার রূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। (৬) আমার হস্তেও পরমেশ্বর এক কোরাণ দিয়াছেন। ঐ কারণের কিয়দংশ এইরূপ—"স্ত্রীলোকের উদর হইতে মোসালেমা নিঃসৃত হইয়া মনুষ্য শরীরে ধরাতলে ঈশ্বরের একমাত্র পূজা বিস্তৃত করিবে।" (৭) আবুল ফার্গশ নামক আরব্য গ্রন্থকার উপরিউক্ত কৃত্রিম কোরাণের অনেক অংশ আপনার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিয়দ্দিন পরে বহুশিষ্যের নেতা হইয়া ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলে, মোসেলামা মহম্মদকে এক পত্র লেখেন, ঐ পত্রের মর্ম্ম এই—"পত্র প্রেরক—ঈশ্বরাবতার মোসেলামা। পত্রপ্রাপক—মহম্মদ। অনুরোধ এই যে, পৃথিবীকে তুমি দুই ভাগে বিভক্ত কর। আমি অর্দ্ধেক আপনি লইয়া বাকী অর্দ্ধেক তোমাকে দিব।" ইহার উত্তরে মহম্মদ লিখিলেন, "পত্র প্রেরক—ঈশ্বরাবতার মহম্মদ। পত্র-প্রাপক—মিথ্যাবাদী মোসেলামা। পৃথিবী ঈশ্বরের, তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকেই পৃথিবী দেন। ঈশ্বরভক্তগণের মঙ্গল হউক।" মহম্মদের জীবিতকাল পর্য্যন্ত মোসেলামা বড়ই পরা-

(৪) Acts of the Apostles, Chap. XV. Verses 12 to 40.

(৫) "As success in any project seldom fails to draw in imitators, Mahomed's having raised himself to such a degree of power and reputation by acting the prophet, induced others to imagine they might arrive at the same height by the same means." Al Koran by George Sale. Vide Preliminary Discourse. Page 139. (Chandos classics).

(৬) Abulfed P. P. 160 and 9.

(৭) Hist. Dynast. P. 164.

ক্রান্ত হইয়া উঠেন। হিজরীর একাদশ সনে আবুবেকর, মোসেলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে সৈন্য প্রেরণ এবং সেনাপতির পদে খালেদ ওয়ালীদ সাহেবকে নিযুক্ত করেন। এই যুদ্ধে মহম্মদের কাফ্রিদাস ওয়'শা, মোসেলামাকে নিহত করে। মহম্মদের পক্ষের লোকের জয় হয়, মোসেলামার অনেক লোক মহম্মদকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করে এবং দশ হাজার ব্যক্তি নিহত হয়। (৮) মদ্দাজবংশ হইতে সমুৎপন্ন আয়-হালা নামে এক ব্যক্তি অাঁস ও অর্ব্বি জাতিদিগের শাসনকর্ত্তা ছিল। যে বৎসর মহম্মদ মরেন, সেই বৎসরই এই ব্যক্তি অবতার বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করে। ইহার অপর নাম দুল্‌হেমার। এই ব্যক্তি বলিত "স্বর্গ হইতে সোহায়েক ও শোবায়েক নামে দুই দূত আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া থাকি।" এই ব্যক্তির স্মরণ শক্তি, বক্তৃতা শক্তি, চাতুরী এবং দৈহিক বল অতি উচ্চশ্রেণীর ছিল। লোকে সেই জন্য শীঘ্র শীঘ্র ইহার শিষ্য হইয়া পড়ে। দুলহেমার অনেক দেশ জয় করিয়া অনেক রাজাকে বধ করে, কিন্তু চারি মাস কাল অতিবাহিত না হইতে হইতেই দুলহেমার সংহত হয়। ইহার কিছু পরে তোলেহা নামে এক প্রবীণ ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং শেশাজ নাম্নী এক রমণী "নারী-অবতার" নামে বিখ্যাতা হয়। এই তোলেহা মহম্মদ-ভক্ত মুসলমানদিগের সঙ্গে পরাজিত হইয়া মিশরে পলায়ন করে এবং তথায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণ বাঁচায়। শেশাজ, মোসেলামার স্ত্রী। শেশাজের ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। 'আল হজ্দর উল্ হাশীম্' নামক প্রাচীন আরব্য গ্রন্থে লিখিত আছে, শেশাজের ৫ হাত লম্বা দীর্ঘ কেশ ছিল এবং সে যেখান দিয়া চলিয়া যাইত, তথায় যেন অগ্নি-বৃষ্টি হইত। (৯) আল আব্বাস জাতির তৃতীয় খালিফের রাজত্ব-কালে খোরাসান দেশীয় হাকীম হাশীম নামে এক ব্যক্তি অভ্যুদিত হয়েন। ইনি আলমেহেদী খালিফের বাটীতে প্রথমে গোমস্তা, তদন্তর আবু মোসালেমের অধীনে সৈনিকের পদে নিযুক্ত হয়েন। সেনা নিবাসে কাজ করিতে করিতে হাশীম আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দেয়। আরবের লোকেরা ইহাকে আল বোর্কাই বলিয়া ডাকিত। হাশীম আপনার মুখখানি কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিত, এই জন্য ইহার বোকাই নাম হইয়াছিল। লোকে বলিত, ইহার মুখশ্রী এতদূর সুন্দর ও জ্যোতির্ম্ময় ছিল যে, সাধারণ লোক তাহা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যাইত, এইজন্য ইহাকে মুখ-খানি ঢাকিয়া রাখিতে হইত। মুসা সম্বন্ধেও আমরা তাহাই পড়িয়াছি। নখশব এবং কাশ নগরে হাশীম অনেক অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। প্রবাদ এই যে, একদিন একটা কূপ হইতে হাশীম চন্দ্রমাকে উঠাইয়া লইয়া ছিলেন, সেই দিন হইতে পারস্যভাষায় তাহার সাজেন্দা অর্থাৎ চন্দ্রদ্রষ্টা নাম হইয়াছে (১০)। হাশীম

(৮) Ockley's History of the Saracens, Vol. I. P. 15 and Al Sohch, P. 158.

(৯) "She had hairs as long as seven feet and seven inches. Sesaja was a girl of exquisite beauty and to whichsoever side she turned her face the people cried out by saying here is the fire from heaven." —Al Huzdur. Intro. P. 32.

(১০) George Sale's Koran. Preliminary Disc. Page 141.

বলিত, ঈশ্বরের আত্মা আমাদের দেহে বিরাজ করিতেছে, সুতরাং আমি অর্দ্ধেশ্বর। এই কথায় খালিফেরা তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে, সেনারা পৌছিলে হাশীম একটা দুর্গে পলাইয়া আশ্রয় লয়। খালিফ-সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিলে হাশীম পলায়নের অন্য উপায় না দেখিয়া, আপনার পরিবারস্থ সকলকে বিষপাণ করাইয়া নিহত করেন, এবং তাহাদের মৃতদেহ অগ্নিতে দাহ করেন। অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। প্রবাদ আছে, ইহার মস্তকের কেশ ভিন্ন সমগ্র দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। (১১) প্রবাদ আছে, হাশীম আপনার শিষ্যগণকে জীবিতাবস্থায় বলিয়াছিল যে, "আমি মরিলে আমার অমর আত্মা আমার অদগ্ধ শুভদেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গে যাইবে এবং তথা হইতে আবার জগতে ফিরিয়া আসিবে।" ১৬৩ হিজরীতে হাশীমের মৃত্যু হয়। খোরেন দেশের বাবেক নামে একব্যক্তি সন হিজরীর ২০১ বর্ষে অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই ব্যক্তি "লামজবী" ছিল, অর্থাৎ কোনও গ্রন্থ বা কোনও ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত না, অথচ সকল ধর্ম্মকেই মান্য করিত। আফশীদ নামক যোদ্ধাকে মুসলমানেরা ইহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং আফশীদ ইহাকে পরাজয় করিয়া নিহত করিতে উদ্যত হইলে, বাবেক গ্রীশে পলাইয়া যায়। তথায় ধৃত হইয়া হত হয় বাবেক অতীব নিষ্ঠুর ও অধার্ম্মিক ছিল। প্রায় দুই লক্ষ মনুষ্যকে বাবেক অকারণ হত্যা করিয়া আপনার কৃত্রিম মতের প্রচার করিয়াছিল। তাহার মত সম্বন্ধে কোনও বিশেষ বিবৃতি পাওয়া যায় নাই। আরব্য আলতবারী গ্রন্থে বাবেকের কিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে। হিজরী ২৩৫ অব্দে মামুদ ফরাজ নামে এক ব্যক্তি বলেন "আমি দ্বিতীয় মুসা। প্রথম মুসার আত্মা আমাতে আবির্ভূত হইয়াছে।" এই ব্যক্তি ধৃত হইয়া পাদসা মোতাবকেলের সম্মুখে আনীত হইলে, পাদসা হুকুম দেন যে, "আমার প্রত্যেক সিপাহী যেন ইহার গলদেশে প্রহার করে।" এইরূপে প্রহারিত হইয়া মামুদ শমন সদনে প্রেরিত হয়। হিজরী ২৭৮ সনে কর্ম্মাটীয়ান জাতি মুসলমানদিগের সহিত বিরোধ উপস্থিত করে, ইহারা মুসলমান ধর্ম্মের ভয়ানক বিরোধী। ইহাদের নায়কের নাম কিউফা। এই ব্যক্তি প্রচার করে যে "আমি ৫০ বার উপাসনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমিই প্রকৃত ইমাম ও মহম্মদ।" ইনি আরও বলিতেন "আমিই খ্রীষ্ট, আমিই যোহন্না এবং আমিই জগতের আত্মা।" অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার প্রভুত্ব চলিয়াছিল, তাহার পরে নিহত হয়। ইহার পরে মতান্নবি অথবা আবুল বাতেনা এক সুপ্রসিদ্ধ আরব্য কবি অবতার বলিয়া পরিচয় দেয়। রাজারা ইহাকে কয়েদ করিয়া রাখে, অবশেষে এই ব্যক্তি "অবতার" বিশেষণ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলে, মুক্তি প্রাপ্ত হয়। কাব্য লিখিয়া মতান্নবি বহুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সকল অর্থ লইয়া সপরিবারে তিনি টাইগ্রীষ নদের তট দিয়া যাইতেছিলেন, পথে ডাকাইতেরা আসিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। (১২) হিজরী ৩৫৪ সনে

(১১) Vide Mr. Bayle's Dic. Hist. Art. (Abumuslimus. Letter B.)

(১২) Motanabbis Manuscript quoted by D'Herbel, Page 638.

ইহার মৃত্যু হয়। মুসলমান সাহিত্যোল্লিখিত সর্ব্বাবশিষ্ট অনুকারী অবতারের নাম তুর্ক-বাওয়া; ইহা প্রকৃত নাম নহে, কিন্তু এই উপাধিতে তিনি প্রসিদ্ধ। ইনি আমাসিয়া নগরে ৬৩৮ হিজরীতে প্রথম দেখা দেন। ইশাহক নামে ইহার এক শিষ্য ছিল, সে ব্যক্তি ইহার বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। ইহারই চেষ্টায় ৬ হাজার তুর্ক অশ্বারোহী সেনা একই দিনে ইহার মতগ্রহণ করিয়া দীক্ষিত হয়। যুদ্ধের সময় বাওয়া বলিতেন, "ঈশ্বরের আমিই একমাত্র পূর্ণ ও সত্য অবতার।" ইহার শিষ্যেরা মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগকে বড়ই নির্য্যাতন করিয়াছিল। অবশেষে খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা একত্র হইয়া ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ইহাকে নিহত করেন। আমেদ হানবল নামে জনৈক মহা বিদ্বান বলিয়াছিলেন, "আমি অবতার নহি, কিন্তু মহম্মদের মৃত আত্মার সহিত আমার সাক্ষাৎ ও কথোপ-কথন হয়।" লোকে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিল। ইহার মৃত্যুতে প্রায় বিশ সহস্র খ্রীষ্টান মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। (১৩)

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

নিশ্বাস।

১

কোথাকার বায়ু তুমি ?
কেন আস ? কেন যাও ?
কার সমাচার নিয়ে
কোন্ দেশে যেতে চাও ?
কাহারে হারায়ে যেন
লক্ষ্যহারা--দিশাহারা !
বিরাম বিশ্রাম নাই,
খুঁজে খুঁজে হও সারা !
ফুরাবে কি কোন দিন
তোমার ঐ অন্বেষণ ?
অথবা কি চিরদিন
উদাসীন এ ভ্রমণ ?

২

ধরি ধরি স'রে যাও,
মহাশূন্যে মিশে যাও ;
কে তুমি ? কেমন তুমি ?
পরিচয় নাহি দাও।
আকাশে তোমারি আশে
চেয়ে চেয়ে মিছে চাই ?
শূন্য যে তোমাতে পূর্ণ,
কই তবু দেখা পাই ?
অথচ রয়েছ ঘেরে
আমারে আমারি তরে ;
অপেক্ষা উপেক্ষা নাই ;
বসেছ হৃদয়-ঘরে।
বড় কাছে, বড় কাছে ;
এত কাছে কেহ নয় ;
জীবনের মূলে তুমি ;
তুমি যেন আমিময়।
আছ তুমি—আছি আমি ;
নাই তুমি—নাই আমি ;
তোমাতে আমার আমি ;
আমাতে আমার তুমি।

৩

এ দেহ তোমারি তরে ;
আমার কি অধিকার ?

(১৩) "It is related that on the day of his death no less than twenty thousand Christians embraced the Mahomedan faith." Sale's Koran, Preli Disc. page 122 and Khalecan (Arabic work). বাইবেলে উল্লিখিত আছে, পেণ্টেকস্টের উৎসবে পিটর এক দিনে তিন হাজার লোককে খ্রীষ্টান করেন। এই কথা লইয়া, খ্রীষ্টানেরা বড়ই মাতামাতি করিয়া থাকে। এখানে দেখুন, এক দিনেই বিশসহস্র খ্রীষ্টান স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়াছিল।

তুমি সর্ব্বময় যার
আমি তার কে আবার?
তুমি আস, তুমি যাও,
অবাধে হৃদয়-ঘরে;
কলের পুতুল আমি
দেখি শুনি চুপ ক'রে।
একটু অস্ফুট রব
উঠে পড়ে নিশিদিন;
একটু ধমনী নাচে
কভু দ্রুত, কভু ক্ষীণ;
একটু হৃদয় কাঁপে
কেন কাঁপে—তাকি জানি?
একটু কি যেন হয়?
একটু—আর না জানি।

৪

কে বলিবে কেন এই
গমনাগমন-খেলা?
কেন না ধরিতে পারি?
কেন করি তোলা-ফেলা?
উঠে পড়ে নিশিদিন,
কে তারে গণিয়া রাখে?
চুপে চুপে কথা কয়,
কে কত জাগিয়া থাকে?
রূপ-রস-গন্ধ নাই,
পরশ শবদ আছে;
পরশ-শবদ ধ'রে
কে যাবে তাহার কাছে?
অতি দূরে,—অতি কাছে;
ব্যবধান আছে—নাই;
অচেনা-আত্মীয়-সম
জানা আছে,—চেনা নাই।
হেন আপনার জন
কেমনে হইবে চেনা?
এত কাছে, তবু কেন
যে অচেনা—সে অচেনা?

৫

বড়ই আকুল চিতে
প্রবেশি হৃদয়-দ্বারে;
কি যে দেখি, কি যে শুনি,
বলিতে বচন হারে।
গভীর-গম্ভীর-ধীর
মধুর-মোহন রবে
পরিপূর্ণ প্রাণ-মন,
বচন কেমনে ক'বে?
"আমি আছি", "আমি আছি",
কে বলে অভ্রান্ত স্বরে;
"তুমি আছ", "তুমি আছ",
নিশ্বাস স্বীকার করে।
আসে যায় যত বার,
ওই কথা তত বার;
ধ্বনি সনে প্রতিধ্বনি
উঠিতেছে অনিবার।
দুজনার সে কথার
শেষ নাই, ক্লেশ নাই;
যত শুনি তত যেন
মৃত দেহে প্রাণ পাই।

৬

কে আর বধির রবে?
কেমনে ভুলিব আর?
নিশ্বাস বহিয়া আনে
কি আশার সমাচার।
আমি ঘুরি যার তরে;
বলি "কোথা-কই-কই"?
সে বলে "তোমারি ঘরে,
চেয়ে দেখ ওই—ওই"।
জানিতাম বহু দূরে
আমার দেবতা যিনি,
কে জানিত এত কাছে—
এত কাছে ব'সে তিনি!

নিশ্বাস তাঁহারি দূত,
কাছে কাছে সবাকার ;
তাঁরি সাক্ষী-প্রতিনিধি,
সাকারেতে নিরাকার।
পাছে না চিনিতে পারি,
তাই কাছে থাকাথাকি;
পাছে না শুনিতে পাই,
তাই এত ডাকাডাকি।
নিশ্বাস-ইঙ্গিত পেয়ে
জেগে তাই ব'সে আছি ;
বলি আর শুনি তাই
"তুমি আছ," "আমি আছি"।
নিশ্বাস শিখায়ে দেয়
ছটি কথা সাধনায়,
ও মন্ত্র আপনি ব'লে
আমারে বলাতে চায়।
নিশ্বাস সামান্য নয়,
নিশ্বাস জাগায়ে দেয়;
নিশ্বাস বিশ্বাসী করে,
নিশ্বাস চিনায়ে দেয়।

৭

কোথায় তোমায় তবে
বুঝিতে রহিল বাকি ?
কেমনে নিশ্বাস আর
ছলিবে অদৃশ্য থাকি ?
মহাকাল-বক্ষ হ'তে
ক্ষুদ্র সে তরঙ্গ তুমি ;
মহাপ্রাণ-অংশ তুমি,
বুঝেছি বুঝেছি আমি।
যে নাম তোমার হ'ক,
দিনু "তুমি আছ"—নাম,
যে কাম তোমার র'ক,
তুমি নও মোরে বাম।
নিশ্বাস, তোমারি সাথে
প্রবেশি হৃদয়-ঘরে ;
নিশ্বাস তোমারি স্বরে
চিনে লই প্রাণেশ্বরে !
কঠোর সাধন-পথ
আর না খুঁজিতে চাব ;
এমন সহজ পথে
সহজে চলিয়া যাব।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

শ্রীভগবদ্গীতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

যোগযুক্ত শুদ্ধচিত, আত্মজয়ী যেই
জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতে ভাবে আত্মবৎ—
কর্ম্ম করি হেন জন লিপ্ত নাহি হয়। ৭

(৭) যোগযুক্ত—কর্ম্মযোগ যুক্ত।

শুদ্ধচিত্ত—রজস্তম মলায় অকলুষিত, সত্বযুক্ত (গিরি মধু)।

জিতেন্দ্রিয়—বিষয়ানুরাগ শূন্য (বলদেব)।

আত্মজয়ী—দেহ জয়ী (শঙ্কর, স্বামী)।

সর্ব্বভূতে ভাবে আত্মবৎ—(মূলে আছে, "সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা")। অর্থৎ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতগণের আত্মভূত আত্মা বা চৈতন্য যাহার, অথবা যে সম্যকদর্শী (শঙ্কর)। যে জড় অজড় সর্ব্বত্র কেবল আত্মমাত্র দর্শন করে (মধু)। সর্ব্বজীবে আত্মভূত অর্থাৎ প্রেমাস্পদগত আত্মা বা দেহ যাহার। এস্থলে সকল আত্মার একত্ব উল্লিখিত হয় নাই (বলদেব)। দেবাদি সর্ব্বভূতে প্রকৃতি পরিণাম হইতে নানা আকারে প্রতীয়মান হেতু তাহা আত্মাকারে দর্শন করা অসম্ভব। প্রকৃতি বিযুক্ত সর্ব্বজীবদেহে জ্ঞানের একাকারতা জন্য যে সাম্য, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে (রামানুজ)। বলা বাহুল্য যে রামানুজ, বলদেব ইঁহারা দ্বৈতবাদী ; জীবভাব নিত্য এবং ব্রহ্মের স্বরূপ হইলেও ব্রহ্ম হইতে জীব ভিন্ন; ইঁহারা এই মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

'নাহি কিছু করি আমি'—করে ইহা মনে
যোগরত তত্ত্ববিদ্ ; দর্শন, শ্রবণ,
স্পর্শ, ঘ্রাণ, শ্বাস, নিদ্রা, ভোজন, গমন। ৮
আলাপ, গ্রহণ, ত্যাগ, উন্মেষ, নিমেষ—
ইন্দ্রিয়েরা এ সকল ইন্দ্রিয় বিষয়ে
প্রবর্ত্তিত—এই রূপ করিয়া ধারণা। ৯

ব্রহ্মে সমর্পণ করি আসক্তি ত্যজিয়া
করে কর্ম্ম যেই জন, সেত নাহি হয়
পাপে লিপ্ত—পদ্ম পত্র জলেতে যেমন। ১০
কায় মন বুদ্ধি আর সুধু ইন্দ্রিয়ের
সহায়ে—যোগীরা করে কর্ম্ম আচরণ,
আসক্তি করিয়া ত্যাগ আত্মশুদ্ধি তরে। ১১

জ্ঞান পরিপাকেই এইরূপ 'সর্ব্বভূতে আত্মভূত আত্মা' হওয়া যাইতে পারে। অজ্ঞান নষ্ট হইলে যখন আদিত্যবৎ জ্ঞান উদয় হয় (১৬), তখন পণ্ডিত সর্ব্বজীবে সমদর্শী হয় (১৮), অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া মনকে সেই ব্রহ্মে বা সাম্যে স্থির করিয়া রাখিতে পারেন। ধ্যানযোগে এইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান আরও বিশদ হয়। এই জন্য গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ॥ ২৩
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০

বেদান্তে 'তত্ত্বমসি' রূপ যে মহাবাক্য আছে, এই তত্ত্ব তাহারই সম্প্রসারণ মাত্র। জর্ম্মাণ পণ্ডিত খ্যাত-নামা সপেনহর, তাঁহার কৃত "World as Will and Idea" নামক পুস্তকে, এবং আধুনিক জর্ম্মাণ পণ্ডিত পল ডুসেন তাঁহার দর্শন গ্রন্থে কেবল এই একটী মাত্র তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বুঝাইয়াছেন। ইহা তাঁহারা তাঁহাদের উক্ত গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। এই তত্ত্বই অদ্বৈত-বাদের মূলসূত্র ; ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মূল ভিত্তি।

কর্ম্ম করি—লোকসংগ্রহার্থ অথবা স্বাভাবিক কর্ম্ম করি (স্বামী)।

লিপ্ত—অনাত্মবিষয়ে আত্মাভিমান প্রযুক্ত লিপ্ত (রামানুজ, বলদেব)।

(৮) তত্ত্ববিদ্—আত্মযাথাত্ম্যতত্ত্ববেত্তা (শঙ্কর)।

দর্শন, শ্রবণ……দর্শন শ্রবণাদি দ্বারা এস্থলে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপার, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্যাপার, পঞ্চ প্রাণ বায়ু ও পঞ্চ গৌণবায়ুর ব্যাপার এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে (মধু)। (তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

(৯) এইরূপ করিয়া ধারণা—সকল ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যে অকর্ম্ম বা আত্মার অকর্তৃত্ব দর্শন করিয়া। ইহাই সম্যক দর্শন। এইরূপ অবস্থাতেই সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের অধিকার হয়। কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন হেতু এই অধিকার হয় (শঙ্কর)। ইন্দ্রিয়গণ আমার 'বাসনা' অনুসারে পরমাত্মা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই এইরূপে প্রবৃত্ত হয়—ইহা ধারণা করিয়া (বলদেব)। মধুসূদন এই শ্লোকের আরও এক অর্থ করেন। তিনি বলেন, প্রথমে কর্ম্মযোগে যুক্ত বা সমাহিত হইয়া পশ্চাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববিদ্ হইয়া আমি কিছু করি না এইরূপ মনে করেন। এ অর্থ অসঙ্গত নহে। আমি কিছু করি না, ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ ব্যাপারেই প্রবর্ত্তিত হয়, কর্ম্মযোগী ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াও কর্ম্মযোগ রত হয়েন, এই অর্থও হইতে পারে।

(১০) ব্রহ্মে সমর্পণ করি—ঈশ্বরে কর্ম্ম নিক্ষেপ বা সমর্পণ করিয়া। অর্থাৎ স্বামীর জন্য যেমন ভৃত্য কর্ম্ম করে, সেইরূপ প্রভু ঈশ্বরের জন্য আমি কর্ম্ম করিতেছি—আমার নিজের জন্য নহে, এইরূপ ধারণা সহ কর্ম্ম করিয়া (শঙ্কর, মধু, স্বামী)। কিন্তু রামানুজ ও বলদেব ভিন্ন অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন, এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে বিশ্বাত্মক প্রকৃতি। কেননা, গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে, "মমযোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম" ; শ্রুতিতে আছে, "তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে।" প্রকৃতি বা প্রধানের পরিণামেই দেহ ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হয়। এই জন্য এই প্রকৃতিতেই দর্শনাদি কর্ম্মের কর্তৃত্ব আরোপ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু গীতাতে এই প্রকৃতিকে (বা অপরাপ্রকৃতিকে) পরমাত্মার বা পরমপুরুষেরই অংশ বিশেষ বা একরূপ অভিব্যক্তি, ইহা বলা হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে কর্ম্ম ব্রহ্মে আরোপ করাও যাহা, প্রকৃতিতেও আরোপ করাও তাহা। তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, (কর্ম্মব্রহ্ম সমুদ্ভব) অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—আমাতেই সমস্ত কর্ম্ম সংন্যস্ত করিয়া কর্ম্মযোগ করিতে হইবে (৩।৩০)।

পাপ—দেহাত্ম অভিমান রূপ পাপ (বলদেব), পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্ম (মধু)।

(১১) কায়, মন, বুদ্ধি…ইন্দ্রিয় সহায়ে—কায়কর্ম্ম—যথা স্নানাদি, মনকর্ম্ম—যথা ধ্যানাদি, বুদ্ধি-

কর্ম্ম ফল করি ত্যাগ, শান্তি নিষ্ঠাজাত
কবে লাভ যোগীগণ। নহে যোগী যেই
বদ্ধ হয় কাম বশে—ফলাসক্তি হেতু। ১২
সর্ব্ব কর্ম্ম মনবলে করিয়া সন্ন্যাস,
চিত্তজয়ী দেহী—সুখে নবদ্বার পুরে
করে বাস, না করিয়া কর্ম্ম - না করায়ে। ১৩

কর্ম্ম—যথা তত্ত্বনিশ্চযাদি, ইন্দ্রিয়কর্ম্ম—যথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম (স্বামী)। কায় মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সাধ্য কর্ম্ম (রামানুজ)।

শুধু—(মূলে আছে 'কেবলৈঃ') শুধু বা কেবল—এই বিশেষণ কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়—প্রত্যেক সম্বন্ধেই প্রযুক্ত (শঙ্কর, মধু)। কেবল—অর্থাৎ মমত্ব বুদ্ধি শূন্য (শঙ্কর, মধু)। কর্ম্মাভিনিবেশ রহিত (স্বামী)। কেবল - অর্থাৎ বিশুদ্ধ (বলদেব)।

আত্মশুদ্ধি তরে—অনাদি দেহাত্মাভিমান নিবৃত্তির জন্য (বলদেব), চিত্তসত্ত্বশুদ্ধির জন্য (শঙ্কর, মধু)। প্রাচীন কর্ম্ম বন্ধন বিনাশ জন্য (রামানুজ)।

(১২) যোগীগণ—(মূলে আছে 'যুক্ত')—ঈশ্বরার্থ আমি কর্ম্ম করি আমার নিজের কোন ফল লাভার্থ নহে – এইরূপে যে সমাহিত সেই যোগী (শঙ্কর, মধু)। পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ (স্বামী)। আত্মাপরায়ণ বা আত্মাতিরিক্ত ফলে স্পৃহাশূন্য (রামানুজ)।

নিষ্ঠাজাত শান্তি—অর্থাৎ প্রথম কর্ম্মযোগে সত্ত্বশুদ্ধি, পরে জ্ঞান প্রাপ্তি, পরে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস, শেষে জ্ঞাননিষ্ঠা—এই কর্ম্মনিষ্ঠা ক্রম হইতে জাত মোক্ষাখ্য শান্তি (শঙ্কর, মধু)। অত্যন্ত শান্তি বা মোক্ষ (স্বামী। কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা স্থির আত্মানুভবরূপ নিবৃত্তি (রামানুজ)। স্থির শান্তি (বলদেব)।

কামবশে—কামনা হেতু কর্ম্মে প্রবৃত্ত (শঙ্কর, স্বামী)।

(১৩) সর্ব্ব কর্ম্ম—নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য ও প্রতিসিদ্ধ এই সকল কর্ম্ম (শঙ্কর) বিক্ষেপ কারণ সকল কর্ম্ম (স্বামী)।

মনোবলে—বিবেক বুদ্ধিতে, কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করিয়া (শঙ্কর) দেহাকারে পরিণত প্রকৃতিতে কর্তৃত্ব সংন্যস্ত করিয়া—ও আত্মার অকর্তৃত্ব স্থির করিয়া বিবেকযুক্ত মনে (রামানুজ, বলদেব)। গিরি বলেন, মনের দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস লাভ করিলেও লোক-সংগ্রহার্থ বাহিক সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে।

সন্ন্যাস—স্বামী ও মধুসূদন বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত কয় শ্লোকে চিত্তের অশুদ্ধ অবস্থায় সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ, ইহা বুঝাইয়া দিয়া এই শ্লোক হইতে বুঝান হইয়াছে যে, শুদ্ধচিত্তের কর্ম্মসন্ন্যাস কর্ম্মযোগ অপেক্ষা শ্রেয়। সুতরাং এস্থলে সন্ন্যাস অর্থে কর্ম্ম পরিত্যাগ। কিন্তু এ অর্থ ঠিক সঙ্গত বোধ হয় না। গিরি এবং বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য বলদেব ও রামানুজ সকলেরই মতে এই শ্লোকে আত্মার কর্ম্ম সন্ন্যাস মাত্র উক্ত হইয়াছে। জ্ঞান বলে আত্মার কর্তৃত্ববুদ্ধি লোপ হইলে, তাহার কোন কর্ম্মই থাকে না। তাহার কোন কর্ম্মে প্রয়োজন থাকে না। দেহ-শক্তি দ্বারা বা কায়মন বাক্যের দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহা হয় দেহের রক্ষা জন্য, না হয় লোকসংগ্রহ জন্য প্রয়োজন, তাহা নিজের জন্য নহে। এরূপ ব্যক্তি দেহশক্তিকে ও অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়াদির পর-প্রয়োজনার্থ কর্ম্মে নিয়োগ করেন মাত্র।

প্রভু নাহি লোক তরে করেন সৃজন
কর্তৃত্ব বা কর্ম্ম কিম্বা কর্ম্ম ফল যোগ—
কিন্তু হয় প্রবর্ত্তিত স্বভাবই কেবল। ১৪

দেহী—যাঁহার দেহাদি সংঘাত ব্যতিরিক্ত আত্মা এই জ্ঞান হইয়াছে, তিনি দেহকে গৃহের ন্যায় বাসস্থান মাত্র মনে করেন, তাহাতে আত্মবোধ থাকে না—এরূপ লোক (শঙ্কর) লব্ধজ্ঞান জীব (বলদেব)।

সুখে—আয়াসের হেতু কায়মনোবাক্য দ্বারা কর্ম্ম চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, প্রসন্নচিত্ত হইয়া, আত্মা ব্যতিরিক্ত সকল বাহ্য বিষয়ে প্রয়োজন শূন্য হইয়া (শঙ্কর) শরীর ক্লিষ্ট হইলেও সকল প্রকার ক্লেশ শূন্য হইয়া (গিরি)।

নবদ্বার পুরে—দুই বাহু, দুই কর্ণ, দুই নাসা, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই নয় দ্বার যুক্ত দেহে।

করে বাস না করিয়া কর্ম্ম—অর্থাৎ জ্ঞান লাভ দ্বারা যে প্রারব্ধ কর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয় নাই, তাহা দগ্ধ হইলেও, যে পরিমাণ প্রারব্ধ কর্ম্ম-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, ও যাহার ফলে দেহ লাভ হইয়াছে—কর্ম্ম সন্ন্যাসী সেই দেহে বাস করে। তাহার বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, এবং সে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও সেই দেহ ধ্বংশ হয় না। সাংখ্য-দর্শনে আছে জীবন্মুক্ত হইলেও "চক্রবৎ ধৃত শরীরং।" অর্থাৎ কুম্ভকার চক্র ঘুরান বন্ধ করিলেও যেমন তাহা আরও কতক্ষণ ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ সংস্কার বীজ ধ্বংশ হইলেও সেই সংস্কার-জাত দেহ তাহার স্বাভাবিক ধ্বংশের সময় পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়।

(১৪) প্রভু—আত্মা (শঙ্কর, মধু)। ঈশ্বর (স্বামী)। ইন্দ্রিয়াদির স্বামী—জীব (বলদেব)। নিষ্ক্রিয় আত্মা (রামানুজ)। এখানে স্বামীর অর্থ অধিক সঙ্গত বোধ হয়। পরবর্ত্তী শ্লোকের 'বিভু' ও এই শ্লোকের 'প্রভু' বোধ হয় একার্থক।

লোকতরে—(মূলে আছে 'লোকস্য') অর্থাৎ এই জীবের (শঙ্কর, বলদেব)। দেব, তির্য্যক, মনুষ্য স্থাবরাত্মক প্রকৃতি সংসর্গে বর্ত্তমান লোকের (রামানুজ)

কর্ম্ম—রথ ঘট প্রাসাদ আদি ঈপ্সিত কর্ম্ম (শঙ্কর)।

বিভু নাহি লন কারো পাপ বা সুকৃতি;
অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান রহে আবরিত
যেই হেতু হয় মুগ্ধ জীবগণ সবে। ১৫

কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বারা হয় যাহাদের
সে অজ্ঞান বিনাশিত, তাহাদের জ্ঞান
প্রকাশে পরমে সেই—আদিত্যের প্রায়। ১৬

স্বভাব—অবিদ্যালক্ষণ প্রকৃতি—মায়া (শঙ্কর, মধু)। অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বাসনা (বলদেব, রামানুজ) অনাদি অবিদ্যা ও কাম প্রবৃত্তি বা স্বভাব (স্বামী)।

প্রবর্ত্তিত—আত্মা কর্ত্তা নহেন, প্রকৃতিই কর্ম্মের মূল। আত্মা চৈতন্যময়, তাঁহার সহিত কর্ম্মের কোন রূপ আপেক্ষিক সম্বন্ধ নাই। অনাদি অবিদ্যাই জীবের পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়।

স্বামী বলেন, শ্রুতিতে উক্ত আছে, "এষ এব সাধু কর্ম্মকারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উপনীষতে, এষ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য অধোনীষতে।" এই শ্রুতি অনুসারে অস্বতন্ত্র পুরুষ পরমেশ্বরের দ্বারা শুভাশুভফলযুক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং ঈশ্বরের প্রেরণা বিনা পুরুষ কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে পারে না, এরূপ সংশয় হইতে পারে। আর এরূপ স্থলে পরমেশ্বরকেই এ লোকের "বৈষম্য নৈঘৃণ্যের কর্ত্তা" বলিতে হয়। অর্থাৎ এখানে আমরা একজনকে পাপে রত, অন্য একজনকে পুণ্য কর্ম্মে লিপ্ত এইরূপ প্রভেদ দেখিতে পাই; অন্য দিকে একজন সুখী আর একজন দুঃখী, এ পার্থক্যও দেখিতে পাই। পার্থক্যের কর্ত্তা ঈশ্বর, জীব নহে, জীব তাহার কৃত কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে, ঈশ্বর অন্যায় করিয়া একজনকে বৃথা কষ্ট দেন, একজনকে বা সুখী রাখেন, এইরূপ ধারণা করিতে হয়। ইহার উত্তরে বেদান্ত দর্শনে (২।১।৩৪) আছে' "বৈষম্য নৈর্ঘৃন্যেন সাপেক্ষত্বাৎ" (৪র্থ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ জগতের অনাদি বাসনা ও কর্ম্ম বীজ হইতেই সৃষ্টিতে বৈষম্য হয়। ঈশ্বর সেই কর্ম্ম ও বাসনা শক্তির নিয়ামক মাত্র। নতুবা তিনি নির্লিপ্ত ও অকর্ত্তা। এই কর্ম্ম ও বাসনা হইতে জগৎ প্রবর্ত্তিত হয়। এই তত্ত্ব এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

(১৫) বিভু—ঈশ্বর (শঙ্কর, মধু, স্বামী)।

নাহি লন—ঈশ্বর পাপ, অথবা পূজাদি লক্ষণ যাগ হোমাদিজ সুকৃত ভক্তের নিকট হইতে গ্রহণ করেন না (শঙ্কর)। ঈশ্বর ভক্তকে অনুগ্রহ বা অভক্তকে নিগ্রহ করেন না। (স্বামী)।

মধুসূদন বলেন, "উক্ত 'এষ এব সাধু... ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত বাক্যে, এবং

"অজ্ঞো জন্তুরনীশোয় মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বর প্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥"

ইত্যাদি স্মৃতি বাক্য যদিও আপাততঃ পরমেশ্বরে বৈষম্য নৈঘৃণ্য আরোপিত হয়, কিন্তু এই সকল শ্রুতি স্মৃতি বাক্য ব্যবহারিক। শঙ্কর বলেন, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্ম শাস্ত্রই অবিদ্যা-প্রসূত। পরমার্থতঃ জীবের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, পরমেশ্বরের কারয়িতৃত্বও নাই।"

বলদেব বলেন, "বিভু অপরিমিত বিজ্ঞান আনন্দ ঘন, অনন্তশক্তিপূর্ণ, নিজে পরিপূর্ণ আনন্দ মগ্ন, সুতরাং তিনি অন্যত্র উদাসীন পরমাত্মা। অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বাসনা নিবন্ধন বুভুক্ষিত ও নিজ সান্নিধ্য মাত্রে পরিণত প্রধানময় দেহবান জীবকে বিভু, সেই বাসনা অনুসারে কর্ম্ম করান মাত্র। শাস্ত্রে আছে,

"যথা সন্নিধি মাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে।
মনসো নোপকর্ত্তৃত্বা তথাসৌ পরমেশ্বরঃ॥
সন্নিধানাৎ যথাকাশ কালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ।
তথৈবা পরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান হরি॥"

বলদেব আরও বলেন, শ্রুতিতে যে "স অকাময়ত" বলিয়া ব্রহ্মের ঈক্ষণ বা ইচ্ছা হইতে জগৎ সৃষ্টির কথা আছে, তাহা এই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, বলদেব বৈষ্ণব ও দ্বৈতবাদী ছিলেন। এই জন্য এস্থলে তাঁহার ব্যাখ্যা ও মধুসূদনের অদ্বৈত-বাদানুসারে ব্যাখ্যা কিছু স্বতন্ত্র।

অজ্ঞানের দ্বারা—আবরণ বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত মায়া নামক মিথ্যা তামস অজ্ঞানের দ্বারা (মধু)।

রহে মুগ্ধ—জীব, ঈশ্বর, জগৎ—ইহার মধ্যে ভেদরূপ ভ্রম উৎপাদনের অধিষ্ঠাতা অজ্ঞান কর্তৃক পরমার্থ সত্য আবৃত থাকায়,—প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ—ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ, ইত্যাদি ভেদযুক্ত সংসার রূপ মোহ আবরণে জ্ঞান বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। (মধু)।

জ্ঞানাবরণ রূপ কর্ম্ম দ্বারা জীব দেহাত্মাভিমানরূপ মোহে আবৃত হয়, ও সেই অভিমান মত কামনানুসারে কর্ম্ম করিয়া মুগ্ধ থাকে।

(১৬) আত্মজ্ঞান—আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞান শঙ্কর), বেদান্ত বেদ্য অদ্বৈতজ্ঞান (মধু)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বং জ্ঞান প্লবনেন বৃজিনং সন্তরিষ্যতি।" ৩।৩৬

অন্যত্র, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।"

অন্যত্র, "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।৪।৩৮

এইস্থলেও সেই জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে।

যাহাদের—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন, "এই 'যাহাদের'—অর্থাৎ এই বহুবচন প্রয়োগ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জীবাত্মা (বা পুরুষের) বহুত্বই প্রকৃত সত্য, উহা কেবল উপাধিক নহে। জীব ও ঈশ্বর এক স্বভাব হইলেও ভিন্ন। পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে যে বহুজীববাদ ও ঈশ্বরবাদ উক্ত হইয়াছে, তাহা যে ব্যবহারিক বা উপাধিক নহে, তাহাই যে প্রকৃত তত্ত্ব—তাহা এই শ্লোক হইতেই বুঝা যায়।

অজ্ঞান—গীতার অনেক স্থলে এই 'অজ্ঞান' শব্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহার অর্থ এস্থলেও একটু বিশদ করিয়া বুঝা উচিত। শাস্ত্রে মায়া, প্রকৃতি, অজ্ঞান ও অবিদ্যা, এই চারিটী কথা আছে। বেদান্ত মতে অজ্ঞান ও প্রকৃতি একার্থক অজ্ঞানের সাত্ত্বিক অংশকে মায়া, ও রাজস ও তামস অংশকে অবিদ্যা বলে। এই মায়া উপহিত ব্রহ্মই, ঈশ্বর ও অবিদ্যা উপহিত চৈতন্যই জীব।

বেদান্ত মতে এই অজ্ঞান সদসদাত্মক। অর্থাৎ ইহা আছে একপ বলা যায় না, ইহা নাই এ কথাও বলিতে পারা যায় না। ইহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ ইহার প্রকৃত স্বরূপ ব্যবহারিক জ্ঞান বুঝিবার কোন উপায় নাই। বেদান্ত মতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নাই সত্য, কিন্তু তাঁহা হইতেই এই বহুময় জগৎ যে প্রকাশিত হইয়াছে, মায়াবাদী না হইলে ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। মায়াবাদেও জ্ঞানের আবরক অন্য বস্তুর কল্পনা করিতে বাধ্য হইতে হয়। শঙ্করাচার্য্য (বেদান্ত দর্শনভাষ্যে) বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, অনাদি কালপ্রবর্ত্তিত বাসনা বা সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি আছে। তাহাই অনির্ব্বচনীয় মায়া। তাহাই জগতের বৈষম্যের কারণ। পরমেশ্বর তাহার নিয়ন্তা মাত্র। সাংখ্য মতে ইহাই প্রকৃতি, আর বেদান্ত মতে ইহাই মায়া। সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত। বেদান্তে মায়ার পৃথক অস্তিত্ব স্পষ্ট করিয়া স্বীকৃত হয় নাই। বেদান্ত মতে জীব ও ব্রহ্ম এক। কিন্তু ব্রহ্ম ও মায়া যে এক, ইহা স্পষ্ট বলা নাই। গীতায় কেবল সাংখ্য ও বেদান্ত মত সামঞ্জস্য করিয়া, মায়া ও ব্রহ্ম এক, মায়া পরমেশ্বরের প্রকৃতি বা স্বভাব, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। চণ্ডীতে এই মায়াকেই পরমেশ্বরের চিন্ময়ী উপাস্য শক্তি বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম চৈতন্যে মায়া আছে বলিয়া, বা মায়া ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া এই জগৎ ব্রহ্ম চৈতন্যেই প্রতিভাত। জীব চৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যের অংশ ব্যবহারিক ভাবে বলা যায়। এই জন্য জীব চৈতন্যেও এই জগৎ প্রতিভাত।

যাঁহারা দ্বৈতবাদী, তাঁহারা আমাদের এই জগৎ জ্ঞানকে, অর্থাৎ দিককালে সংস্থিত এই বৈষম্যময় কর্ম্মাত্মক জগতের জ্ঞানকে অজ্ঞান বলেন না। ইহাদের মতে জীবের বাসনা বা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার মতে কর্ম্মপ্রবৃত্তিই প্রকৃত অজ্ঞান (রামানুজ)।

এই অজ্ঞান সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী মধুসূদন যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল। তিনি বলিয়াছেন, 'অজ্ঞান কেবল জ্ঞানের অভাব নহে। উহা ভাব রূপ। কেন না, উহা জ্ঞানকে আবরণ করে, ও জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। যাহা নাই তাহার বিনাশ অসম্ভব। অজ্ঞান যাহার বিষয় ও আশ্রয়, সেই বিষয় ও আশ্রয়ের প্রমাণ জ্ঞান হইতেই নিবৃত্তি হয়, ইহাই ন্যায়শাস্ত্র সঙ্গত সিদ্ধান্ত।"

অজ্ঞান—আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি বিশিষ্ট। আবরণ দ্বিবিধ। প্রথম, যাহা সৎ তাহাকে অসৎ বলিয়া ধারণা, অর্থাৎ যাহা আছে, তাহার অস্তিত্ব না জানা, দ্বিতীয় যাহা আছে, তাহাকে প্রত্যক্ষ না করা বা তাহার স্বরূপ না জানা। প্রথম আবরণ—পরোক্ষ অপরোক্ষ ও সাধারণ প্রমাণ জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়। পর্ব্বতে অগ্নি না দেখিয়াও কেবল ধূম দেখিয়া পর্ব্বতে অগ্নি আছে, অনুমান প্রমাণ দ্বারা এই জ্ঞান হইতে পারে। বেদান্তবাক্য হইতে ব্রহ্ম আছেন এই পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। দ্বিতীয় আবরণ প্রত্যক্ষ দ্বারা নষ্ট হয়। বেদান্ত বাক্য হইতে ব্রহ্ম আছেন, ইহা জানিয়াও ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আমার যে অজ্ঞান থাকে, তাহা সাধনা বিশেষের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে দূর হইতে পারে।" (এই অজ্ঞানের অর্থ আরও বিশদ বুঝিতে হইলে অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি হইতেই এই জগতের সৃষ্টি ও বিকাশ হয়। মায়াবাদ মতে এই অজ্ঞান হেতুই জ্ঞাতা, জ্ঞানে—জ্ঞেয় বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। অজ্ঞান দূর হইলে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাব একীভূত হয়, তখন পূর্ণপ্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। জ্ঞানের এই সকল তত্ত্ব এস্থলে আলোচ্য নহে।

প্রকাশে পরমে সেই—(মূলে আছে 'প্রকাশয়তি

তৎপরং')। অর্থাৎ সর্ব্ব জ্ঞেয় বস্তু যে পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞান তাহাই প্রকাশ করে (শঙ্কর)। পরিপূর্ণ ঈশ্বর স্বরূপ প্রকাশ করে (স্বামী)। 'সেই' অর্থাৎ সেই জ্ঞান, পরম অর্থাৎ দেহাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব ও ঈশ্বরে প্রকাশ করে (বলদেব)। 'সেই' স্বাভাবিক ও 'পরম' অর্থাৎ অপরিমিত অসঙ্কুচিত জ্ঞান সর্ব্ব বিষয় যথাবস্থিত প্রকাশ করে (রামানুজ)। ব্রহ্মজ্ঞান শুদ্ধ সত্ত্বপরিণাম ব্যাপক ও প্রকাশরূপ, উহা প্রকাশ মাত্রেই অজ্ঞান দূর হইয়া পরম অর্থাৎ সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে (মধু)।

আদিত্যের প্রায় —সূর্য্য যেমন উদয় হইয়াই অন্ধকার নষ্ট করতঃ বাহ্যবিষয়কে, আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করে, সেইরূপ পরমার্থ জ্ঞান উদয় হইলেই অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া যায়। (দ্বিতীয় ম্লাক নবম শ্লোক ও তাহার ভাষ্য দৃষ্টব্য)।

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় এই শ্লোকোক্ত তত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে। সেস্থলে বলা হইয়াছে যে, আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রে মতভেদ আছে। এক শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতে আমাদের কোন সহজাত জ্ঞান থাকে না। ক্রমে ক্রমে আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সহায়ে জ্ঞানার্জ্জন করি। বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষই আমাদের সকল জ্ঞানের মূলীভূত কারণ। ইহারা প্রত্যক্ষবাদী। মায়াবাদী দার্শনিকগণের মতে বাহ্য বিষয়ের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। জ্ঞাতা স্বয়ংই জ্ঞান পথে বা ইন্দ্রিয়াদি পথে বাহিরে গিয়া আপনার জ্ঞেয় বিষয় সৃজন করে। আর আমাদের জ্ঞানে এই বাহ্য বিষয়রূপ ছায়া পড়ে মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতে ব্যবহারিক ভাবে জগৎ সত্য বটে। কিন্তু ইন্দ্রিয় পথে সেই জগতের ছায়া আমাদের অন্তরে আসিয়া আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন করে না। উহা জ্ঞান শক্তির বিকাশ করে মাত্র। অথবা জ্ঞান বহির্মুখী হইয়া সূর্য্যের ন্যায় আপনিই জগৎপ্রকাশ করে ও নিজে প্রকাশিত হয়। আমাদের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। উহা চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের স্বভাব। জীব সেই ব্রহ্ম চৈতন্যের অংশ বলিয়া তাঁহা হইতেই জ্ঞান লাভ করে। অথবা ব্রহ্মের জ্ঞান জীবের অন্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে মাত্র। তবে জীবের অন্তর মলিন বলিয়া সে জ্ঞান প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট হয়। অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে পূর্ণ জ্ঞান তাহাতে আপনিই প্রতিভাত হয়। তাহার জন্য শাস্ত্র বিহিত প্রমাণের প্রয়োজন নাই। এই অন্তঃকরণের মলিনতাই অজ্ঞান। অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইলে এই বহুত্বময় জগতের মধ্যে একত্ব বা ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন 'তৎ' 'ত্বং', 'অহং' 'ইদং' ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এই শেষ মত বেদান্ত শাস্ত্রের ও গীতার।

এই তত্ত্বজ্ঞান বা সর্ব্বব্যাপক জ্ঞান (Universal impersonal reason—Cousin) বা এই অজ্ঞান বন্ধনমুক্ত জ্ঞান (Pure knowledge freed from the bondage of affects—Spinoza) বা এই অনাপেক্ষিক জ্ঞান (Absolute reason—Hegel) বা এই পরমার্থ জ্ঞান (Transcendental reason—Kant) বা এই নিত্যবোধ স্বরূপ চৈতন্য (শঙ্কর), স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। অর্থাৎ ইহা ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় প্রমাণাদি দ্বারা উৎপন্ন হয় না। ইহা ব্যক্তি বিশেষের অজ্ঞানাবরণ দ্বারা, সেই অজ্ঞানাবরণের ঘনত্ব অনুসারে, অল্পাধিক পরিমাণে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় আবৃত থাকে। কেবল যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজনিত বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা এই পরমার্থ জ্ঞান আবরিত থাকে, তাহা নহে। কেননা বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান সত্যজ্ঞান। এক বিজ্ঞানেই সর্ব্ব বিজ্ঞান হয়—ইহা বেদান্তের সার সিদ্ধান্ত। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত কর্ম্ম ও বাসনা জাত সংস্কার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান আবরিত থাকে। প্রবৃত্তি দমন হইলে, অভিমানাত্মক অহঙ্কার নষ্ট হইলে, সংস্কার ধ্বংশ হইলে, তবে চিত্ত নির্ম্মল হয়। তখন চিত্তে প্রকৃত জ্ঞান প্রতিভাত হইতে পারে। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান লাভের পথ। বেদান্ত শাস্ত্রে ও গীতায় ইহা বুঝান হইয়াছে। সমগ্র ইউরোপীয় দার্শনিক দিগের মধ্যে স্পাইনোজাই প্রধানতঃ এই তত্ত্ব কতক বুঝিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

এ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিতে হইবে। কেবল প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণ হইতে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে আত্মা ঈশ্বর বা জগতের মূল তত্ত্বের কোন জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কেননা তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের বিষয় নহে। এই কারণে বলা যাইতে

পাবে যে, বাহ্য বিষয় জ্ঞান চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া তাহা তত্ত্ব জ্ঞানের অন্তরায় অথবা প্রকৃত জ্ঞানের আবরক। প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ হইতে কেন আত্মা, ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান জন্মিতে পাবে না, তাহা এক্ষণকার দর্শন শাস্ত্রজ্ঞকে বলিয়া দিতে হইবে না। লক (Locke) প্রমুখ প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণকে যে পরিণামে জড়বাদে বা অজ্ঞেয়তাবাদে বা নাস্তিকতাবাদে উপনীত হইতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন। এই তত্ত্ব সম্প্রতি জর্ম্মান পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট ও বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। এই জন্য আপ্ত প্রমাণ বা বিশ্বাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়, ইহা অনেক আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিশ্বাস বা অবিশ্বাস (শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা) আমাদের উল্লিখিত সংস্কার বা বাসনার অধীন। এই সত্য এস্থানে বিস্তারিত বুঝাইবার স্থান নাই। প্রসঙ্গ ক্রমে এসম্বন্ধে ইংরাজি চলিত কথা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল,—

"Convince a man against his will,
He's of the same opinion still."

সুতরাং আপ্তবাক্য বা শাস্ত্রে বিশ্বাসবান হইতে হইলেও চিত্তের নির্ম্মলতা প্রয়োজন। অথবা সে জন্য সুসংস্কার অর্জ্জন করিতে হয়। এই জন্য চিত্তশুদ্ধির কারণ প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তি সাধন প্রয়োজন। সুসংস্কার অর্জ্জিত হইলে তবে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা জন্মিতে পাবে, নতুবা নহে। এই সুসংস্কার জন্মিলে—চিত্ত নির্ম্মল হইলে—বা রাগ দ্বেষ দ্বন্দ্বজ্ঞানাদি হইতে মুক্ত হইলে, তবে বেদান্ত বাক্যে আমাদের আস্থা বা শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, ও ক্রমে তাহা হইতে পরমাত্ম জ্ঞান লাভ হইতে পারে।

কিন্তু এই জ্ঞান লাভই শেষ নহে। অজ্ঞানের উক্ত দ্বিতীয়রূপ আবরণ (ভাতে'প্যভানাপাদকং—মধু) অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা দূর করিয়া বিজ্ঞান লাভ করিতে হয়। এই বিজ্ঞান লাভের জন্য যোগ বা সমাধির প্রয়োজন। এই সমাধি হইতেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়—তখন জ্ঞান অজ্ঞানাবরণ হইতে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। সে সকল বিষয় এ স্থলে আলোচ্য নহে। এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, আজি পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিত প্রকৃত জ্ঞান লাভের—এই এক মাত্র পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

এই অজ্ঞান সম্বন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলিয়াছেন যে, সংসার দশায় কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে; মোক্ষ দশায় এই সঙ্কোচ দূর হইয়া জ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রথম শ্লোকের টীকায় এই তত্ত্বের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দুইরূপ শক্তি আছে—জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তি, অথবা নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি শক্তি। ইহাদের মধ্যে একটী আর একটীকে সঙ্কুচিত করে—জ্ঞান বৃদ্ধিতে কর্ম্ম বৃত্তির সঙ্কোচ হয়, আর কর্ম্ম প্রবৃত্তির বৃদ্ধিতে জ্ঞানের সঙ্কোচ হয়। এই কর্ম্ম শক্তির মূল অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বাসনা। এই বাসনা হইতেই জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। এই বাসনা হইতে আমরা সুখভোগের জন্য ও দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করি, ও সেই কারণ সুখজ বিষয় লাভ করিবার জন্য ও দুঃখজ বিষয় পরিহার জন্য আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। শুধু তাহাই নহে। এই প্রবৃত্তিই প্রথমতঃ জ্ঞান শক্তিকে নিয়মিত করে। অর্থাৎ কোন বস্তু আমাদের সুখজ বা দুঃখজ, কোনটী আমাদের ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানবৃত্তি প্রবৃত্তি-পরিচালিত হইয়া স্থির করিতে ব্যস্ত থাকে। তখন শুধু জ্ঞান লাভের জন্য বা বস্তুর স্বরূপ জানিবার জন্য—কোনরূপ আগ্রহ বা সংস্কার থাকে না।

অতএব কর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল আমাদের অহঙ্কার (Personality বা Self-assertion)। এক কথায় বলা যায়, মানুষ সাধারণতঃ ইহ বা পরকালের স্বার্থ জন্য কর্ম্ম করে। এই জন্য যদি কর্ম্মের এই মূলোচ্ছেদ করা যায়, যদি স্বার্থ অহঙ্কার ত্যাগ করা যায়, যদি নিজের জন্য কোনরূপ কর্ম্মের প্রয়োজন নাই—এইরূপ সংস্কার উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে সে অবস্থায় কেবল শরীর রক্ষার জন্য ও লোকসংগ্রহ বা পরহিত জন্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিলে, সেই প্রকৃত কর্ম্মসন্ন্যাস অবস্থায় সেরূপ কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের সঙ্কোচ হয় না। এই নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব গীতায় বড় পরিষ্কার করিয়া বুঝান আছে। আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জর্ম্মান পণ্ডিত সপেনহর এই তত্ত্ব যত বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন, তত পরিষ্কার করিয়া বোধ হয় আর কেহ বুঝান নাই। (তাহা বুঝিতে হইলে, তৎকৃত 'World as Will and Idea' নামক পুস্তক আমাদের পাঠ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।) তিনি

তাহে বুদ্ধি, তাহে আত্মা, তাহে নিষ্ঠাযুত,
তাহে পরায়ণ যারা—জ্ঞানধৌতপাপ
হয়ে যায়—যেথা হতে নাহি আসা ফিরে।১৭

আমাদের বাসনা প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে Assertion of the will বলিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, সমগ্র হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের এবং সার খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মূল সূত্র এই "Denial of the will" বা বাসনাদমন। বাসনাবীজ নষ্ট হইলে তবে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়, তবে মুক্তি হয়।

(১৭) তাহে—সেই পরমে (শঙ্কর) :

বুদ্ধি—সাধনা পরিপাকে বাহ্য সর্ব্ব বিষয় ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার পর্য্যবসিত অন্তঃকরণ বৃত্তি। অর্থাৎ নির্বীজ সমাধি দ্বারা পরমাত্মা সাক্ষাৎকৃত বুদ্ধি (মধু)। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (স্বামী)। সেইরূপ আত্মদর্শনে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (রামানুজ)।

তাহে আত্মা—পরমাত্মায় বুদ্ধিযুক্ত হইলে ব্রহ্মতত্ত্বই কেবল বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়—তখন বোদ্ধা বোদ্ধব্য থাকে না, দেহাদি অভিমান নিবৃত্তি হয়। জীবাত্মা পরমাত্মায় একীভূত হয় (মধু)। তাহে যত্নশীল (স্বামী), তাহে নিবিষ্ট মন (বলদেব, রামানুজ)।

তাহে নিষ্ঠা—তাহে অভিনিবেশ অর্থাৎ ব্রহ্মে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ করিয়া তাঁহাতেই অবস্থান (শঙ্কর)। সর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ বিক্ষেপ নিবৃত্তি দ্বারা তাঁহাতে অবস্থান (মধু), সেই অভ্যাস নিরত (রামানুজ), তাঁহাতে তৎপর (স্বামী)।

তাহে পরায়ণ—তিনিই পরমগতি বা আশ্রয় যাহার (শঙ্কর, স্বামী)। তিনি একমাত্র প্রাপ্তব্য, সুতরাং কর্ম্মফলে অভিলাষ বিহীন (মধু)।

মধুসূদন বলিয়াছেন, 'তাহে বুদ্ধি' ইহা দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকার কথিত হইয়াছে। 'তাহে আত্মা' ইহা দ্বারা অনাত্ম বিষয়ে অভিমানরূপ বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তির ফল নিদিধ্যাসন পরিপাক বুঝাইতেছে; 'তাহে নিষ্ঠা' ইহা দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক বেদান্ত বিচার বুঝাইতেছে।

নাহি আসা ফিরে—(মূলে আছে 'অপুনরাবৃত্তি')। যাহাতে পুনর্ব্বার দেহ সম্বন্ধ না হয় (শঙ্কর মধু), মুক্তি (স্বামী, বলদেব)।

যেমন ব্রাহ্মণে—বিদ্যা বিনয় ভূষিত,
তেমনি গো হস্তী, আর কুক্কুর চণ্ডালে—
সর্ব্বত্রই সমদর্শী পণ্ডিত যাহারা। ১৮
হেথা তারা সর্গজয়ী—যাহাদের মন
এই সাম্যে রহে স্থির; ব্রহ্মই নির্দ্দোষ
সাম্যময়, তাই তারা ব্রহ্মে অবস্থিত। ১৯

পাপ—পাপাদি সংসার কারণ (শঙ্কর), পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্ম (মধু)।

(১৮) ব্রাহ্মণ ..চণ্ডাল—'ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল' উল্লেখ দ্বারা কর্ম্ম বৈষম্য বুঝাইতেছে, এবং ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী এইরূপ উল্লেখ হইতে জাতি বৈষম্য বুঝাইতেছে, (স্বামী, বলদেব)। অথবা উত্তম সংস্কার যুক্ত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, মধ্য সংস্কার যুক্ত রাজস গো, আর সংস্কারবিহীন তামস হস্তী প্রভৃতি ..(শঙ্কর, মধু)।

চণ্ডাল—(মূলে আছে 'শ্বপাক')। ইহারা অত্যন্ত অস্পৃশ্য সংস্কারহীন নীচ জাতি। পূর্ব্বে ইহারা গ্রামের ভিতরে বাস করিতে পাইত না। (মনু ১০।৫১ দ্রষ্টব্য)।

সমদর্শী—এক অবিক্রিয় ব্রহ্মদর্শী। সম—অর্থাৎ ব্রহ্ম (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। অর্থ এই যে, আপাত দৃষ্টিতে সর্ব্বত্র বৈষম্য দর্শন হইলেও যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁহারা এই বৈষম্য মধ্যে কেবল একত্ব দর্শন করেন, সকলের মধ্যেই এক অখণ্ড অবিভক্ত ব্রহ্ম দর্শন করেন। তাঁহারা কেবল দেখেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

রামানুজ বলেন, বৈষম্য প্রকৃতির কার্য্য—আত্মার নহে। আত্মা সর্ব্বত্র সমান—জ্ঞানের একাকার হেতু সমান। সেই জন্য আত্মস্বরূপদর্শী পণ্ডিত আপাত প্রতীয়মান বৈষম্য মধ্যে সমত্ব বা বৈষম্যবিহীনত্ব দর্শন করেন।

গিরি বলেন, সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক সংস্কারের দ্বারা ব্রহ্ম সংস্পৃষ্ট হন না। তিনি সর্ব্বভূতে অদ্বিতীয়, কূটস্থ, অসঙ্গ আছেন।

পণ্ডিত—জ্ঞান দ্বারা যাহার অজ্ঞান নাশিত হইয়াছে সেই পণ্ডিত (শঙ্কর)।

(১৯) সর্গজয়ী—সর্গ, অর্থাৎ জন্ম (শঙ্কর)। সংসার (স্বামী বলদেব, রামানুজ)।

প্রিয় লাভে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয় লভিয়া

হেথা—সংসারে (বলদেব, রামানুজ)। জীবিত কালে (শঙ্কর, স্বামী)।

সাম্যে রহে স্থির—অবৈষম্য আখ্যাযুক্ত অর্থাৎ বৈষম্য বিহীন ব্রহ্ম ধর্ম্মে নিবিষ্ট (বলদেব)। প্রকৃতির সংসর্গ দোষ বিহীন হেতু "সম"। এই 'সম'ই আত্মবস্তু ব্রহ্ম। সেই আত্মসাম্যে স্থির থাকিতে পারিলে ব্রহ্মে স্থিত হওয়া যায়। এই ব্রহ্মে অবস্থান করিতে পারিলেই সংসার জয় হয় (রামানুজ)।

শঙ্কর প্রমুখ ভাষ্যকারগণ বলেন যে, সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক স্বভাবের প্রভেদ অনুসারে, প্রাণী-গণ মধ্যে যে বৈষম্য সংসারে সকল সময়েই দেখা যাই-তেছে, সেই বৈষম্য মধ্যে সমত্ব দর্শন করা ধর্ম্মশাস্ত্রে নি-ষিদ্ধ হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত এই যে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের নিকট চণ্ডাল বা কুক্কুর অস্পৃশ্য। গোতম স্মৃতিতে আছে, 'সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাত।" অর্থাৎ চতুর্ব্বেদ পারগ অত্যন্ত সদাচারীব্রাহ্মণকে যেরূপ বস্ত্র অন্নাদি দান পূর্ব্বক পূজা করিতে হয়, সেইরূপ সদাচারীকে তদপেক্ষা হীন পূজা করিলে, অথবা হীনাচারী বিদ্যা বিহীনকে যে পরিমাণে পূজা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ লোককে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা সদাচারী পণ্ডি-তের ন্যায় পূজা করিলে, সেরূপ পূজার অন্ন অভোজ্য হয়, ও সেরূপ পূজক ধর্ম্মবিহীন ও হেয় হয়। সুতরাং গীতার এই উপদেশ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিবিরোধী ইহা আপাততঃ বোধ হয়। শঙ্করাচার্য্য এই বিরোধের মীমাংসা করিয়া বলেন যে, যাহারা মুক্ত হয় নাই, সংসার মধ্যে আছে, তাহারা বৈষম্য দর্শন না করিয়া থাকিতে পারে না, কেননা সংসারই বৈষম্যময়। এই সকল লোকে সেই বৈষম্য অনুসারে সংসারে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি। কেননা এরূপ লোক যদি বাহিরে সাম্যভাব দেখাইয়া বা মুখে সাম্যের কথা বলিয়া অন্তরে বৈষম্য ভাব রাখে, তবে তাহাকে মিথ্যাচারী হইতে হয়। কিন্তু যিনি প্রকৃতই সর্ব্ব-ভূতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া, সাম্যের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, ব্রহ্মে অবস্থান করেন—তিনি জীবন্মুক্ত। সংসারে তাঁহার বৈষম্য দর্শন হয় না। তিনি সংসার অবস্থায় প্রযোজ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অতিক্রম করিয়াছেন, পাপ পুণ্যের বাহিরে গিয়াছেন।

নাহি হয় বিষাদিত, ব্রহ্মবিদ্ যেই
স্থির বুদ্ধি মোহহীন—ব্রহ্মে তার স্থিতি। ২০

ব্রহ্মই নির্দ্দোষ সাম্যময়—নির্দ্দোষ, অর্থাৎ রাগ দ্বেষ শূন্য (বলদেব), অথবা প্রকৃতি সংসর্গ দোষ বর্জ্জিত (রামানুজ)। প্রকৃতির গুণভেদ হেতু পার্থক্য—নির্গুণ চৈতন্যে নাই। ব্রহ্ম সর্ব্ববিকার শূন্য, কূটস্থ, নিত্য, এক। শাস্ত্রে আছে পুরুষ অসঙ্গ। শ্রুতিতে আছে—

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু
র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ।"

ব্রহ্ম ইচ্ছাদি ধর্ম্ম দ্বারা কলুষিত হন না, কেন না এ সকল অন্তঃকরণ ধর্ম্ম, চৈতন্যের নহে। ব্রহ্ম—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জীবে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও স্বয়ং নির্গুণ বলিয়া দেহ ও অন্তঃকরণ ধর্ম্মাদি দ্বারা গুণযুক্ত হন না। তিনি প্রতি শরীরেই সমভাবে অবস্থিত। (শঙ্কর, মধু)।

(২০) প্রিয়—ইষ্ট (শঙ্কর)। দেহমাত্রে আত্ম-দর্শী যাহারা, তাহারাই ইষ্ট লাভে আহ্লাদিত ও অনিষ্ট সম্পাতে বিষাদিত হয় (শঙ্কর)। যে প্রকারে অবস্থিত কর্ম্মযোগীর সমদর্শনরূপ জ্ঞানবিপাক হয়, তাহাই এই শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে (রামানুজ)। মধুসূদন বলিয়াছেন যে, যাহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারা স্বভাবতই প্রিয় লাভে হৃষ্ট ও অপ্রিয় লাভে বিষাদিত হন না, কিন্তু যাঁহারা মোক্ষার্থী, তাঁহাদের যত্ন করিয়া এই অবস্থা লাভের জন্য অনুষ্ঠান বা সাধনা করিতে হয়।

স্থির বুদ্ধি—আত্মাতে যাহার বুদ্ধি স্থির থাকে, সেই স্থিরবুদ্ধি (বলদেব, রামানুজ)। আত্মা সর্ব্বত্র সম এইরূপ অটল বা নিশ্চিত বুদ্ধি যাহার (শঙ্কর)। সন্ন্যাস পূর্ব্বক বেদান্ত বাক্য বিচার পরিপাকে সর্ব্ব সংশয় শূন্য হেতু নিশ্চল বুদ্ধি (মধু, স্বামী)।

মোহহীন—অস্থায়ী শরীরের সহিত নিত্য আত্মার একীকরণ বা দেহাত্মজ্ঞানই মোহ (রামানুজ, বলদেব)। মধুসূদন বলেন, স্থিরবুদ্ধি হওয়া শ্রবণ মনন-নের ফল। আর মোহহীন হওয়া নিদিধ্যাসনের ফল।

বাহ্য বিষয়েতে যার অনাসক্ত-চিত,
আত্মাতেই যেবা সুখ জানে যেই জন,
সেই ব্রহ্মে যোগযুক্ত—ভুঞ্জে নিত্য সুখ। ২১
বিষয় সংস্রবজাত ভোগ যে সকল
দুঃখেরই কারণ তারা—আদি অন্তযুত;
হে কৌন্তেয়, বুধগণ নহে তাহে রত। ২২

নিদিধ্যাসন দ্বারা বিজাতীয় প্রত্যয় অন্তরিত হইয়া সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ দৃঢ় হয়। বিপরীত ভাবনা দূর হয়। এই বিপরীত ভাবনাই সন্দেহ। তাহার পর সমাধি পরিপাকে ব্রহ্মে স্থিতি হয়, জীবন্মুক্তি হয়।

ব্রহ্মে অবস্থিতি—সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসী হয় (শঙ্কর)। দেহাত্মাভিমান দূর হইয়া স্থিররূপ আত্মাবলোকন লাভ হইলে, হর্ষ বিষাদের অতীত হইয়া ব্রহ্মে স্থিতি হয় (রামানুজ)।

(২১) বাহ্য বিষয়েতে—(মূলে আছে 'বাহ্যস্পর্শ') শব্দাদি বিষয় (শঙ্কর), বাহ্য ইন্দ্রিয় স্পৃষ্ট বিষয়ে (স্বামী-মধু),আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে (রামানুজ)। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে আছে 'মাত্রাস্পর্শ'। উক্ত শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

সুখ—উপসমাত্মক সাত্বিক সুখ (স্বামী),আনন্দ—তৃষ্ণাক্ষয় জনিত সুখ (মধু)। মহাভারতে আছে—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং।
তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাং॥"

মধু বলেন, তৎ ও ত্বং পদার্থের ঐক্যানুভবই পূর্ণ সুখ। তৎ ও ত্বং পদার্থের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ত্বং অর্থাৎ জীবে ও তৎ বা ব্রহ্মে ঐক্য অনুভবে—অহংকার নষ্ট হইয়া মুক্ত অবস্থা হয়। তখন আমাদের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এই অনুভব একেবারে লোপ হইয়া যায়।

ব্রহ্মে যোগযুক্ত—ব্রহ্মে সমাহিত বা সমাধিযুক্ত (শঙ্কর, স্বামী)।

নিত্য সুখ—বাহ্য বিষয় স্পর্শজাত সুখ অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই ব্রহ্মাত্মানুভব সুখ অক্ষয় (মধু, শঙ্কর)।

(২২) বিষয় সংস্রবজাত—(মূলে আছে 'সংস্পর্শজা')। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ বা সম্বন্ধ হইতে জাত (শঙ্কর, মধু)।

ভোগ—সুখ (স্বামী, বলদেব)।

দুঃখেরই কারণ তারা—এইরূপ সুখ অবিদ্যাজাত বলিয়া ইহা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের কারণ। আর শুধু এই লোকে নহে—উভয় লোকেই দুঃখের কারণ—(শঙ্কর)। আধি, ব্যাধি, জরা মরণাদির সহিত সম্বন্ধ অনিবার্য্য বলিয়া, আর বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্ক হেতুও এই ভোগ অনিত্য বলিয়া,অর্থাৎ সমাগমনাদি ক্লেশভাগী বলিয়া—ইহা দুঃখ হেতু (গিরি)। ইহা রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত বলিয়া দুঃখের কারণ (মধু)। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"যাবন্তঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোক শঙ্কবঃ॥"

আদিঅন্তযুত—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগই ভোগের আদি, আর তাহার বিয়োগেই ইহার অন্ত। অর্থাৎ এইরূপ সুখ অনিত্য,মধ্যাক্ষণস্থায়ী ক্ষণিক (শঙ্কর, মধু)। গৌড়পাদ তাহার অদ্বৈতদর্শনে বলিয়াছেন, "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপিতত্তথা।" (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪ ও ১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

বুধগণ নহে তাহে রত—এই শ্লোকে যে তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। কেন না,এই তত্ত্বই সকল ধর্ম্মের ও নীতির মূল। মানুষে সাধারণতঃ সুখ লাভের জন্য, ও দুঃখ বা ক্লেশ দূর করিবার জন্য এসংসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বিষয় সুখ ভোগ প্রবৃত্তিই আমাদের কর্ম্মের মূলসূত্র। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,আমাদের সেই প্রবৃত্তি নষ্ট করিতে হইবে। কেন না বিষয় ভোগ আপাততঃ সুখের কারণ হইলেও উহা পরিণামে দুঃখকর ও উহা ক্ষণস্থায়ী। এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের এক শ্রেণীর নাম Optimist বা সংসারানুরাগী, আর এক শ্রেণীর নাম Pessimist বা সংসার বিরাগী। একশ্রেণীর মতে—এ জগত সুখময়; এখানে মানুষের সুখের উপকরণ যথেষ্ট আছে। জগতের উন্নতির সহিত এই সুখের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে, দুঃখের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। কাজেই মানুষকে নিজের ও সমগ্র মানব জাতির সুখ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই মূল

ধর্ম্ম। এই মতের উপর বিলাতী Hedohison ও Utilitarianism প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। আর যে দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণকে Pessimist বলে, ইহাদের মতে জগত দুঃখময়—সমস্ত মনুষ্যজীবনই দুঃখময়। মানুষের সুখলাভ চেষ্টা বৃথা, কেন না জগতে সুখের অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণ অনেক অধিক। আর জগত বা সমাজ যতই উন্নত হউক, দুঃখের পরিমাণ চিরকালই অধিক থাকিবে। মানুষ সুখ লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া কেবল দুঃখই ভোগ করিবে। সুখ কথার কথা—মরীচিকা মাত্র। অতএব সুখলাভ চেষ্টা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য—তাহাই ধর্ম্ম। এই শ্রেণীর পণ্ডিতদের মধ্যে জর্ম্মান দার্শনিক খ্যাতনামা সপেণহরই শ্রেষ্ঠ। (সপেনহরের মতে—"Human life oscillates between pain and ennui, which two states are indeed the ultimate elements of life".) তাঁহার কৃত World as Will and Idea নামক পুস্তকে এই তত্ত্ব বড় বিশদ করিয়া বুঝান আছে। এই জন্য বিলাতী ডেভিড প্রভৃতি লেখকগণ তাঁহার এই পুস্তককে ইউরোপীয় সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন। যাহা হউক, যে তত্ত্ব বুঝাইতে সপেনহরের ন্যায় পণ্ডিতকে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক লিখিতে হইয়াছে, তাহা এস্থানে অল্পকথায় বুঝান যায় না। পণ্ডিতবর সপেনহর দেখাইয়াছেন যে, এই মতই সকল ধর্ম্মের মূল। তিনি বলিয়াছেন হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম সকলই এই সত্যের উপর সংস্থাপিত। সপেনহরের পূর্ব্বেও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আমাদের দেশে প্রায় সকল দার্শনিক পণ্ডিতই এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। কেন না কেবল এই মতই আমাদের ধর্ম্ম সম্মত। ইহাই একমাত্র তত্ত্ব, ধর্ম্মের একমাত্র মূলভিত্তি। মানুষ যদি কেবল ইহকালের সুখলাভই পুরুষার্থ মনে করিয়া কর্ম্ম করিত, তবে ধর্ম্মের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিত না। আধুনিক ইউরোপ সাধারণতঃ এই ইহজীবনের সুখভোগকে সার করিয়াছে, তাই ইউরোপে ধর্ম্মের অবস্থা এখন শোচনীয়। পরকালে বিশ্বাস করিয়া সেই পরজীবনে সুখভোগ আশায় ধর্ম্ম বিষয় কর্ত্তব্য ভাবিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাও ঠিক ধর্ম্ম নহে। গীতায় বলা আছে, তাহা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মূল সূত্র।

আমাদের দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে এই তত্ত্ব বিস্তারিত বুঝান আছে। সাংখ্য দর্শনের প্রথম সূত্র এই 'অর্থ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।" সাংখ্যকার দেখাইয়াছেন যে, সুখ লাভের চেষ্টা দ্বারা এই দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। কেবল মোক্ষেই দুঃখনিবৃত্তি হয়। পাতঞ্জল দর্শনে এই তত্ত্ব অতি বিশদরূপে বুঝান আছে। টীকাকার মধুসূদন তদবলম্বনে এই শ্লোক যেরূপে বুঝাইয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে, ক্লেশ পাঁচ প্রকার যথা;—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ (২।৩)। ইহাদের মধ্যে অবিদ্যাই অন্য কয় প্রকার ক্লেশের কারণ। এই ক্লেশের আবার চারি প্রকার অবস্থা। যথা—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। অর্থাৎ বীজাবস্থা হইতে পূর্ণ অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত অবস্থা ধরিয়া ক্লেশকে চারি স্তরে বিভাগ করা যায়। এই ক্লেশের মধ্যে রাগ ও দ্বেষ কি, তাহা এস্থলে বুঝিতে হইবে। সুখকর বিষয় লাভের জন্য যে অনুরাগ বা প্রবৃত্তি তাহাই রাগ, ও দুঃখকর বিষয় পরিহার জন্য চেষ্টার মূল দ্বেষ। উভয়ই ক্লেশকর।

দুঃখ কাহাকে বলে? ন্যায় দর্শনে বলা হইয়াছে, বাধনা লক্ষণই দুঃখ। আমাদের প্রবৃত্তির পথে যাহা বাধ দেয় তাহাই দুঃখজনক। এই দুঃখের অভিব্যক্তি হইলে তাহাই ক্লেশ। আমাদিগের কর্ম্মাশয় এই ক্লেশ মূলক। কর্ম্মাশয়ই আমাদের সংস্কার বা এজন্ম ও পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্ম হইতে জাত ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ অদৃষ্ট শক্তি। এই কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মশক্তির বিপাক হেতু (অর্থাৎ ইংরাজী বিজ্ঞানের কথায় ইহার Potential অবস্থা হইতে kinetic অবস্থায় আসা হেতু) আমাদের জাতি আয়ু ও ভোগ উৎপন্ন হয়। (পাতঞ্জল সূত্র ২।১৩)। এই কর্ম্মশক্তি আমাদের মধ্যে কখন বীজ রূপে কখন ব্যক্তরূপে থাকে, ইহা অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত। মধুসূদন বলিয়াছেন, ইহা ঘটি যন্ত্রবৎ(ঘড়ির মত) সর্ব্বদা আবর্ত্তিত হয়। এই কর্ম্মশক্তি আমাদের ক্লেশের মূল। পাতঞ্জল দর্শন মতে ইহাকে ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ যোগ রূপ উপায়ে নষ্ট করিতে হয়। (পাতঞ্জলদর্শনের দ্বিতীয় পাদের ২ হইতে ১৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)। নির্ব্বীজ সমাধি দ্বার ক্লেশের মূল অবিদ্যা দূর হয়। এই অবিদ্যা সাংখ্য

মতে পাঁচ প্রকার যথা তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র। যাহা হউক, এ বিষয় এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে বুঝা গেল যে, পাতঞ্জলদর্শন মতে "রাগ" বা সুখ লাভের প্রবৃত্তিই মূলতঃ ক্লেশকর। পাতঞ্জলদর্শনে একথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। এই দর্শন মতে সুখ ও দুঃখকর। পাতঞ্জলদর্শনের দ্বিতীয় পাদের ১৫ শ্লোক এই:—

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ।"

অর্থাৎ পরিণাম দুঃখ, বর্ত্তমানে বা ভোগকালে তাপ দুঃখ, আর ভবিষ্যতে সংস্কার দুঃখ—এই জন্য, এবং তিন গুণবৃত্তির পরস্পর বিরোধ জন্য বিবেকীর নিকট সকলই দুঃখ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবল এই কয়টী কথাই জর্ম্মান পণ্ডিত সোপেনহর তাঁহার গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন। আমরা এস্থলে টীকাকার মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া সংক্ষেপে এই তত্ত্ব বুঝাইব।

মধুসূদন বলিয়াছেন দৃষ্ট ও আনুশ্রাবিক, বা এজন্মের ও পর জন্মের সকল প্রকার বিষয় সুখই প্রতিকূলবেদনীয়। এজন্য তাহা দুঃখ। ভোগ দুঃখের কারণ। কেন না ইহা—পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ দ্বারা অতীত বর্ত্তমান, ভবিষ্যত এই তিন কালেই ক্লেশের দ্বারা অনুবিদ্ধ। সুখের অনুভব মাত্রেই রাগ বা অনুরাগ-রঞ্জিত। প্রথমে রাগ বা অনুরাগ উৎপন্ন হয়, কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। সেই আকর্ষণ অনুসারে সেই বিষয় লাভের চেষ্টা হয়। সেই বিষয় প্রাপ্ত হইলে তবে সুখ হয়। কিন্তু এই অনুরাগের তৃপ্তি নাই। ইহা প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি হয়। আর যদি সেই অনুরাগের বিষয় না পাওয়া যায়, তবে ত দুঃখ অনিবার্য্য। ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উপশান্তি না হইলে সুখ হয় না। কিন্তু ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উপশান্তি ও বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না। এইজন্য উক্ত হইয়াছে:—

"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

এই জন্য সুখের উপভোগ ও পরিণাম দুঃখ। আবার সুখ অনুভব কালে তাহার প্রতিকূল দুঃখসাধক বিষয়ের প্রতি দ্বেষ জন্মে। এই দ্বেষও দুঃখকর। তাহার পর যখন বর্ত্তমান সুখানুভব চলিয়া যায়, তখন তাহার সংস্কার মাত্র থাকে। সুখের স্মৃতি থাকে। তাহাতে অনুরাগও থাকিয়া যায়। ইহার দ্বারাই পরে আমাদের কায়মনোবাক্য দ্বারা কর্ম্ম চেষ্টা নিয়মিত হয়। তাহাই পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মের মূল, এবং তাহাই জন্মাদির কারণ 'সংস্কারের' মূল। সুতরাং ভোগকে সংস্কার দুঃখ বলা যায়।

তাহার পর গুণবৃত্তি বিরোধের কথা। সুখাত্মক সত্ত্বগুণ, দুঃখাত্মক রজঃগুণ আর মোহাত্মক তমোগুণ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। অথচ ইহারা একত্র সম্বদ্ধ। লৌহে যেমন চুম্বক শক্তির বিকাশ হইলে তাহার উভয় প্রান্তে পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব দুইরূপ শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়, অথচ ইহার একটী যেমন অন্যটীর অভাবে থাকিতে পারে না—ত্রিগুণেরও অবস্থা কতকটা সেইরূপ। তবে কিছু প্রভেদও আছে। ইহাদের মধ্যে এক গুণের আধিক্যে অন্যগুণের সংকোচ হয়। অর্থাৎ এক গুণ বা শক্তি বিকাশ অবস্থায় আসিলে অন্য দুই শক্তি বীজাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহারা কখন ধ্বংস হয় না। যাহার বিকাশ অবস্থা, তাহা বিলীন হইলে, অন্য গুণ তখন বীজাবস্থা হইতে বিকাশিত হয়। সুতরাং এই তিন গুণ একত্র সম্বদ্ধ হইলেও একটি গুণ কেবল কার্য্যকারী হয় বা বিকাশাবস্থায় থাকে। সুখ উপভোগ রূপ প্রত্যয় বা মনের অবস্থা সত্ত্ব শক্তি বিকাশ কালে উদ্ভূত হয়। সেই সঙ্গে রজঃ ও তম শক্তি অনুদ্ভূত বা বীজাবস্থায় থাকে, তাহা নষ্ট হয় না। রজ ও তম দুঃখ মোহাত্মক। অতএব সুখ উপভোগ কালেও দুঃখ ও মোহ অন্তরে বীজাবস্থায় থাকিয়া যায়, সময় পাইলে তাহার বিকাশ হয় মাত্র। এই জন্য সুখ দুঃখাত্মক।

তাহার পর এইরূপ সুখ প্রবাহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। কেন না গুণবৃত্তি চঞ্চল ও ক্ষিপ্র পরিণামী। সুখ প্রত্যয় উদ্ভূত অবস্থায় বা ব্যক্তাবস্থায়—দুঃখ প্রত্যয় অব্যক্ত থাকিলেও তাহা আবার ব্যক্ত হইতে চেষ্টা করে। অতএব সুখ ও দুঃখ পরস্পর সম্বদ্ধ। যেন একটি নিত্য আবর্ত্তিত গোলকের একদিকে সুখ আর একদিকে দুঃখ আছে। কখন সুখাংশ উপরে আসে, কখন দুঃখাংশ প্রকাশিত হয়।

শরীর ত্যাগের আগে পারে হেথা যেই
কাম ক্রোধ-জাত বেগ করিতে সংযত—
সেই হয় যোগযুক্ত, সেই সুখী নর। ২৩

যাহা হউক, এস্থলে যাহা উল্লিখিত হইল তাহা হইতে এই কথা বুঝা যাইবে যে, সংস্পর্শজ ভোগ দুঃখময় ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাহা প্রথমেই ত্যাগ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। কেন না ইহাই ধর্ম্মের মূলসূত্র, ধর্ম্মের আর অন্য সাধনার প্রথমে তত প্রয়োজন নাই। এই ত্যাগশিক্ষা হইতে আত্মত্যাগ শিক্ষা হইবে, কেন না ইহা হইতে অন্যের প্রতি প্রীতি দয়া প্রভৃতি সদ্ভাবের বিকাশ হইবে, নিষ্কাম কর্ম্ম করা সহজ হইবে ও পরিণামে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইবে।

শরীর ত্যাগের আগে— অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন (শঙ্কর)।

(২৩) হেথা—এ জীবনে (শঙ্কর)। সাধন দশায় (রামানুজ)।

কাম ক্রোধ জাত বেগ—(তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৭ হইতে ৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্রিয়গোচর ইষ্ট বিষয়ে ও শ্রুত স্মৃত বা অনুভূত সুখকর বিষয়ে যে তৃষ্ণা তাহা কাম, আর নিজ প্রতিকূল দুঃখ হেতু, দৃষ্ট শ্রুত ও স্মৃত বস্তুতে যে দ্বেষ তাহা ক্রোধ; এই কাম উদয় হইলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়, চক্ষু বিস্ফারিত হয়, মুখ ও শরীরে এবং অন্তঃকরণে এক প্রকার ক্ষোভ বা চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, ইহাই কামজাত বেগ; আর গাত্র কম্পন, স্বেদ নির্গমন, অধরোষ্ঠের কম্পন, নেত্রের রক্তবর্ণ ধারণ—ইত্যাদি ক্রোধের বেগ (শঙ্কর)। বর্ষাকালে নদীর বেগের ন্যায় এই বেগ (মধু)। কাম ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিকে, আমাদের অধঃস্রোত বৃত্তি বলে। এই অধঃস্রোত বৃত্তি দমন করিতে শিক্ষা করিলে ঊর্দ্ধস্রোত বৃত্তি লাভ করা যায়, তবে নিবৃত্তি পথে যাওয়া যায়।

সংযত—বশীকার সংজ্ঞাযুক্ত বৈরাগ্যের দ্বারা সংযত (মধু)। "দৃষ্টঅনুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" (পাতঞ্জলদর্শন ১।১৫)।

যোগযুক্ত—(মূলে আছে 'যুক্ত')। সমাহিত (স্বামী), যোগী (শঙ্কর, মধু)। আত্মানুভব করিবার উপযুক্ত (রামানুজ)।

যে জন অন্তরে সুখী, অন্তরে আরাম,
অন্তরেই জ্যোতি যার—হয় যোগী সেই
ব্রহ্মরূপ—পায় সেই ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ। ২৪
ক্ষীণপাপ জিতচিত্ত, দূরিত সংশয়,
সর্ব্বভূত হিতে রত, হেন ঋষি যারা—
তাহারাই করে লাভ ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ। ২৫

সুখী—আত্মানুভব আনন্দ যুক্ত (রামানুজ, বলদেব), ইহলোকে সুখী (শঙ্কর)।

নর—অর্থাৎ সেই প্রকৃত মানুষ, নতুবা যাহারা প্রবৃত্তির বশীভূত পশু ধর্ম্মযুক্ত তাহারা নরাকারে পশু (মধু)।

(২৪) অন্তরে—(মূলে আছে 'অন্তঃ') আত্মাতে (শঙ্কর, স্বামী, মধু, রামানুজ)।

আরাম—ক্রীড়া (শঙ্কর, মধু)।

অন্তরেই জ্যোতি যার—জ্যোতি অর্থাৎ বিজ্ঞান বা প্রকাশ (শঙ্কর, মধু)। দৃষ্টি (বলদেব)।

ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ—মোক্ষ, জীবন্মুক্তি (শঙ্কর)। অবিদ্যাবরণ নিবৃত্তি হেতু—কল্পিত দ্বৈতজ্ঞান নষ্ট হওয়ায় পরমানন্দ রূপ নির্ব্বাণ (মধু) আত্মানুভব সুখ (রামানুজ)।

(২৫) ক্ষীণ পাপ—ক্ষীণকলুষ, (শঙ্কর, মধু) আত্মপ্রাপ্তি বিরোধী কলুষহীন (রামানুজ)। যাহার পাপরূপ সংস্কার সকল 'তনু' বা সূক্ষ্ম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ক্ষীণপাপ। পাতঞ্জলদর্শনে আছে, "তে প্রতিপ্রসব হেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।" অর্থাৎ ক্লেশ সকল সূক্ষ্ম হইলে, প্রতিলোম পরিণামের দ্বারা তাহাদিগকে দূর করিতে হয়। তপস্যাদির দ্বারা সংস্কারের মূলোৎপাটিত না হইলেও, তাহার স্থূল পরিণাম নষ্ট হইয়া গিয়া সূক্ষ্ম বা নির্ব্বীজ দশা প্রাপ্ত হয়—তাহার কার্য্যশক্তি থাকে না।

ক্ষীণ পাপ...সর্ব্বভূত হিতে রত—এস্থলে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাঁহারা সর্ব্বভূত হিতে রত ঋষি তাঁহারাও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন—অর্থাৎ তাঁহারা আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আপনাকে ব্রহ্মের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াও—লোক হিতত্রে কার্য্য করিয়া থাকেন। মধুসূদন বলিয়াছেন, এই শ্লোকের অর্থ এই যে, "প্রথম যজ্ঞাদির দ্বারা

কাম ক্রোধ হতে মুক্ত, সংযত অন্তর
আত্মবিদ্ যতি যারা, আছে তাহাদের
উভয় লোকেতে স্থির—ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ।২৬
বিষয় সংস্পর্শ করি দূর—রাখি স্থির
ভ্রূযুগ মাঝারে আঁখি, করিয়া সমান
নাশা মধ্যে সঞ্চারিত প্রাণাপাণ-বায়ু। ২৭

পাপ ক্ষীণ করিতে হয়, তাহার পর অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিতে হয়, তাহার পর শ্রবণ, মনন সাধনার দ্বারা সংশয় বা দ্বিধা দূর করিয়া বিশ্বাসী হইতে হয়, তাহার পর নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাতে একাগ্রচিত্ত হইতে হয়। এইরূপ হইয়াও যতক্ষণ দ্বৈতদর্শন থাকে,ততক্ষণ সর্ব্বভূতহিতেরত বা হিংসাশূন্য থাকিতে হয়—তবে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ হয়।" শ্রুতিতে আছে, "যস্মিন্ সর্ব্বানি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ বিজানতঃ কোমোহস্তত্র কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।'

ঋষি—সম্যগদর্শী সন্ন্যাসী (শঙ্কর)। আত্মদ্রষ্টা (রামানুজ)।

খণ্ডিত সংশয়—মূলে আছে 'দ্বিধা হীন'। রামানুজ ইহার অর্থ করেন—দ্বন্দ্ব হীন।

(২৬) আছে স্থির—এরূপ লোকের ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ হস্তগত (রামানুজ)। তাহারা এ জীবনে জীবন্মুক্ত হয়, ও মৃত্যুর পর নির্ব্বাণ লাভ করে।

(২৭, ২৮)—শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভগবান প্রথমে সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সদ্য মুক্তির কথা বলিয়াছেন; আর ঈশ্বরে অর্পিত বুদ্ধিতে ব্রহ্মে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া কর্ম্মযোগ সাধনা দ্বারা প্রথম সত্ত্বশুদ্ধি হয়,পরে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়, ও শেষে সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস লাভ হইয়া পরিণামে মুক্তি হয়, ইহাও বলিয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত সম্যগ্ দর্শনের যে অন্তরঙ্গ সাধন—ভগবান পতঞ্জলি উক্ত যোগ, তাহারই বিষয় বলা হইতেছে (শঙ্কর)। প্রথম কর্ম্মযোগ উক্ত হইয়াছে; সম্প্রতি সকল যোগের সার যে ধ্যানযোগ তাহার বিষয় বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করা হইয়াছে (রামানুজ)।

দূর করি—অর্থাৎ বিষয়কে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারে রাখিয়া, বিষয়ের কথা চিন্তা না করিয়া, বিষয়কে বুদ্ধিতে গ্রহণ না করিয়া। মন যদি আত্ম-ধ্যানে মগ্ন থাকে, তবে তখন তাহার বিষয় গ্রহণ

ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি সংযত যাহার,
ইচ্ছা ভয় ক্রোধহীন, মোক্ষপরায়ণ
মুনি যেই—সদা মুক্ত হয় হেন জন। ২৮

সম্ভব হয় না। একচিত্তে কোন বিষয় ভাবনা কালে আমরা চক্ষের উপরে যে বস্তু থাকে, তাহাও দেখিতে পাই না, তীব্র শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেও তাহা শুনিতে পাই না। সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এই কথা। যোগের মূল সূত্রই চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

বেদান্ত মতে আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় পথে বাহিরে গিয়া বিষয়ের আকার ধারণ করে যোগে এই গতি-রুদ্ধ করিতে হয়। মধুসূদন বলেন, যোগ সিদ্ধির দুই উপায়—অভ্যাস ও বৈরাগ্য। প্রথমে যাহা বলা হইল, তাহা বৈরাগ্যের কথা। পরে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করিবার কথা যেউক্ত হইয়াছে, উহাই অভ্যাসের কথা।

ভ্রূযুগ মাঝারে যোগ শাস্ত্রমতে দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থির করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়। স্বামী বলিল, চক্ষু একেবারে মুদ্রিত করিলে নিদ্রা আইসে, আর উন্মিলিত রাখিলে বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়া, তাহাতে চিত্ত আকর্ষিত হয়, চিত্তবিক্ষেপ হয়। এই জন্য ধ্যানকালে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিতে হয়। কেহ বলেন, এস্থলে আঁখি অর্থে দৃষ্টি শক্তিমাত্র। তন্মতে ভ্রূমধ্যে দ্বিদল পদ্ম ও তদুপরিস্থিত তরপাকৃতিকে ভাবনা করিতে হয়। যোগশাস্ত্রে আছে—

ভ্রুবো মধ্যে বর্ত্তুলঞ্চ ধ্যাত্বা জ্যোতিঃ প্রমুচ্যতে।

করিয়া সমান—(৪ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) উচ্ছাস নিশ্বাসরূপ ঊর্দ্ধ ও অধঃশক্তি যুক্ত নাসিকা মধ্যে বিবরণকারী প্রাণাপান বায়ুকে কুম্ভক দ্বারা গতিরোধ করিয়া সমান করিতে হয়। (স্বামী)। এই নিশ্বাস প্রশ্বাস আমাদের একপ্রকার অন্তরায়। নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবল হইলে যে, তাহা আমাদের একমনে ভাবনার অন্তরায় হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। প্রাণায়মের এক অভিপ্রায় এই যে, যেন এই নিশ্বাস প্রশ্বাস এরূপ চিত্তবিক্ষেপের কারণ না হয়। এই জন্য স্বামী আরও বলিয়াছেন যে, যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস বেগ যুক্ত না হয়, অর্থাৎ যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়িতেছে এরূপ বুঝা না যায়, এরূপ ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে হয় যেন তাহা নাসিকার ভিতরেই বিচরণ করে। ইহারই নাম নিশ্বাস প্রশ্বাস সমান করা।

ভোক্তা আমি সমুদায় যজ্ঞ তপস্যার,
সর্ব্বলোক মহেশ্বর, সবার সুহৃদ্—
জানিয়া আমাকে শান্তি লভে সেই জন। ২৯

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

একাগ্রতা লাভের জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করা বা অতি মৃদু করা যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিবার অন্য প্রয়োজনও আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

মনের একাগ্রতা হইলে যে শ্বাস মৃদু হয়, তাহা আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। তাহা এস্থলে বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। (Sully's Outlines of Psychology, p 83 দ্রষ্টব্য)

সংযত—উক্তরূপ উপায় সংযম শিক্ষা হয় (মধু)

মোক্ষপরায়ণ—মোক্ষই পরম গতি যাহার (শঙ্কর) গতি—অর্থাৎ শেষ লক্ষ্য বা প্রাপ্য স্থান (স্বামী)। মোক্ষই একমাত্র প্রয়োজন যাহার (রামানুজ)।

সদা মুক্ত—মোক্ষের জন্য তাহার অন্য কর্ত্তব্য নাই (শঙ্কর)। জীবন্মুক্ত (স্বামী, মধু)। সাধ্য দশার ন্যায় সাধন দশায় ও মুক্ত (রামানুজ)।

(২৯) ভোক্তা—ভোগকর্ত্তা, পালক (স্বামী মধু)।

আমি—অর্থাৎ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষ সর্ব্ব প্রত্যয় সাক্ষী আমি নারায়ণ। (শঙ্কর, স্বামী মধু রামানুজ)। এই স্থলে বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বর প্রণিধান যোগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মধুসূদন বলেন, (২৭—২৯) এই তিন শ্লোকে ধ্যান যোগের সূত্র মাত্র বলা হইয়াছে, এই যোগ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। এই তিন শ্লোক মধ্যে প্রথম দুই শ্লোকে যোগ কাহাকে বলে বুঝান হইয়াছে, তৃতীয় শ্লোকে যোগ ফল পরমাত্মজ্ঞান যে বিবেক, তাহাই উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে আপাততঃ বোধ হয় যে যিনি সদামুক্ত ও শান্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি সগুণ পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই ধ্যান দ্বারা যে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ হয়, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। এজন্য রামানুজ এই শেষ শ্লোকের সহিত উপরের দুই শ্লোকের সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, কর্ম্মযোগের যাহা সার বা মস্তিষ্ক তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। রামানুজের মতে শেষ শ্লোকের অর্থ এই যে নারায়ণকে জানিয়া, তাঁহার আরাধনারূপ কর্ম্মযোগে সুখে প্রবৃত্ত হইলে শান্তিলাভ হয়।

শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন বলেন, এস্থলে নারায়ণ অর্থে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম—সগুণ ঈশ্বর নহে। কিন্তু ঐ অর্থ করিলেও এস্থলে উল্লিখিত জ্ঞান যে অদ্বৈত জ্ঞান, তাহা ঠিক বলা যায় না।

রামকৃষ্ণাবতার ও ব্রাহ্মসমাজ।

বীর পূজা মনুষ্যের স্বভাব। শুধু মনুষ্যের স্বভাব কেন? জীব জগতের সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠের সম্মান ও ক্ষমবানের পূজা দেখিতে পাওয়া যায়, সিংহ পশুরাজ, মৌমাছির রাণী আছে, বানর পালেরও গোদা আছে। এ স্বভাব কিছুতেই দোষের নহে, বরং ইহার অভাবে অনেক স্থলে অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, এবং যে জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বীরপূজার ভাব একেবারেই নাই বা খুব কম, নিশ্চয় জানিতে হইবে, তাহারা সেই পরিমাণে নৈতিক জীবনে অবনত। তাহার জলন্ত প্রমাণ আমাদের দেশ, যেখানে লোকের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা অতি বিরল। দশ জনের সমক্ষে প্রাণ ভরিয়া কাহারও প্রতিষ্ঠা করা আমাদের দেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি কোন ব্যক্তি সাহসে বুক বাঁধিয়া কোন মজলিসে কাহারও ষোল-আনা প্রশংসা করিতে দণ্ডায়মান হন, আর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বাস্তবিকই যদি সম্পূর্ণরূপে তাহার যোগ্য হন, তত্রাচ তাঁহার প্রশংসা শুনিলে অন্ততঃ দুই চারি

জন সেই প্রশংসাকে যথাসাধ্য খাটো করিবার জন্য তাহাতে বেশ গোছাল ভাবে "কিন্তু" লাগাইয়া তাঁহার দুই একটী সামান্য ক্রটীকে অতিরঞ্জিত করতঃ প্রতিষ্ঠাতাকে লজ্জা দিতে সমূহ চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ছিদ্রান্বসন্ধান রূপ অতি নীচ-বৃত্তি আমাদের মধ্যে এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, কাহারও ষোলআনা প্রশংসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির যদি দুই একটী সামান্য দোষও থাকে, তাহা উপেক্ষা করাই ধর্ম্ম, কিন্তু সে ধর্ম্ম হইতে আমরা বহু দিন বঞ্চিত হইয়াছি। ক্ষীরগ্রাহী মরালের ন্যায় দোষ ভাগের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল-অবশ্য-অনুকরণীয় গুণভাগের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করাই উচ্চ বৃত্তি। কেবল স্বজাতি মনুষ্য সম্বন্ধে আমাদের এই কোপ নহে, ক্রমে ঐ কুস্বভাব এতদূর ঘৃণিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে, কাহারও কোন ভাল জিনিস দেখিলেও তাহার প্রশংসা করা দূরে থাকুক, কোন প্রকারে তাহার একটু খুঁত বাহির না করিতে পারিলে যেন বড়ই ব্যথা পাই। এ বিষয়ে ইউরোপ বিশেষ ইংলণ্ড অতি উচ্চ, যাহা কিছু তুমি কাহাকেও দেখাইবে, হাতের লেখাই হউক, রচনাই হউক, শিল্প কার্য্যই হউক বা কোন জিনিসই হউক, তিনি অম্লান বদনে মুক্তকণ্ঠে "অতি উত্তম" "অতি উত্তম" দশ বার না বলিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। এমন কি, পরম শত্রুরও প্রশংসা শুনিলে অনায়াসে তাহাতে যোগ দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত নন। আত্মীয় বোধে তোমার নিকট উৎসাহ পাইব আশা করিয়া, যেটা আমি আনন্দের সহিত তোমাকে দেখাইতেছি, সেটার উল্টা নিন্দা করা বা দোষ দেখান নিতান্তই হীন অর্ব্বাচীনের কাজ, সন্দেহ নাই।

এই খানে একটী ঘটনা মনে পড়িল, সেটী না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বিশেষ উদাহরণ দ্বারা আমার কথাটা পরিস্ফুট হইবে, সুতরাং বলা প্রয়োজন। খুব ভালবাসিয়া কোন বন্ধু আমাদিগকে দুইটী অতি সুন্দর কুকুর উপহার দেন। বিশেষ প্রণয় স্থল ব্যতীত ওরূপ জিনিস কেহ কাহাকে দিতে পারে না, এমনই সুন্দর দুটী কুকুর। উহারা আমাদের ঘরে আসার পর দিন দৈববশতঃ তিন জন ইংরেজ-মহিলা ও এক জন ইংরেজ পুরুষ ক্রমান্বয়ে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। প্রত্যেকেই কুকুর দুটীকে দেখিয়া "অতি সুন্দর" "অতি সুন্দর" "এরূপ সুন্দর কুকুর কম দেখা যায়" ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশংসা করিয়া গেলেন। তাহার পর দিন মেমের পোষাক-পরা মাতৃ ভাষা-বিস্মৃতা ভালরূপ ইংরাজী ভাষা-শিক্ষিতা এক জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি-খ্রীষ্টান রমণী আসিলেন। যেমন সাহেব মেমদিগকে দেখাইয়া উৎসাহ পাইয়াছেন, সেই ভাবে আনন্দের সহিত গৃহিণী ইহাকেও কুকুর দুটী দেখাইতে গেলেন। তিনি কোনই কথা কহিলেন না, দেখিয়া গিন্নি কিছু ক্ষুব্ধা হইয়া বলিলেন, "কল্য অমুক অমুক সাহেব মেম আসিয়া ইহাদিগকে দেখিয়া খুব প্রশংসা করিয়া গেলেন, আপনি কৈ কিছু বলিলেন না?" তদুত্তরে কি শুনিলেন, পাঠকগণ শুনুন—"আমারও খুব ভাল ভাল ইহাদের অপেক্ষা সুন্দর কুকুর ছিল। কুকুর পোষা বড় ঝঞ্ঝাট বলিয়া আমি আর কুকুর রাখি না।" শুনিলেন কুকুরের কথা, তার পরের কথোপকথন শুনুন :—

আগন্তুক—আপনার ছেলে কেমন পড়া শুনা করিতেছে?

গৃহিণী—এবারকার পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়াছে।

আ—ক্লাশে বুঝি চারি পাঁচ জন ছেলে?

গৃ—না চল্লিশ পঞ্চাশ জন।

তাহাতে বিশ্বাস হইল না, বালককে ডাকাইয়া ক্লাশে কত ছেলে জিজ্ঞাসা করিয়া তখন একটু দুঃখিত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই গল্প আমাকে শুনাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "শুধু মেমের পোষাক পরিলেই হয় না, মেমের মত আক্কেল হইতে বাঙ্গালীর মেয়েদের অনেক দেরি।" তাই আমিও বলি, হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা আমাদের এরূপ ভাবে মজ্জাগত হইয়াছে যে, সহজে উহাদের হাত এড়ান কঠিন। এমন কি, বিলাতে বাল্যাবধি শিক্ষিত আজ কাল মহা-নামজাদা হোম্‌রা চোম্‌রা "ভারতোদ্ধার-কারী" "স্বজাতি-বৎসল" দুই এক ভায়াকে এ বিষয়ে ঐ খ্রীষ্টান রমণী অপেক্ষা বহু নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এই ত গেল এক দিকের ভাব, এখন অপর দিকে দেখা যাউক। সব দিকেই বিজাতীয় বিট্‌কেল দৃশ্য।

যেমন বীর-পূজা বাস্তবিকই একটী সদ্গুণ, এবং শিক্ষিত জীবের পক্ষে একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, তেমনি পূজার্হ বীরকে ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া ঈশ্বরোচিত অর্চ্চনা প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য ও অশিক্ষিতের কার্য্য। এস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, খ্রীষ্টীয় জগতের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে ত এই দোষে দোষী, তবে কি তাঁহারাও অশিক্ষিত? ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষা না করিয়া এরূপ প্রশ্নের এই উত্তর দিতে বাধ্য যে, তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে সমধিক পাণ্ডিত্য সত্বেও পুরুষপরম্পরাগত মত-বিশ্বাসে অন্ধ বিশ্বাসী হইয়া ঐ অংশটুকুতে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহা পণ্ডিত বা জ্ঞানী বলিয়া তিনি যে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ জীব, ইহা ত কথা নয়। অনেক পণ্ডিত অনেক বিষয়ে বিশেষ খাটো, তাহার বিস্তর উদাহরণ আছে; এ স্থলে একটী মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। ক্রমবিকাশের অবতার স্বরূপ জগদ্বিখ্যাত মহামতি দার্ব্বিণ অনেক বিষয়ে উজ্জ্বল প্রতিভাশালী হইয়াও গীত বাদ্য সম্বন্ধে একেবারে অর্ব্বাচীন ছিলেন। সঙ্গীতরসে তিনি এতদূর বঞ্চিত ছিলেন যে, কখন ঐ পবিত্র রসের কণামাত্রও আস্বাদন করিতে সক্ষম হন নাই; বরং যেখানে গীত বাদ্যের আলোচনা হইত, সেখানে থাকিতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেন। এইরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধেও অনেক প্রতিভাশালী জীবগণের মস্তিষ্ক কিছু মাত্র বিকশিত হয় নাই। যিনি যে বিষয়ে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন, সেই বিষয়েই তাঁহার কথা গ্রাহ্য, এবং তাঁহার উপদেশ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে, যে দিকে তাঁহার মতি বুদ্ধির বিকাশ হয় নাই, তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিলে তাঁহাকে কিছু মাত্র অবমাননা করা হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে বীর-পূজা ঈশ্বর পূজায় পরিণত হইয়াছে, তাহা যে ঐ ভাবে অধিক কাল চলিতে পারে, এমন বিশ্বাস কখনই করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও উচিত নহে। যে কয় দিন চলিতেছে, সেই কয়দিনে

যে ক্ষতির সম্ভাবনা, তাহার পথ অবরোধ করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। এবং কেবল মাত্র সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম। যদি ইহার দ্বারা কাহারও মনে কোনরূপ দুঃখ উৎপাদন করি, তিনি "লোকটা বুঝিতে পারে নাই" বলিয়া অনায়াসে ক্ষমা করিতে পারেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে প্রতিভাত এই উজ্জ্বল সময়ে যদি কেহ সরল যুক্তি দ্বারা এসম্বন্ধে সংসারকে বুঝাইতে পারেন, তাহা হইলে কেবল বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র পৃথিবী আজ তাঁহার পদানত হইবে, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণরূপী ভগবানকে অনন্ত দেশ ও অসীম কালের স্রষ্টা, পাতা, পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করিবে।

আবহমান কাল ভারতের প্রধান মাহাত্ম্য এই যে, এখানে মধ্যে মধ্যে বীর-পূজার ধূম এতদূর গড়ায় যে,অতি সহজেই দেশীয় মহাজীবগণ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এই ঘোর কলিকালেও অবতারবাদের ঢেউ ভারতে কমে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চিরকাল উপন্যাস নবন্যাস লিখিয়া কল্পনার রাজ্যে দিন কাটাইলেন। শেষটা তাঁহার সহপাঠী মহাত্মা কেশবচন্দ্রকে ধর্ম্মরাজ্যে উন্নত পদ লাভ করিতে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, ধর্ম্ম চর্চ্চায় মনোনিবেশ করতঃ কতকগুলি বালোচিত অসার যুক্তি দ্বারা নন্দঘোষের পালক পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বেশ্বরত্ব সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া গেলেন। যখন জ্যোতির্ব্বিদ্যার সমধিক উন্নতি হয় নাই, বিশ্বজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষ যখন নিতান্ত খাটো ছিল, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যখন মানুষের নিকট বিশ্বের কেন্দ্র-স্বরূপ সর্ব্বস্ব ছিল, তখনই অবতারবাদের সৃষ্টি। হট্‌কথাতে ভগবানকে তাঁহার অমূল্যনিধি পৃথিবীর রক্ষার্থ এখানে না নামিয়া আসিলে সংসার চলিত না। তারপর যখন জানা গেল যে,আমাদের এই পৃথিবী একটা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর জিনিস, বিশ্বেশ্বরের বিশাল-রাজ্য ইহা অপেক্ষা কোটী কোটীগুণ বড় অসংখ্য অগণ্য পৃথিবীপূর্ণ, তখন মানুষের অবতারবাদ সম্বন্ধে মোহনিদ্রা অনেকটা ভাঙ্গিল। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এবিষয়ে একটু একটু বুঝিতে পারিয়া অবতারবাদ সম্বন্ধে "অবতারাহ্ সংখ্যেয়া" বলিয়া কথাটা বেশ লঘু করিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া অবতারবাদীরাও পূর্ণাবতার ও অংশাবতার দুই শ্রেণী স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। শেষে এই দাঁড়াইল যে, যে সম্প্রদায়ের যিনি অবতার, অন্য সম্প্রদায়ের লোকের নিকট তিনি অংশাবতার হইলেও নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পূর্ণাবতারের এক কড়াও কম নন। এই প্রকারে দেশে অনেকগুলি পূর্ণ,অনেকগুলি অংশাবতার সৃষ্ট হইলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী যায় যায় হইয়াছে, তবু আমরা অবতারবাদের ঝোক ছাড়িতে পারিতেছি না। অশিক্ষিত লোকদের নিকট ত অবতার চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে, কিন্তু শিক্ষাভিমানী মহোদয়গণ যে এখনও বিশ্বরাজকে লইয়া ছ কড়া ন কড়া করিতে চান, ইহাই আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয়। কয়েক বৎসর হইতে স্বর্গীয় মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসকে লইয়া যেরূপ মাতা মাতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া হর্ষ বিষাদ উভয়ই হইবার কথা। হর্ষ এইজন্য যে, এই ঘোর নাস্তিকতার সময়, মাগমাছের-ঝোল ও কোম্পানির-কাগজের রাজ্যে

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বিলাসী বাবুগণ টাকা-কড়ি-ধন-দৌলত-স্ত্রীর অলঙ্কার রূপ ইষ্ট মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া,উজান ঠেলিয়া,যে ভাবেই হউক,ফকির ধর্ম্মবীরের মর্য্যাদা করিতেছেন, ইহা যারপর নাই সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই। বিষাদ এইজন্য যে, শ্রদ্ধাভাজন পরমহংস মহাশয় জীবিতাবস্থায় যাহাতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হইতেন, তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে তাহাই করিয়া সং সাজাইতেছেন। সশরীরে জনৈক শিষ্য একদিন তাঁহাকে বলে "প্রভু, আপনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম"। তদুত্তরে তিনি বলেন "হাঁ তা ত বটেই। পূর্ণব্রহ্ম না হইলে ঘায়ে পচিয়া মরিব কেন"? তখন একটা ফোড়ায় তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন।

এখন পরমহংস ত ঈশ্বর হইয়াছেন, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা এই যে, আমাদের সাক্ষাতে যখন দুই ব্যক্তি ঈশ্বরের গদি পাইবার যোগ্য হইয়া প্রকট হইলেন, তখন পাছে কালে কোন প্রকার ভাগা ভাগি জন্মে, এই জন্য চেষ্টা যে জগদ্বিখ্যাত যিনি, তাঁহাকে খাটো করিয়া পরমহংসের তাবেদার করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহাকে ঈশ্বরের সিংহাসনে নির্ব্বিরোধে বসান যায় না। অতএব কেশবচন্দ্রকে এই-বেলা পরমহংসের শিষ্য এবং ব্রাহ্মসমাজটা পরমহংসের উপদেশের ছায়াতে গঠিত, এই সকল স্থির না করিলে আর চলে না। ইহা-রই চেষ্টায় রামকৃষ্ণভক্তগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই চেষ্টা এই সময়ে করাতে বিশেষ শুভ ফলের সম্ভাবনা; এবং তাহা জানিয়াই বিধাতা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সময়ে এই মতি দিয়াছেন। কারণ এখনও দুইজনের সমকালিক বহু সংখ্যক লোক জীবিত আছে,মীমাংসা হইতে বড় দেরি হইবে না; নতুবা আর পঞ্চাশ বৎসর পরে একথা উঠিলে,কে হারে,কে জিতে,ঠিক হওয়া কঠিন ছিল। এই বেলা একটা লেখা পড়া হইয়া শাদার উপর কালির আঁচড় থাকিয়া-গেলে ভবিষ্যতে আর কোন প্রকার দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকিবে না। আমরা কি ভয়ানক লোক! এই সে দিন দুইজনে তনুত্যাগ করিলেন, ইহারই মধ্যে কথাবার্ত্তার ভিতরে খুটিনাটী ধরিয়া এককে উভয়ের তলপেটা করিতে যত্নবান হইয়াছি!

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যাঁহাদের জীবনে প্রতিভাত, তাঁহারা যখন আমাদের সমক্ষে রহিয়াছেন, তখন গোলের কথা কি? আমরা কেশবের সঙ্গেও ফিরিয়াছি, পরম-হংসের সংসর্গও করিয়াছি, দুজনকেই বিল-ক্ষণ জানি, আমাদিগকে ধাঁধায় ফেলা সহজ নয়। কিন্তু যাঁহারা দু জনের কিছুই জানেন না, বা কেবলমাত্র এক জনের যৎসামান্য জানেন, তাঁহারাই নিজে গোল করিতেছেন, ও অপরকে গোলে ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। কোন রামকৃষ্ণ ভক্ত হঠাৎ তাঁহার সম্বন্ধে একখানি ইংরাজী পুঁথি আমার নিকট পাঠাইয়া মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে অনু-রোধ করিয়াছেন। মতলব এই যে, তাহা হইলে আমি তাঁহার সঙ্গে রামকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া স্বীকার করিতে আর দ্বিধা করিব না। পুস্তিকাখানি কোন "মিত্রের" দ্বারা প্রকাশিত। ইহাতে প্রতাপ বাবু,গিরীশ বাবু, চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও স্বয়ং কেশবের নানা-প্রকার লেখা পড়া ও কথাবার্ত্তা দ্বারা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে যে, নববিধান পরমহংসেরই সৃষ্টি; কেশব তাঁহারই নিকট উপদেশ পাইয়া এই অভিনব তত্ত্ব সংসারে প্রচার করিতে সক্ষম হন। আদালতের

মকদ্দমার মত, পরস্পরের কথার বা এক জনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথার খেলাপ ধরিয়া, আপীল ডিক্রী করাইবার বিলক্ষণ প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক কিছু কাল পরে এই সব তর্ক উঠিলে, মহা গোলের ব্যাপার দাঁড়াইবার কথা। দুই জনের জীবন অনেকের সমক্ষে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কাজেই ওরূপ ওকালতী ফন্দিতে কেহ পড়িবে না। এখন দেখা যাউক, মিত্র মহাশয়ের ওকালতী সওয়াল জবাব কতদূর ঐতিহাসিক সত্যের পরীক্ষায় দাঁড়ায়।

ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া নববিধানের সৃষ্টি; এবং সেই মাতৃভাব সম্বন্ধীয় জ্ঞান পরমহংসের নিকট হইতে প্রাপ্ত; এ বিষয়ে মিত্র মহাশয় অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। মোটামুটি দেখিতে গেলে, তাঁহার চক্‌চকে প্রমাণে চমক্ লাগে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি "মা যাদের আনন্দময়ী, তারা কিসে নিরানন্দ" গানটী যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রথম গীত হয়, তখন রামকৃষ্ণ কোথায়? এগান বোধ হয় ১৮৬৬ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রচিত হয়; আর কেশবের সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ ৺জয়গোপাল সেনের বাগানে ১৮৭৬ সালে। সেই সময় হইতেই বিশেষ যত্নে রামকৃষ্ণ দেশে সুপরিচিত হন। এই প্রকারে কোলাহলের মধ্যে আনিয়া ফেলার জন্য কেশব কতবার রাম কৃষ্ণের দ্বারা মিষ্টভাবে তিরস্কৃত হন। "নিরিবিলে বেশ ছিলাম। তুমিই ত টানিয়া বাহির করিয়া এ গোলমালের মধ্যে ফেলিসে ইত্যাদি।"

নব-বিধানের সার্ব্বভৌমিকতাও রামকৃষ্ণ হইতে গৃহীত, এরূপ যুক্তি তর্কও প্রদর্শিত হইয়াছে। আদিসমাজ হইতে বাহির হইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, যাহাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, চীন, শিখ প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রকাশ করতঃ উপদেশ ও সত্য সংগৃহীত হয়। তখন রামকৃষ্ণ কোথায়? সার্ব্বভৌমিকতা সম্বন্ধে এক কড়াও ব্রাহ্মসমাজ রামকৃষ্ণের নিকট ঋণী নন। তবে মাতৃভাব পরিস্ফুট হওয়া ও হিন্দু দেবদেবীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদি যাহা কেশবের শেষ কালের কাজ, তাহা অনেকটা রামকৃষ্ণের সহবাসের ফল, বোধ হয় এ কথা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই।

পুস্তকখানিতে যাহার যে কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সব ঠিক, কোনটাতেই কোন প্রকার গোল নাই, তবে মিত্র মহাশয় যে নিজের মতলব মত অর্থ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাই আপত্তিজনক। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জীবনে ব্যবহার ও বক্তৃতাদিতে তাঁহার গুণগান করিয়া সারগ্রাহী কেশব নিজের মহত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। বিনয় তাঁহার জীবনের একটা বিশেষ গুণ ছিল; লর্ড নর্থব্রুক পর্য্যন্ত একথা প্রকাশ্যভাবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বদা বিনয়াবনত কেশব রামকৃষ্ণকে সকল সময় সম্মান দিয়া গিয়াছেন, এ জন্য রামকৃষ্ণকে তাঁহার ঘাড়ের উপর বসাইতে চেষ্টা করা নিতান্ত পাগলামী।

যাহা হউক, অনেক দোষ ত্রুটি থাকিলেও রামকৃষ্ণ একজন ঈশ্বরের প্রিয় সাধু পুরুষ ছিলেন। আর দোষ ত্রুটি কাহার না আছে? মানুষ অসম্পূর্ণ জীব, তাহার সকলই দোষ। এই দোষের হাটের মধ্যে যিনি অতগুণে ভূষিত, তিনি নিশ্চয়ই মহাজীব।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

লুৎফ উন্নেসা।

সংসার-মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশিতে মানবজীবন অভিভূত হইয়া পড়িলে একমাত্র স্নেহময়ী রমণীর সজীব করুণাধারাই তাহাকে শীতল করিয়া তুলে। ফল্গুগঙ্গার ন্যায় সে ধারা এই ভীষণ মরুভূমির তলে তলে নীরবে প্রবাহিত হয়,কেহ তাহাকে সহজে দেখিতে পায় না। কিন্তু যখনই দুর্ভাগ্যের প্রবল ঝটিকা, দুঃখ ও নিরাশার অগ্নিময় ধূলিরাশি উড়াইয়া জীবনকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতে থাকে, তখনই সেই স্বর্গীয় ধারা শত মন্দাকিনীর ন্যায় ছুটিতে আরম্ভ করে, এবং অধঃপতিত মানব আত্মাকে কারুণ্য-সলিলে স্নিগ্ধ করিয়া শান্তির চির আবেশময় মোহন ক্রোড়ে ঘুম পাড়াইয়া রাখে। তাহার বিন্দুপাতে কত কত বিশুষ্ক জীবন সজীবতা লাভ করিয়াছে, কত শত ভগ্ন-হৃদয় তাপাগ্নির বিভীষিকাময়ী শিখা হইতে নিস্তার পাইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। যে স্থানে একবার সে ধারা বহিয়াছে, সেই স্থান কোমলতার পবিত্র বারিতে সিক্ত হইয়া গিয়াছে, এবং তথায় প্রীতির চির শ্যামল কুসুম-লতিকা অঙ্কুরিত হইয়া ত্রিদিব সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়াছে। যে স্থানে তাহার বিন্দু ক্ষরণ হয় নাই, সে স্থান চির মরুভূমি—চিরশ্মশান, শোক তাপ চিরদিনের জন্য তাহাকে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সংসারের ধূলিমাখা দগ্ধজীবনকে স্নিগ্ধ করিতে হইলে,এই মন্দাকিনী ধারার অবগাহন ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

বাস্তবিক নারীহৃদয়ের স্নেহরাশিই ক্ষত বিক্ষত মানবজীবনের একমাত্র মহৌষধ। যখন মনুষ্য দুর্ভাগ্যের ভীষণ আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তখন করুণাময়ী রমণীই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লয়, এবং দুর্ভেদ্য কবচের ন্যায় আচ্ছাদন করিয়া নিজ বক্ষে সমস্ত আঘাত সহ্য করে। যেখানে পুঞ্জীভূত বিপদ অভ্রভেদী পর্ব্বত হইতে শ্লথ পাষাণরাজির ন্যায় অবিরত বিচ্যুত হইতে আরম্ভ হয়, সেইখানে রমণী অগ্রসর হইয়া আপনার হৃদয় পাতিয়া দেয়, শিরীষ-কুসুম পেলব সে হৃদয় দলিত ও নিষ্পেষিত হইলেও তাহার বিন্দুমাত্র ক্লান্তির অনুভব হয় না। রমণীহৃদয়ের এইরূপ বিস্ময়করী দৃঢ়তা সংসারের অগ্নিপরীক্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে বুঝা যায় না। যাহারা চিরদিন সৌভাগ্যের মোহিনী দোলায় অঙ্গ ঢালিয়া সুখের স্বপনে দিন কাটাইয়াছে, তাহারা রমণী হৃদয়ের গভীরতা বুঝিতে পারিবে না; কিন্তু যাহারা চির বিপদকে সহচর করিয়া জগতীতলে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারাই ইহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। যে হৃদয় সৌভাগ্য সময়ে নবনীত-কোমল বলিয়া বোধ হয়, এবং অত্যল্প উত্তাপেই দ্রবীভূত হইবার সম্ভাবনা, দুর্ভাগ্যের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় না জানি কি শক্তিবলে তাহা পাষাণ অপেক্ষাও দৃঢ় হইয়া উঠে, এবং তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় অগণিত বিপদরাশির অসহনীয় আঘাত প্রত্যাহত করিয়া দূর দুরান্তরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। যতবার কেন সে পরীক্ষা হউক না, প্রত্যেক পরীক্ষায় তাহার দৃঢ়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। নারী হৃদয়ের এরূপ রহস্য যে বিস্ময়কর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, উভয়েরই উপকরণ লইয়া

নারী হৃদয় গঠিত। যাঁহারা তন্ন তন্ন রূপে নারীহৃদয় অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, নারীর অর্দ্ধেক হৃদয় সংসারের ক্ষণস্থায়ী মোহ ও চাঞ্চল্যে বিজড়িত, কিন্তু অপরার্দ্ধ ত্রিদিব-সুলভ অক্ষয় স্নেহ ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ। তাহার একধারে পৃথিবীর ছায়াময়ী ছেলে খেলা শারদাকাশের চিত্র বিচিত্র মেঘচুর্ণের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, অন্যধারে অপার্থিব আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতা উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ আলোকে বিশ্বকে চিরপ্রভাময় করিয়া রাখে। নারীহৃদয়রূপ কুসুমিত কাননের একদিকে মল্লিকা কামিনী প্রভৃতি ফুলরাশি ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়ে, অন্যদিকে চিরসুরভি পারিজাত অনন্তকাল ধরিয়া সমীর-প্রবাহের প্রত্যেক পরমাণু অধিবাসিত করিতে থাকে। এই দুই ভাবের সুন্দর সামঞ্জস্য টুকু বুঝিতে পারিলেই প্রকৃত রমণীহৃদয় বুঝা যায়! যুগপথ এই দুইভাবের বিকাশ কখন ঘটিয়া উঠে না। যে সময়ে মনুষ্য বিলাসলালসায় বিভোর হইয়া রমণীহৃদয় দেখিতে ইচ্ছা করে, সে সময়ে কেবল ইহার পার্থিব ভাবই দেখিতে পায়, কিন্তু ইহার স্বর্গীয় সৌরভের আঘ্রাণ করিতে হইলে দুঃখ ও নিরাশার মহাশূন্য পথে জীবনকে ছুটাইয়া দিতে হয়। তীরে বসিয়া কেবল সমুদ্রলহরীর লীলা-চাঞ্চল্য দেখিতে পাওয়া যায়,কিন্তু রত্ন সংগ্রহ করিতে হইলে, তাহার সুগভীর অন্তস্তলে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য। কষ্টস্বীকার ব্যতীত কে কবে রত্নরাজি-বিকীর্ণ-স্নিগ্ধ-জ্যোতির্ম্ময়ী সাগরগভীরতা বুঝিতে পারিয়াছে?

নারী হৃদয়ের এই স্বর্গীয় ভাবে জগতের সর্ব্বজাতির সাহিত্য অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে, কেবল সাহিত্যে উপন্যাস নহে, ইতিহাসও ইহাকে সমাদরে নিজবক্ষে স্থান দিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই স্বর্গীয় ভাবের একটী ছায়া মাত্র প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহা কল্পনা-প্রসূত নহে, প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব। বঙ্গবাসীর মধ্যে সিরাজ-উদ্দৌলার নাম কাহারও অবিদিত নাই, আমরা যাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করিতে উপস্থিত,তিনি সেই নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার প্রিয়তমা মহিষী লুৎফ উন্নেসা।* লুৎফ উন্নেসা মানবী হইয়াও দেবী, তাঁহার সেই পবিত্র দেবভাবে হতভাগ্য সিরাজ আপনার তাপ-দগ্ধ জীবনে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, লুৎফ উন্নেসা ছায়ার ন্যায় সিরাজের অনুবর্ত্তন করিতেন ; কি সম্পদে কি বিপদে, লুৎফ উন্নেসা কখনও সিরাজকে পরিত্যাগ করেন নাই। যখন সিরাজ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার যুবরাজ হইয়া আমোদতরঙ্গে গা ঢালিয়া দিতেন, তখনও লুৎফউন্নেসা তাঁহার সহচরী, আবার যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তেজোহীন-আভাহীন-কক্ষ-চ্যুত গ্রহের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখনও লুৎফউন্নেসা তাহারই অনুবর্ত্তিনী। যখন, ষড়যন্ত্রকারিগণের ভীষণ চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া, সিরাজ পলাশীর রণক্ষেত্রে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া সাধের মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন,তখন তাঁহার আকুল আহ্বানে ও মর্ম্মভেদী অনুনয়ে কেহই অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করে নাই, কেবল সেই দেবহৃদয়া লুৎফউন্নেসা আপনার জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া, শত বিপদ মাথায় লইয়াও সিরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। নিদাঘের

* লুৎফ—ভালবাসা, নেসা—স্ত্রী। লুৎফউন্নেসা—প্রিয়তমা স্ত্রী।

প্রখর রৌদ্রে, বর্ষার দারুণ বর্ষণ, পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালা কিছুতেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। যাঁহার আদরে আদরিণী হইয়া লুৎফউন্নেসা মহিষী পদবাচ্যা হইয়াছিলেন, তাঁহারই জন্য তিনি আপনার জীবনকে উৎসর্গীকৃত করেন; যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার পবিত্র দেহ পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত স্বামীর কল্যাণ সম্পাদন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে তিনি আপনাকে নিযুক্ত করেন নাই। স্বামীর দেহত্যাগের পরও তাঁহার জীবন তাঁহারই পরকালের কল্যাণোদ্দেশেই সমর্পিত হয়। মাতামহের স্নেহলালিত সুখস্বপ্নে বিভোর সিরাজ নিজ সৌভাগ্য সময়ে লুৎফউন্নেসার হৃদয়ের গভীরতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা, জানি না, কিন্তু শেষ জীবনে রাজ্যহারা, সিংহাসন-হারা হইয়া যখন ভিখারীর ন্যায় বিচরণ করিতে বাধ্য হন, তখন যে তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, লুৎফ উন্নেসার একটীও ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যায় না। আমরা তাঁহারা জীবনের দুই একটী ঘটনা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি, ইহা হইতে তাঁহার চরিত্রের কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। সিরাজের জীবনের সহিত যাঁহার জীবন চির-বিজড়িত, তাঁহার কথঞ্চিৎ বিবরণ সকলের জানা আবশ্যক, এই জন্য আমরা এরূপ প্রয়াস পাইতেছি।

লুৎফ উন্নেসা কোন উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতে ক্রীতদাসীরূপে * নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সংসারে প্রবিষ্ট হন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার অপূর্ব্ব রূপের ছটা বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তখন তিনি যুবরাজ সিরাজের হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। কেবল যে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি সিরাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল,এমন নহে, তাঁহার সুকোমল স্বভাবই সিরাজকে ভালবাসিতে শিখায়। যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গে ভাসমান, বিলাসের ক্রীড়াপুত্তল সিরাজের মনে কখনও প্রণয়ের ছায়া মাত্র পড়িবে, ইহাও অনেকের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই সিরাজ লুৎফ উন্নেসার প্রতি যথার্থ ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন। সিরাজকে সচরাচর ইতিহাসে যেরূপ চিত্রিত দেখিতে পাই, তাঁহার চরিত্র যে সেরূপ ভয়াবহ ছিল, তদ্বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যৌবনের প্রারম্ভে সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যশালী লোকের সন্তানগণ যেরূপ বিকৃত হয়, সিরাজেরও সেইরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছিল, কিন্তু জানা আবশ্যক যে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাঁহারা সিরাজকে আলিবর্দ্দির "আলালের ঘরের দুলাল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পান, তাঁহারা অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হন। আমরা স্থানান্তরে ইহার প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব। একটা কথা বলিয়া রাখি, বাঙ্গলা ইতিহাসে, সিরাজকে সিংহাসন আরোহণ সময়েও যে ঘোরতর

* মূল সায়র মুতাক্ষরীণে লুৎফ উন্নেসাকে সিরাজের "জারিয়া" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (মূল মুতাক্ষরীণ ১৮২পৃ) জারিয়া শব্দে ক্রীতদাসী বুঝায়; কিন্তু জারিয়াগণ নিতান্ত হীনভাবের দাসী নহে। তাহারা যে সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তাহার মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে পারেন। মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদক জারিয়াকে bond-maid বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, (Mutaqherin Eng. Trans. Vol. I. P. 614.)

মদ্যপায়ী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহার কোনও মূল নাই। সিরাজ যৌবনারম্ভে মদ্যপান আরম্ভ করেন সত্য, কিন্তু আলিবর্দ্দি মৃত্যুশয্যায় সিরাজকে কোরাণ স্পর্শ করিয়া ভবিষ্যতে মদ্যপান না করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন, এবং সিরাজ যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন মাতামহের সেই অমর অনুরোধ রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। * যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া এক্ষণে অধিক আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। সিরাজ আলিবর্দ্দির বিশেষ দৃষ্টিসত্ত্বেও যে যৌবন-লালসার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিলাসের তরঙ্গ যখন তাঁহাকে ভাসাইতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে তিনি লুৎফ উন্নেসার পবিত্র মূর্ত্তি নিজ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। লুৎফ উন্নেসাকে প্রণয়িনীরূপে স্বীকার করিয়া যখন তিনি তাঁহার অগাধ ভালবাসার আস্বাদ পাইতে লাগিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, রমণী বিলাসের সামগ্রী নহে, ভালবাসার সামগ্রী, তাই তাঁহার ভালবাসা স্রোতস্বিনী লুৎফ উন্নেসার দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বিলাসমুগ্ধ হইয়া সিরাজ লুৎফ উন্নেসাকে বুঝিতে পারিতেন না, কিন্তু শেষ জীবনে যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। লুৎফ উন্নেসার অগাধ স্নেহ ও পবিত্র স্বভাব অন্যান্য সকল বিষয় হইতে সিরাজের মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল। লুৎফ উন্নেসার ভালবাসায় তিনি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ক্ষণমাত্র ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। বিপদে সম্পদে, সকল সময়ে লুৎফউন্নেসাকে না পাইলে তাঁহার হৃদয় শান্ত হইত না। বাস্তবিক, রমণীর প্রকৃত ভালবাসা যদি কাহারও অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার হৃদয় যেরূপ হউক না কেন, তাহাও স্নেহপ্রবণ হইয়া উঠে।

লুৎফ উন্নেসার প্রতি সিরাজের অধিকতর ভালবাসার আর একটী কারণ ছিল। সিরাজ কোন একটী রমণীর সৌন্দর্য্যতরঙ্গে একবার আপনাকে ভাসাইয়াছিলেন। রূপে পাগল হইয়া যাহাকে তিনি হৃদয়ে স্থান দান করেন, সে কিন্তু ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় তাহাব হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেয়। এই রমণীর নাম ফৈজী বা ফয়জান, * সিরাজের প্রিয় ও বিশ্বাসী সেনাপতি মোহনলালের ভগিনী। ফৈজী দিল্লীতি নর্ত্তকীর ব্যবসায়ে জীবনাতিবাহিত

* "I have before mentioned Surajah Dowla, as giving to hard-drinking; but Allyverde, in his last illness, foreseeing the ill consequences of his excess, obliged him to swear on the Koran, never more to touch any intoxicating liquor; which he ever after strictly observed." (An enquiry into our National conduct to other countries. Chap. II. P. 32. ১ ইহা একজন ইংরেজের কথা, দেশীয়ের নহে।

* অনেকে বলিয়া থাকেন যে, লুৎফ উন্নেসাই মোহনলালের ভগিনী। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ান ফজলে রব্বীখাঁ বাহাদুরেরও এইমত। বেভারিজ সাহেবও লিখিয়াছেন যে, তিনিও এইরূপ শ্রুত হইয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনিও মহাত্মা ফজলে রব্বীর নিকট শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু সায়র মুতাক্ষরীণের অনুবাদক মুস্তাফা সে গোলযোগ মিটাইয়া দিয়াছেন। তিনি মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদের প্রথম খণ্ডের ৬১৪ পৃষ্ঠায় লুৎফ উন্নেসার টিপ্পনীতে লিখিয়াছেনঃ—

"This lady is now (1789) living at Moorshidabad. * * * She must not be confounded with Fairy or Faizen, another favourite of Seradjeddowlah's &c.

তাহার পর তাহার কৃশাঙ্গ প্রভৃতির বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ৭১১ পৃষ্ঠায় মোহনলালের টিপ্পনীতে তাঁহার ভগিনীর বর্ণনায় তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং উভয় স্থলেই তাহার জীবন্তে গৃহাবদ্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

করিত। * তাহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। মুর্শিদাবাদে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, তৎকালে ফৈজীর ন্যায় সুন্দরী সমগ্র ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইত না। তাহার উত্তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, তম্বঙ্গ ও মন্থর-গমনে অনেককে মোহিত করিয়া ফেলিত, সর্ব্বাপেক্ষা তাহার কৃশাঙ্গিত্বের অধিক প্রশংসা ছিল। † ফৈজীর অপ্সরাবিনিন্দিত রূপরাশির কথা সিরাজের কর্ণগোচর হইলে, সিরাজ লক্ষ মুদ্রা সমর্পণ করিয়া বহু অনুনয় বিনয়ে তাহাকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন। ‡ এবং নিজ অন্তঃপুরবাসিনীগণের অন্তর্ভূত করিয়া লন। ফৈজীর সেই উন্মাদ-য়িত্রী রূপসুধা পান করিয়া সিরাজ অধীর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাহাতে যে ভীষণ

---

* যাঁহারা মোহনলালকে বাঙ্গালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনুমানে আস্থা স্থাপন করা যায় না। যখন ফৈজীকে মোহনলালের ভগিনী বলিয়া স্পষ্টই স্থির করা হইতেছে, তখন এ সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহার ভগিনী বাঙ্গালী রমণী হইলে, নর্ত্তকীর ব্যবসায়ের জন্য দিল্লীতে গমন করা কেমন কেমন বোধ হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব-দিগের সময় যে সমস্ত বাঙ্গালী উচ্চ পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাসস্থানের ও তদ্বংশীয়গণের আজিও নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু মোহনলাল সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যায় না। রিয়াজু সালাতীন নামক গ্রন্থে মোহনলালকে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তজ্জন্যই বোধ হয় তাহাকে বাঙ্গালী অনুমান করা হয়।

† এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ফৈজী ওজনে ২২ সের মাত্র ছিল। মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদে এইরূপ লিখিত আছে:—

" When she ate *Paan*, you might have seen through her skin the colored liquor run down her throat . and she was so delicate, as to weight only twenty two seers. মুস্তাফা ইহার অনেকগুলি চিত্র বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। (Mutaqhern Eng Trans. Vol. I, P. 717 also pp. 614-15.)"

‡ ইংরেজী ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মোহনলাল তাঁহার ভগিনীকে উপহার দিয়া সিরাজ-উদ্দৌলার অনুগ্রহভাজন হয়েন। কিন্তু সে কথা সঙ্গত নহে। মুস্তাফা মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদের ৭১৭ পৃষ্ঠার foot note এ লিখিয়াছেন:—

"This Mohanlal had made a present of his sister to Seradj-eddowlah."

ইহার উপর নির্ভর করিয়া বোধ হয় ঐতিহাসিক-গণের উক্ত কথা বলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে, মোহনলাল তাঁহার ভগিনীকে সমর্পণ করেন নাই, সিরাজ তাহাকে বহু অনুনয় বিনয়ে দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন। মুস্তাফা নিজেই আবার একথা লিখিয়াছেন :—

"This last (Faizy) had been a Kuechni at Delhi, that is, a dance-girl, from whence *her attendance had been supplicated* (and this was the expression used), at the Court of Moorshidabad, (her......attendance are in Italics) the request being accompanied by no less than a draught of one lac of rupees. (P. 614 Foot-note.)

সিরাজই ফৈজীর রূপের কথা শুনিয়া তাহাকে মুর্শিদাবাদে আনিয়াছিলেন। মোহনলাল স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজ ভগিনীকে উপহার দিবার জন্য সিরাজের নিকট উপস্থিত হন নাই। তিনি সিরা-জের প্রিয়পাত্র হইবার লোভে প্রাকৃত জনের ন্যায় আপনার ভগিনীকে সমর্পণ করেন নাই। তাঁহার ভগিনী নর্ত্তকীর ব্যবসায় করিত, এবং সেই সূত্রে সিরাজ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হন। যদিও নিজের ভগিনীর জন্য সিরাজের সহিত মোহনলালের পরিচয় হওয়া সত্য, তথাপি মোহনলাল আপনার ক্ষমতা ও গুণপনার জন্য সিরাজের প্রিয় পাত্র হন, নিজ ভগিনীকে ডালি দিয়া নহে। ফৈজীর জীবন্তে গৃহাব-রোধের পরও মোহনলাল সিরাজের অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। ভগিনীর সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘুচে নাই। মোহনলাল ভগিনীকে ডালি দিলে, ফৈজীর কুব্যবহারের পর সিরাজ যে মোহনলালকে অক্ষত রাখিতেন, বলিয়া বোধ হয় না। মুস্তাফার made a present শব্দে ডালি দেওয়া অর্থ না করাই কাজ। অথবা তিনিও সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই।

হলাহলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। যদিও সিরাজের অনুপম সৌন্দর্য্য অনেক রমণীর মনপ্রাণ হরণ করিতে পারিত, কিন্তু তাহাও ফৈজীর হৃদয়কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ফৈজী সিরাজের ভগিনীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর প্রেমে পতিত হয়। সৈয়দ মহম্মদ খাঁ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় সুন্দর ও বলিষ্ঠ-গঠন ছিলেন, ফৈজী গোপনভাবে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যায়। দুই দিবস পরে এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা সিরাজের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। দুঃখে ও ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া তিনি ফৈজীর নিকট উপস্থিত হইলেন- সিরাজের মূর্ত্তি দেখিয়া ফৈজী জীবনের আশা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। সিরাজ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন যে,"আমি দেখি তেছি,তুমি যথার্থই বারাঙ্গনা।" ফৈজী আপনার জীবনে হতাশ হইয়া উত্তর করিল, "জাঁহাপনা, আমার ব্যবসায় তাহাই, এইরূপ তিরস্কার আপনার জননীর প্রতি প্রয়োগ করিলে শোভা পাইত।"* জননীর প্রতি এইরূপ তিরস্কার শুনিয়া সিরাজ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাহাকে একটী প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিয়া তাহার দ্বার ইষ্টক দ্বারা চিররুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। হতভাগিনী গৃহাবদ্ধ হইয়া মারমিয়নের কনষ্টান্সের ন্যায় আপনার জীবলীলার শেষ করিল। তিন মাস পরে সে দ্বার উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল, তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাহার অসাধারণ কৃশাঙ্গিত্বের জন্য সে কঙ্কাল দেখিয়া কাহারও মনে বীভৎস ভাবের উদয় হয় নাই। ফৈজীর বিশ্বাসঘাতকতায়, সিরাজের রমণীজাতির উপর আন্তরিক ঘৃণা উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি যখন লুৎফ উন্নেসার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন যে, সে হৃদয় অটল, তাহার প্রবাহ কেবল একই দিকে প্রবাহিত হয়, সিরাজ ভিন্ন সে স্রোত অন্য দিকে বহে না। তিনি দেখিলেন যে, ফৈজীর হৃদয় যেরূপ পৈশাচিক, লুৎফ উন্নেসার হৃদয় ততোধিক পবিত্র। তাই লুৎফ উন্নেসার প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তিনিই তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটী কথা বলিয়া রাখি, লুৎফ উন্নেসা অথবা ফৈজী কেহই সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রী নহেন। সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রীর নাম আমরা অবগত নহি। * তিনি

* সিরাজের মাতা ও মাতৃষসার সহিত হোসেন কুলিখাঁর অবৈধ প্রণয়ের কথা প্রচলিত থাকায়, ফৈজী সিরাজকে ঐরূপ মর্ম্মস্পর্শী উত্তর প্রদান করিয়াছিল। জননীর সহিত অবৈধ প্রণয়ের জন্য হোসেন কুলিখাঁর হত্যা সম্পাদন হয়। সিরাজ তাহাকে cold blood এ হত্যা করেন নাই। কিন্তু ইতিহাসে আমরা তাহাও দেখিতে পাই।

* সিরাজের কয় পত্নী ছিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। কেবল তিন জনেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, (১) তাঁহার বিবাহিতা পত্নী (ইরাজ খাঁর কন্যা); (২) লুৎফ উন্নেসা ,(৩) ফৈজী (মোহনলালের ভগিনী)। বেভারিজ সাহেব বলেন যে, নিজামত Record এ তিনি ওমদাৎ উন্নেসা নামে সিরাজের এক পত্নীর উল্লেখ দেখিয়াছেন। বেভারিজের মতে লুৎফ উন্নেসাও ওমদাৎ উন্নেসা একই। নিজামত Record এ আছে, যে ওমদাৎ উন্নেসা ১৭৭১খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে গবর্ণমেণ্টের নিকট মাসহারা বৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়া বলেন যে, তিনি প্রথমে মাসে ৫০০৲ টাকা পাইতেন, হেষ্টিংস

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা, তাঁহার পিতার নাম মির্জা ইরাজ খাঁ। প্রথমে, আলিবর্দ্দি খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদের দৌহিত্রী ও আতাউল্লা খাঁর কন্যার সহিত সিরাজের বিবাহ স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কন্যাটী কাল কবলে পতিত হওয়ায়, আলিবর্দ্দি, মির্জা ইরাজখাঁর কন্যার সহিত সিরাজের বিবাহ প্রদান করেন। এই বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়; মুতাক্ষরীণে ইহা বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা যেরূপ দেখিতে পাই, তাহাতে সিরাজ লুৎফ উন্নেসা ব্যতীত আর কাহাকেও যে অধিক ভালবাসিতেন, এরূপ বোধ হয় না, তাঁহার অন্যান্য ভার্য্যার সহিত তাঁহার যে বড় বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। যেখানে তাঁহার বেগমের উল্লেখ দেখিতে পাই, সেইখানে লুৎফ উন্নেসা ব্যতীত আর কাহারও নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ সুখে দুঃখে সকল সময়ে সিরাজ লুৎফ উন্নেসাকেই আপনার সহচরী করিতেন।

সিরাজ যে সকল সময়েই লুৎফ উন্নেসাকে নিজ সঙ্গিনী করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এক সময়ের একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। সিরাজ বরাবরই অত্যন্ত চঞ্চল-চিত্ত ছিলেন; যে তাঁহাকে যে দিকে লওয়াইত, তিনি সেই দিকেই নত হইয়া পড়িতেন। আফগানগণ কর্ত্তৃক সিরাজের পিতা জৈনুদ্দীনের নৃশংস হত্যার পর, নবাব আলিবর্দ্দিখাঁ সিরাজকে পাটনার শাসন কর্ত্তার পদ দিয়া রাজা জানকীরামকে তাঁহার সহকারীরূপে নিযুক্ত করেন। কিন্তু সিরাজ অল্প-বয়স্ক ও আলিবর্দ্দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র থাকায়, নবাব সিরাজকে আপনার নিকটেই রাখিতেন। কার্য্যতঃ রাজা জানকীরামই পাটনা শাসন করিতেন। মেহেদীনেসার খাঁ নামক জনৈক কর্ম্মচারী সিরাজকে এইরূপ বুঝাইয়া দেয় যে, নবাব, সিরাজকে মিথ্যা আশা দেখাইয়াছেন, নতুবা তিনি সিরাজকে প্রকৃত প্রস্তাবে পাটনা শাসন করিতে দিতেছেন না কেন? সিরাজ তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া মেহেদীনেসারের সহিত, জানকীরামের নিকট হইতে পাটনা অধিকারের জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে তিনি সঙ্গে আর কাহাকেও লন নাই। কেবল মাত্র লুৎফ উন্নেসা ও তাঁহার মাতাকে নিজ যানে লইয়া পাটনা যাত্রা করেন। উক্ত যান দিনে ৩০।৪০ ক্রোশগামী দুইটী সুন্দর বলিবর্দ্দ দ্বারা চালিত

---

৪৫০ করিয়াছেন, এক্ষণে ৩২৫ হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, লুৎফ উন্নেসা ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার মাসহারা সম্বন্ধে আমরা অন্য বিবরণ জ্ঞাত হই। লুৎফ উন্নেসা মাসে ১০০০ টাকা পাইতেন, তদ্ব্যতীত আলিবর্দ্দি, সিরাজ প্রভৃতির সমাধিস্থল খোসবাগের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকায়, তিনি তাহার জন্য আরও ৩০৫ টাকা অধিক পাইতেন। (Capt J E Gastrell's Statistical Account of Moorshidabad) হণ্টারও তাহাই বলেন। ওমদাৎ উন্নেসার ৫০০ প্রভৃতির সহিত লুৎফ উন্নেসার ১০০০ টাকার কোনও মিল নাই। ইহাতে লুৎফ উন্নেসা ও ওমদাৎ উন্নেসা এক কি না, সন্দেহের বিষয়। যদি ওমদাৎ উন্নেসা ও লুৎফ উন্নেসা এক না হন, তাহা হইলে বেভারিজের কথানুসারে আমরা সিরাজের আর এক স্ত্রীর নাম জানিতে পারিতেছি। ইনি সেই বিবাহিতা পত্নী কি অন্য কোনও স্ত্রী, তাহা জানিবার উপায় নাই। খোসবাগে সিরাজের দুই স্ত্রীর সমাধি আছে, একটী লুৎফ উন্নেসার, দ্বিতীয়টীর নাম কি জানা যায় না। মহাত্মা লেরক্সী বলেন যে, ওমদাৎ উন্নেসা নামে সিরাজের এক দৌহিত্রীরও উল্লেখ আছে।

হইত। * সিরাজের এইরূপ ঔদ্ধত্যে মেহেদী-নেসার খাঁ হত হন; এবং আলিবর্দ্দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়া, যাহাতে সিরাজ অক্ষত-শরীর থাকেন, তজ্জন্য রাজা জানকী রামকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সিরাজ জানিতেন যে, এইরূপ চাপল্যে নানারূপ বিপদ হইবার সম্ভাবনা, তথাপি স্নেহবশে লুৎফ উন্নেসাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সমস্ত ঘটনা সিরাজের সৌভাগ্য সময়ে সংঘটিত হয় বলিয়া, লুৎফ উন্নেসার চরিত্রের গভীরতা বুঝিতে পারা যায় না। নিম্নলিখিত দুই একটী ঘটনা হইতে তাঁহার সেই দেব-হৃদয়ের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পর, সিরাজ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের অভিনয় হইতেছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সিরাজের বুদ্ধির তাদৃশ স্থিরতা ছিল না, এবং যদিও তিনি মাতামহের অনুরোধে মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি পূর্ব্বের অভ্যাস-দোষ তাঁহার চঞ্চলচিত্তকে অধিকতর চঞ্চল করিয়াছিল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চারিদিকে হিংসা, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের বিভীষিকাময় চিত্র দেখিতে লাগিলেন। কাহারও উপর তিনি সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। যাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতেন, সে-ই তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইত। দুই একজন ব্যতীত তাঁহার প্রধান প্রধান সেনাপতি ও কর্ম্মচারী সকলেই সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার হৃদয় কিরূপ অশান্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু, একজন মাত্র তাঁহার সেই দগ্ধ-হৃদয়ে শান্তিবারি প্রদান করিয়া তাঁহার চঞ্চলচিত্তকে কথঞ্চিৎ স্থিরতর করিতে চেষ্টা পাইতেন। তিনিই লুৎফ উন্নেসা। লুৎফ উন্নেসা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার মনে শান্তির ছায়া উদয় করিয়া দিতেন। ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস-ঘাতক ষড়যন্ত্রকারিগণের কৌশলে, যখন পলাশীর স্মরণীয় প্রান্তরে পরাজিত হইয়া, যুদ্ধস্থল হইতে পলায়নপর সিরাজ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সে চিত্র মনে হইলে, করুণ-রসে হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে। তিনি যাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, সে-ই তাঁহার প্রতি বিমুখ হয়। গভীর রাত্রি, চারিদিকে, কেমন একটা বিষাদের ছবি সিরাজের চক্ষের সমক্ষে নাচিয়া বেড়াইতেছে, পলাশী হইতে মুর্শিদাবাদের পথে, মীরজাফর ও ইংরেজ সৈন্যের সানন্দ কোলাহল, ও বিজয়-বাদ্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেক আঘাতে সিরাজের মর্ম্মস্থল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সিরাজ কণ্ঠ-ছিন্ন কপোতের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক

* মস্তাফা সেই বলিবর্দ্দ দুইটী দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মীরজাফর মসনদে বসার পর, সে দুইটী কাশীমবাজার কুটীর রেসিডেণ্ট ওয়াট্‌স সাহেবকে প্রদান করা হয়। মস্তাফা নিজ মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া তাহাদের ককুৎ স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। আরও আধ ফুটের আবশ্যক হইয়াছিল। গুজরাট দেশজাত এই বলিবর্দ্দ দুইটী দেখিতে তুষারশ্বেত ও অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতি ছিল। ১২০০০ টাকায় তাহারা ক্রীত হয়। (Mataqherin, p. 615).

হইতে বিবেচনা শক্তি যেন চির-বিদায় লইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কি করিবেন, কিছুরই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কোনও কোনও বিশ্বাসী বন্ধুর কথায় সিরাজ একবার নগর রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন, আবার বিশ্বাস ঘাতকেরা পরামর্শ দিল, পলায়ন কর; নতুবা তোমার নিস্তার নাই। সিরাজ অনন্যোপায় হইয়া তাহার অনুগমন করিবার জন্য সকলের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার চরণস্পর্শ করিবারও উপযোগী নহে, আজ সিরাজ তাহাদেরও কৃপাভিখারী। কিন্তু কেহই তাঁহার সেই কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এমন কি, তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত এক-পদ গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। যতই বিপক্ষগণের বিজয় ধ্বনি অগ্রসর হয়, ততই সিরাজের প্রাণ কম্পিত হইতে থাকে। তখন তিনি স্বীয় প্রিয়তমা লুৎফ উন্নেসার নিকট ভগ্ন হৃদয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন। লুৎফ উন্নেসা বাক্যব্যয় না করিয়া দুই এক জন দাসীর সহিত স্বামীর পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইলেন। সেই ভীষণ দ্বিপ্রহর রজনীতে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি ও অধীশ্বরী সামান্য যানে আরোহণ করিয়া রাজধানী ছাড়িয়া চলিলেন। নৈশান্ধকার তাঁহাদের মুখে আবরণ প্রদান করিল, মধ্যে মধ্যে শৃগাল ও পেচকের ভীষণ শব্দ তাঁহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে, নিকটে কোনও শব্দ শুনিলে, মীরজাফরের চর বলিয়া তাঁহারা চমকিত হইয়া উঠিতেছেন, এইরূপ অবস্থায় ক্রমশঃ তাহারা ভগবানগোলার দিকে অগ্রসর হইলেন। যতই গমন করেন, সিরাজ ততই চঞ্চল হইয়া উঠেন, বিশেষতঃ লুৎফ উন্নেসার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দেবহৃদয়া নিজে কিছুমাত্র ক্লান্তি অনুভব না করিয়া, প্রাণপণে স্বামীর কষ্ট নিবারণের জন্য যত্নবতী হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, নিদাঘের তপন আপনার প্রখর কিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে দেখা দিলেন, ক্রমে রৌদ্রে ও রৌদ্রতপ্ত ধূলিতে সিরাজের কমনীয় মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, স্বেদজলে ললাট ও গণ্ডস্থল অবিশ্রান্ত সিক্ত হইতে লাগিল, লুৎফ উন্নেসা ক্রমাগত রুমাল ব্যজন করিয়া স্বামীর সে কষ্ট দূর করিতে লাগিলেন। নিজের শরীর সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি কিসে স্বামীর ক্লান্তি দূর করিবেন, তজ্জন্য অত্যন্ত চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন। এইরূপে তাঁহারা ভাগবানগোলায় উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে নৌকারোহণে রাজমহালাভিমুখে যাত্রা করেন। পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া চিরসুখী সিরাজের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু সেই দেব-হৃদয়া তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি নিজে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া সেই ক্ষুদ্র তরণী আরোহণে গমন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তরঙ্গের পশ্চাৎ তরঙ্গ আসিয়া সেই ক্ষীণকলেবরা তরণীকে রসাতলগামিনী করিবার উপক্রম করিত লাগিল, এবং সিরাজ জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া ভীত ও চকিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু লুৎফ উন্নেসা তাঁহাকে শান্ত করিয়া সলিলসিক্ত স্বামীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুছাইতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যে মধ্যে নিদাঘের বৃষ্টি সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল, লুৎফ উন্নেসা সিরাজকে আচ্ছাদন করিয়া তাহা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্নবতী হইলেন। সঙ্গে একটী ৩।৪ বৎসরের বালিকা কন্যা, সিরাজ এক একবার তাহার দিকে তাকা-

ইয়া কাঁদিয়া আকুল হন, পাছে তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন পদ্মার তরঙ্গে ভাসিয়া যায়, কিন্তু লুৎফ উন্নেসা তাহার প্রতিও তাদৃশ যত্ন না লইয়া, স্বামীর কষ্ট নিবারণের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। এইরূপ তিনদিন তিনরাত্রি অনাহারে কাটাইয়া, তাঁহারা রাজমহলের নিকট উপস্থিত হন। এই সময়ে সিরাজ আপনাদিগের জন্য কিছু খিচুড়ী প্রস্তুতের ইচ্ছা করেন। দানাসাহ নামে একজন ফকীর * তাঁহাদের জন্য আহার প্রস্তুতের ভার লয়। কিন্তু সে গোপনভাবে মীরজাফরের জামাতা মীরকাসেম ও ভ্রাতা মীর দাউদকে সংবাদ দিলে, তাহারা সিরাজকে ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেয়। ঐ সকল কর্ম্মচারী স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে যাবতীয় ধন-রত্নাদি অপহরণ করে। মীরকাসেম * লুৎফ উন্নেসার নিকট হইতে যাবতীয় সম্পত্তি লুটিয়া লইয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হওয়ার পর, হতভাগ্য সিরাজ মীরণের আদেশক্রমে মহম্মদী-বেগের তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া খোসবাগের বৃক্ষ ছায়ায় চিরদিনের জন্য সমাহিত হইলেন। তাঁহার পরিবার-বর্গের দুর্দ্দশা শ্রবণ করিলে, হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া উঠে। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর বেগমকে তাঁহার কন্যাদ্বয় ঘেসিটী ও আয়মানার সহিত চিরনির্ব্বাসিতা করা হইল। সেই সঙ্গে স্বামী বিয়োগবিধুরা অভাগিনী লুৎফ উন্নেসাও স্বীয় চারি বৎসরের কন্যাটী লইয়া মুর্শি-দাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রথমে তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনার সহিত কারারুদ্ধ করিয়া, পরে নির্ব্বাসনের অনুমতি দেওয়া হয়। যে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর আদর্শ-শাসনে বঙ্গের প্রজাগণ বিঘ্নরাশির মধ্যেও শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাঁহার পরিবারবর্গের এরূপ দুর্দ্দশা যে অতীব কষ্টজনক, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা ঢাকায় নির্ব্বাসিতা হইয়া

* দানাসাহ প্রথমে সিরাজকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার বহুমূল্য পাদুকা দেখিয়া তাহার সন্দেহ হয়, পরে নৌকার মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা সমস্ত বলিয়া দেয়। অদ্ভুত প্রকৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিক-গণ লিখিয়া থাকেন যে, সিরাজ নাকি তাঁহার সৌভাগ্য-সময়ে দানাসাহের কাণ কাটিয়াদিয়াছিলেন। (Ive's Voyage, p. 154. Also Orme's Hindustan, Vol. II p. 183.) কিন্তু মুতাক্ষরীণে যাহা লেখা আছে, তাহার ইংরেজী অনুবাদ দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন। "This man (Shah Dana) whom probably he had either disobliged or oppressed in the days of his full power, rejoiced &c." মুতাক্ষরীণ কারের মতে দানাসাহর প্রতি সিরাজ অত্যাচার করিয়াছিলেন কি না, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ লিখিলেন যে, একেবারে তাহার কাণ কাটিয়া দেওয়া হয়। ধন্য সত্যানুসন্ধিৎসু ইংরেজ-ঐতিহাসিকগণ!! রিয়াজু সালাতীন গ্রন্থে লিখিত আছে, সিরাজ ভগবানগোলা হইতে পদ্মা পার হইয়া মালদহ পর্য্যন্ত যান, পুরাতন মালদহের নিকট বড়াল নামক স্থানে দানাসাহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হণ্টার বলেন যে, সিরাজকে ধৃত করার জন্য দানাসাহ মীরজাফরের নিকট হইতে জায়গীর পাইয়া-ছিল, কিন্তু বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল বলেন যে, দানা-সাহের বংশীয়েরা যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করে, তাহা গৌড়ের প্রসিদ্ধ বাদসাহ হোসেনসার দত্ত। বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—"যেখানে সিরাজ-উদ্দৌলা ধৃত হইলেন, ঐ স্থান কালিন্দী তীরবর্ত্তী; উহা তদবধি "সুবামার" নামে বিখ্যাত। স্থানীয় লোকে তাহাকে "শুওরমারা" নাম দিয়াছে। হায় বিধাতঃ, মূর্খের জিহ্বাতে তুমি সুবা সিরাজ-উদ্দৌলাকে শুকরে পরিণত করিয়াছ!!" (সাহিত্য ১৩০১ মাঘ "লক্ষ্মণাবতী" প্রবন্ধ পৃ ৬৫০।)

* এই মীরকাসেমই নবাব কাসিম আলি খাঁ।

অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সেই রাক্ষস-প্রকৃতি মীরণ আলিবর্দ্দির কন্যাদ্বয়কে জলমগ্ন করিতে আদেশ প্রদান করে; তাহার সে আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়াছিল। *

কিছুকাল ঢাকায় বাসের পর লুৎফ উন্নেসা ইংরেজদিগের যত্নে মুর্শিদাবাদে পুনরানীত হইয়া, নবাব আলিবর্দ্দি ও সিরাজের সমাধি খোসবাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তাঁহার করুণোদ্দীপনী অবস্থার কথা স্মরণ করিলে, পাষাণেরও হৃদয় বিগলিত হয়। তাঁহার প্রিয়তম স্বামী এক্ষণে ধরণী-গর্ভে শায়িত; অন্যান্য আত্মীয় স্বজনও একে একে অনন্তপথে যাত্রা করিয়াছেন; তিনি এই বিশাল বিশ্বে একাকিনী, একটী মাত্র বালিকা কন্যা অবলম্বন। এইরূপ অবস্থায় তিনি প্রতিদিন স্বামীর সমাধি পূজা করিতে আসিতেন। রৌপ্য ও স্বর্ণময় ফুল-খচিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রদ্বারা সে সমাধি আচ্ছাদিত ছিল, তিনি তথায় প্রতিনিয়ত দীপ প্রজ্জলিত করিয়া দিতেন, এবং উদ্যানের সুগন্ধি কুসুম সকল চয়ন করিয়া, অশ্রুজলসিক্ত সেই কুসুমরাশি প্রিয়পতির সমাধির উপর নিক্ষেপ করিতেন। সেই সময়ে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে তিনি ভূতল-শায়িনী হইয়া পড়িতেন, এবং অশেষ প্রকার করুণোদ্দীপক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শোক-ভার লাঘব করিতে চেষ্টা পাইতেন। * এইরূপে স্বামীর সমাধি পূজা করিতে করিতে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, লুৎফ উন্নেসা স্বামীর চরণে মনোনিবেশ করিয়া, তাঁহারই পদতলে চিরদিনের জন্য সমাহিত হইলেন। আজিও খোসবাগে সিরাজের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। খোসবাগের বৃক্ষ রাজির নিবিড় ছায়াতলে প্রকোষ্ঠমধ্যে তাঁহারা অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিতেছেন; বিশ্বজননী বসুন্ধরার বিশাল অঙ্কের একদেশে তাঁহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত। যাঁহারা জীবনে রাশি রাশি দুঃখ ও কষ্টে ক্ষত বিক্ষত-হৃদয় হইয়া এক্ষণে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন,

* কেহ কেহ বলেন যে, লুৎফ উন্নেসা, তাঁহার কন্যা, ও সিরাজের কনিষ্ঠ একাম-উদ্দৌলার পুত্র মোরাদ-উদ্দৌলাকেও নিহত করা হয়। (Holwell's India Tracts, p. 41-42, also Vansittart's Narratives. Vol. I. p. 152) Long ও ইহাই লিখিয়াছেন, তিনি লুৎফ উন্নেসার স্থলে Suffen Nissa Begum লিখিয়াছেন, Long's Selections, P. 223). কিন্তু মুতাক্ষরীণে কেবল ঘেসিটা ও আমেনারই জলমগ্ন হওয়ার কথা আছে। মীরণ তাঁহাদিগের প্রতি ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করিয়া জলমগ্ন করিতে আদেশ দেয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহারা মৃত্যুকালে মীরণকে বজ্রাঘাতে মরিবার জন্য অভিসম্পাত করিয়া যান, এবং মীরণেরও নাকি তাহাতেই মৃত্যু হয়। মীরণের মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। অনেকে অনুমান করেন যে, মীরণের মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, পুণ্যশ্লোক (?) ইংরেজ প্রভুগণ নাকি কৌশলক্রমে তাহার জীবলীলার অবসান করিয়া দেন। (Mutaqherin English Trans. Vol. II. Translator's Note P. 132). লুৎফ উন্নেসা ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে পুনরানীত হন। মস্তাফা তাঁহাকে ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতে দেখিয়াছেন। খোসবাগে আজিও লুৎফ উন্নেসার সমাধি আছে। মোরাদ-উদ্দৌলাকেও মস্তাফা মুর্শিদাবাদে দেখিয়াছেন। (Mutaqherin Vol. I p. 643.) লুৎফ উন্নেসার কন্যাবংশীয়েরা অনেক দিন পর্য্যন্ত পেন্সন পাইয়াছিলেন।

* লুৎফ উন্নেসার এইরূপ শোক প্রকাশের কথা ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে Forster নামে একজন সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। (Hunter's Statistical Account of Murshidabad. p. 73.)

তাঁহাদের সে বিশ্রামে ব্যাঘাত করা তাদৃশ যুক্তিসঙ্গত নহে। অনন্ত বিশ্রামে তাঁহারা চিরশান্তি লাভ করুন।

উপরি লিখিত দুই একটী ঘটনা হইতে লুৎফ উন্নেসা চরিত্রের গভীরতা সাধারণে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। ইতিহাসে তাঁহার কোনরূপ উজ্জ্বল চিত্র নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা মিলিত করিলে, আমরা তাহারই মধ্য হইতে সে চিত্রের অনেকটা আভাস বুঝিতে পারি। প্রচলিত ইতিহাসে সিরাজ-উদ্দৌলার মহিষীর উজ্জ্বল চিত্র থাকা সম্ভবপর নহে, কাজেই আমাদের মনে তাহা সুন্দররূপে প্রতিভাত হইলেও, ঘটনাভাবে অধিকতর সুস্পষ্ট করা কঠিন।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

নীতিশিক্ষা। (৩)

নীতিশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন।

নীতিশিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংখ্যায় আমরা সম্প্রতিকার ভারতবাসীদিগের মধ্যে নানাপ্রকার বিবাদ পরিহারের কথা ব্যক্ত করিয়াছি। তাহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবাদ বা মতান্তর-ঘটিত বাদানুবাদের অবসান বিষয়ে পরোক্ষ ভাবে কিছু বলা হইয়াছে, সাক্ষাত সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি নাই। কারণ, সে সর্ব্বমঙ্গলময় ঘটনার এখনো বিলম্ব আছে।

সর্ব্বধর্ম্মের মূল সাধন লইয়া যে ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হয়, সে ব্রাহ্মসমাজেই যখন নানা প্রকার দলাদলি চলিতেছে, তখন এদেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন সম্মিলনের কথা এক্ষণে বক্তব্যই নয়। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের নেতাদিগের দোষ ধরা উচিত বোধ করি না। বিষয়গুণে এবং সময় গুণে এইরূপ হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা রাজা রামমোহন রায় যে মূল বচন ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের সার্ব্বভৌমিকত্ব অবতারণার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে বচনটী প্রাচীন—

"উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম যতস্তৎশব্দোপলক্ষিতং।
যতোবেতি যতোবাচ ইত্যাদি শ্রুতিসম্মতং
নাম রূপাদি নির্দ্দেশৈর্ভিন্নভিন্নানামুপাসকাঃ।
পরস্পরং বিরুদ্ধন্তি ন তৈরেতৎ বিরুধ্যতে॥

যিনি জগতের কারণ তিনিই পরব্রহ্ম উপাস্য হয়েন, "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রমাণ হইতেছে। নাম রূপাদি বিশেষণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপাসকেরা পরস্পর এক ব্যক্তি অন্যের সহিত বিরোধ করেন, কিন্তু তাঁহারা এ পরমেশ্বরের মতের বিরোধী নহেন।"

ব্রাহ্মসমাজের প্রথমদিনের ব্যাখ্যানে এই বচন ও তাহার এই তাৎপর্য্য পরিব্যক্ত হইয়াছিল। এইবচনের বা শ্লোকযুগের প্রথমটী বিধিবোধক; দ্বিতীয়টী তাহার হেতু। নানাবিধ দার্শনিক তর্ক ও বৈদিক ক্রিয়াবিধি অতিক্রম করিয়া আচার্য্য শুরু শ্রীমৎ গৌড়পাদ এই তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন। ইহার পর সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ইতিমধ্যে এই মূল ধরিয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠান হয় নাই। সম্প্রতি তাহা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আরও কতকাল পরে ইহার প্রকৃত ফল দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

এই মহামন্ত্রের মধ্যে যে বিশ্বপ্রেমের উপদেশ নিহিত আছে, তাহা সকলে সাধন করিবেন কি, তাহার ভাবগ্রহ করাও কঠিন

হইল। ভিন্ন ২ প্রকার বোধ বা বিশ্বাসের বশে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহারা কতকদূর অগ্রসর হইলেন; কিন্তু মূল স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিলেন না। অর্দ্ধ পথেই তাঁহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মসমাজ যে একতার মহামন্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা অবিনশ্বর। অতএব আশা করা যায় যে, শীঘ্র বা বিলম্বে এই মহামন্ত্র সকলেরই অবলম্বনীয় হইবে—নামে না হউক, কার্য্যে হইবে। আমরা সামান্য লোক, ধ্বজ পতাকা বিলম্বী নামের মহিমা অপেক্ষা কার্য্যের গুরুত্বকেই অধিক শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া থাকি। এক্ষণে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বা বিশ্ব-প্রেম সকলেরই বাঞ্ছনীয় বোধ হয়। এই প্রকৃত পরমার্থ বস্তুর জ্ঞান ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও পরিমার্জ্জিত হইতেছে। অতএব অবশ্যই আশা হয় যে, অল্পে অল্পে বিশ্বসংসারের সর্ব্বত্র একত্বের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত দৃষ্ট হইবে। এবং সকল লোক দ্বন্দ্ব বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ধর্ম্মরাজের মহাসিংহাসনের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বিশ্বেশ্বরের সমীপে আত্মনিবেদন করিবে।

সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই তাপত্রয় অতিশয় প্রবল। মনুষ্যের পাপ-প্রবণ চঞ্চল চিত্ত জানিয়া শুনিয়াও গন্তব্য পথ বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাব থাকিলে আরও বিপদ। এই কারণে মনুষ্য রোগ শোক মোহে সর্ব্বদা প্রপীড়িত হয়। এমন অবস্থায় ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইলে মনুষ্যের রক্ষা কি? অনিত্য চঞ্চল সংসারে মনুষ্যের শান্তি কোথায়? সুতরাং সংসারাতীত পরম তত্ত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই মর্ত্ত্য জীবনের সকল অর্থ অপেক্ষা পরমার্থ-পদার্থের পক্ষে লোক অধিকতর অনুরক্ত। যে নীতি সেই পরমার্থদায়িনী, তাহারই প্রতি শ্রেয়োর্থীদিগের শ্রদ্ধা জন্মে।

সাধারণ লোকের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, অথবা সভ্য ও অসভ্য, ইহাদের মধ্যে ভাষার পার্থক্য থাকিলেও আন্তরিক মূল ভাবের ঐক্য থাকে। অল্প জ্ঞানীরা অপরিষ্কৃত ভাষায়, এবং অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সুসংস্কৃত ভাষায়, ঈশ্বরের উদ্দেশে এই একই প্রার্থনা করিয়া থাকেন:—

> দয়া ঘন তোমা হেন কে হিতকারী।
> দুঃখ সুখে সমবন্ধু এমন কে, শোক তাপ ভয়হারী॥
> সঙ্কট পূরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন্ কাণ্ডারী।
> কার প্রসাদে দূর পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী॥

বস্তুতঃ বিপ্লবকারী রিপুদলের উত্তেজনায় মনুষ্য নানা প্রকারে কষ্ট পায়। ধর্ম্ম শাসন-বিহীন হইলে মনুষ্য আত্মীয়, প্রতিবেশী, সকলের নিকট আঘাত পাইয়া থাকে। অথচ তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারাবৃত; অতএব শোক এবং যন্ত্রণাই সার হয়। এমন অবস্থায় এক মাত্র ঈশ্বর তাহার শরণ্য হইয়া থাকেন। কেবল ভাবে ও ঈশ্বর দৃষ্টিতেই লোক শান্ত, দান্ত ও সমাহিত হইয়া "এই সঙ্কট-পূরিত ঘোর ভবার্ণবের" সকল অনর্থ অতিক্রম পূর্ব্বক কর্ত্তব্য পথে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিতে পারে, এবং শান্তি লাভে সমর্থ হয়।

এই জন্য প্রথিত আছে, "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।" হিন্দুদিগের পক্ষে ধর্ম্ম কেবল মধু, এমন নয়; উহা তাঁহাদের প্রাণ স্বরূপ। এমন সর্ব্ব-শান্তি-প্রদ মঙ্গলময় ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক-শূন্য হইয়া ইংরাজ-রাজত্বে হিন্দুসন্তা-

নের শিক্ষা বিধান হইতেছে। সুতরাং উহাতে যে অভীষ্ট ফলের উৎপত্তি হইবে, এমন কি সম্ভাবনা আছে? ধর্ম্মানুরাগ-বিহীন হিন্দুজাতি কেবল নীতির অবলম্বনে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এই আশা কুসুমিত আকাশ দর্শনের আশা অপেক্ষা অধিক ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত বোধ হয়।

আমাদের বদান্য ও সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ১৮১৩ অব্দ হইতে এ দেশীয়দিগের শিক্ষা বিধানার্থ মনোযোগী এবং মুক্ত-হস্ত হইয়াছেন। তদবধি জেলায় জেলায় এবং কিয়ৎ কাল পর অবধি গ্রামে গ্রামে স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইতেছে। এই স্কুল সকলের তত্ত্বাবধানের জন্য কত কর্ম্মচারী ও তাহার জন্য কত আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু এত চেষ্টা, যত্ন ও অর্থ ব্যয়ের ফল কি হইল, তাহা বিচার সাপেক্ষ। এ জন্য নানা ব্যক্তির দ্বারা রিপোর্ট সংগ্রহ করা হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ তত্ত্বান্বেষণ, পুনঃপুনঃ রিপোর্ট, পুনঃপুনঃ ইংলণ্ডীয় মূল গবর্ণমেণ্টের ডিসপ্যাচ বা আদেশ পত্র, এই লেখা লেখিতেই এক শতাব্দীর তিন ভাগ অতিক্রান্ত হইল। অবশেষে এডুকেশন কমিশন নামে এক বৃহৎ সমিতির অধিষ্ঠান হয়। তাহাতে এই শিক্ষা সংক্রান্ত তাবৎ বিষয় আমূল আলোচিত হইয়াছিল। ১৮৮২ অব্দে এই মহা সমিতির পত্তন এবং সেই বৎসরই ইহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়া এক বৃহৎ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই সমিতির প্রস্তাবানুসারে শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

মহা সমারোহে এই সমিতির কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইহাতে সভাপতি এক, ও সম্পাদক এক, এবং ২০ জন সভ্য ছিলেন। তাঁহারা অধিক মাত্রায় ইউরোপীয়। এ দেশীয় কয়েক ব্যক্তিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা ভারতের সকল প্রদেশ হইতে, শিক্ষা সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ ১৯৩ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া, উক্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এই সমিতিতে সভ্যরূপে বা সাক্ষীরূপে অনেক উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টীয় পাদরী ছিলেন। যাহারা এতদ্দেশীয় সভ্য বা সাক্ষী, তাঁহাদের মধ্যেও ধর্ম্মবিষয়ে আস্থাশূন্য বা বিচারাক্ষম কেহ ছিলেন না।

এই এডুকেশন কমিশন রিপোর্টে ছাত্রদিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা বিষয়ক অভাবের বহু সমালোচনা দেখা যায়। কমিশনারগণ সাক্ষীদিগের উক্তি ধরিয়া বলিয়াছেন,—

'On the one hand it was urged that moral and religious instruction was the necessary complement to secular instruction, that to the people of India, so instinctively religious, such instruction would be thoroughly congenial, that the necessity of it had been forcibly pressed upon the Commission by a number of witnesses, and its absence been the subject of many complaints, that in spite of the principle of religious neutrality, or of the variety of religious belief among the various sections of the Indian community, there would be no difficulty in framing moral training upon the principles of natural religion, since in those principles all men are agreed.'

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, ধর্ম্ম শিক্ষা ব্যতীত নীতি শিক্ষা এ দেশে সুফলপ্রদ হইবে না। আর এদেশে ধর্ম্ম বিষয়ে নানা মত থাকিলেও সাধারণ ধর্ম্ম শিক্ষার সহিত নীতিশিক্ষার উপায় করা যাইতে পারে।

এই সমিতি ধর্ম্ম-সহকৃত নীতি শিক্ষা বিষয়ে কয়েক প্রকার ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তৎসম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারেন নাই। যাঁহাদের উদ্দেশে সেই উপদেশ প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারাও তাহা সহজ বা সুসাধ্য জ্ঞান করিলেন না। সুতরাং তদনুসারে কোন কার্য্য হইতে পারে নাই।

এদিকে ইংরাজী-মুখরিত বিদ্যালয় সমূহে নীতি-বিহীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল ভাবে চলিতে লাগিল। তাহাতে রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষে—বিশেষতঃ পিতৃ মাতৃগণের পক্ষে নানা প্রকারে উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ সকল সমুপস্থিত হইল। ইহার বিবরণ আমরা প্রথম সংখ্যাতেই ব্যক্ত করিয়াছি। তদবস্থায় দেশীয় লোকদিগের ন্যায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর উপর প্রসন্ন হইতে পারেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে স্কুল কলেজাদির শিক্ষা ঘটিত উপরোক্ত বিষম ত্রুটির কথা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত রূপে বিদিত হইল এবং তৎসংক্রান্ত আলোচনার বৃদ্ধি হইল। মহামহিমান্বিতা শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর ষ্টেট-সেক্রেটরী মহোদয় এবং অত্রত্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরও এই বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

উপরোক্ত কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পরে ১৮৮৪ অব্দে ষ্টেট সেক্রেটরী মহোদয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, স্বতঃপরতঃ যেরূপে হয়, স্কুলকলেজাদির প্রদত্ত শিক্ষার নীতিহীনতার কলঙ্ক দূর করিতেই হইবে। কিন্তু তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপণ বাহাদুর এই উপদেশানুসারে কিছু কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাহার তিন বৎসর পরে যখন নূতন নূতন ব্যক্তি উক্ত দুই মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন ঐ অত্যাবশ্যক বিষয়ের কথা পুনশ্চ উত্থাপিত হইল। এবার গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ষ্টেট সেক্রেটরী মহোদয়ের উপদেশ অনুসারে কিছু কার্য্য করিলেন। ষ্টেট সেক্রেটরী মহোদয়ের উক্ত পত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এক দীর্ঘ বিজ্ঞাপনীর সহিত সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিত হইল। ১৮৮৭ অব্দের শেষ দিনে (৩১ ডিসেম্বর) এই বিজ্ঞাপনী লিপিবদ্ধ হয়। উক্ত বিষয়ে, বোধ হয়, ইহাই গবর্ণমেণ্টের শেষ কার্য্য।

এই বিজ্ঞাপনী ইংরাজী স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞানের অভাব বিষয়ে এক বৃহদায়তন পাকা দলিল। ইহা ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বাদশ পত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে।* আমরা এই বিজ্ঞাপনী হইতে কয়েক পংক্তি প্রথম সংখ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই রূপে গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ সকল ব্যক্তি ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা বিষয়ে মহা আড়ম্বর করিয়া তুলিলেন। কিন্তু উক্ত বিজ্ঞাপনীর প্রকৃত মর্ম্ম আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত উপায় সকল আদৌ কার্য্যোপযোগী নহে। কেবল একটী উপায় প্রধান। তাহা, যতদূর সম্ভব, কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ফলে 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।' মূলচ্ছেদ হইলে শাখা পল্লবে কি করিতে পারে?

মহামান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ষ্টেট্ সেক্রেটরি বাহাদুর ১৮৮৭ অব্দে অত্রত্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তকের আদর্শে এক নূতন পুস্তক রচনা করিবার পরামর্শই মুখ্য-কথা। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সেই পত্রের মূলে যে বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন, তাহাতেও ঐ পুস্তক প্রচারের প্রস্তাব ব্যক্ত হইয়াছে। শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে উক্ত মহামান্য শাসন কর্ত্তৃগণের দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, এক্ষণে সময়ের যে লক্ষণ দেখা যায়, তাহাতে স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক

* supple Gazette of India, Jany. 7. 1888.

ধর্ম্মের মূলে এমন এক পুস্তক রচিত হইতে পারে যে, সেই পুস্তকের দ্বারা স্কুল ও কলেজে ধর্ম্ম ও নীতির প্রবাহ চলিতে পারিবে। উক্ত কমিশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, দুই খ্রীষ্টীয় বিশপ এই পুস্তক রচনার ভার লইতে প্রস্তুত ছিলেন। রিপোর্টের উক্তি এই :—

A letter from Dr. Meurin, R. C. Bishop of Bombay, offering to draw up a moral text book of this kind had already been received by the Commission, and it was also understood that Dr. V. French, Bishop of Lahore, contemplated the publication of a similar work.

পরে এমনও প্রস্তাব হইয়াছিল যে, কিছু দিনের জন্য ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত শিক্ষক আনীত হইবে। বড় উত্তম কথা। হিন্দু ও মুসলমান সন্তানদিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার নিমিত্ত খ্রীষ্টীয়ান পাদরী পুস্তক লিখিয়া দিবেন এবং বিলাতী শিক্ষক তাহার অধ্যাপনা করিবেন। পরন্তু এই প্রস্তাব অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে যেমন হউক, ইহা হিন্দুদিগের পক্ষে একান্ত অগৌরবের বিষয় নহে। কারণ, ইহা তাঁহাদের উদারতার পরিচয়। হিন্দুশাস্ত্রেরই উপদেশ এই যে,—

"সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্যা ইব ষট্‌পদঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ৮ অধ্যায়।

অর্থাৎ ভৃঙ্গ যেমন সকল পুষ্প হইতে সার (মধু) সংগ্রহ করে, সেই রূপ সকল শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিবে।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। মনু ২।২৩৮

অশ্রেষ্ট লোকদিগের নিকট হইতেও শুভ বিদ্যা গ্রহণ করিবে।

কিন্তু আশঙ্কা এই হয় যে, এই মহাত্মারা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্মের অতি অল্পই পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে কিছু না বলিলেও পরোক্ষ ভাবে যাহা বলিবেন, তাহা হয়তো কোন কার্য্যেই আসিবে না, অথবা শিক্ষার্থীদিগের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করিবে।

ইংরাজেরা জানেন যে, হিন্দুগণ নানা মতাবলম্বী। এক্ষণে হিন্দু ধর্ম্মের শাস্ত্র সকল ইউরোপ ও আমেরিকায় বিস্তারিত হইয়াছে। তাহাতে প্রায় সকলেই আপনাদিগকে উক্ত ধর্ম্ম বিষয়ে, সর্ব্বজ্ঞ না হউক, অভিজ্ঞ মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা হিন্দুধর্ম্মের বহির্দ্বারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাঁরা যে এই ধর্ম্মকে কেবল দ্বন্দ্বময়, বিবাদময় দেখিবেন, এবং আসন্ন-মৃত্যু বিবেচনা করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। হিন্দু ধর্ম্ম কত গভীর, এবং হিন্দুদিগের প্রাণের মধ্যে কি ধর্ম্ম পিপাসা জাগিতেছে, তাহা যদি ইহাঁরা জানিতেন ;—হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে কি বিশ্বপ্রেম, কি অনন্ত মঙ্গল ভাব নিহিত আছে, তাহা যদি ইহাঁরা অনুধাবন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ?—আর কি বলিব—এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাহা হইলে ইহারা হিন্দুদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইতেন না।

হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-বিষয়ক মত-ভেদের কথা ইউরোপীয়দিগের গোচরে যে রূপ ভঙ্গীতে উপনীত করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা ইহাদিগকে অতি কৃপা পাত্র বিবেচনা করিতে পারেন। আর তাঁহাদের এরূপ প্রত্যয়ও হইতে পারে যে, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের মূলে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া এ দেশীয়দিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া যায়। মহামান্য ষ্টেট্‌ সেক্রেটরী মহোদয় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পত্রে এ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"The difficulties attending the adoption by the Government of India of an authorized manual containing lessons on moral subjects, which shall not offend the feelings of the numerous races and creeds of the

people of India are no doubt considerable; but I am of opinion that it is the duty of the Government to face this problem, and not to be content until a serious endeavour has been made to supply what can not fail to be regarded as a grave defect in the educational system of India."

Supple. Gazette of India, January, 1888.

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্ম-মত ভেদ সত্ত্বেও তাহাদের উপযোগী এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এবং তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহস অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

আমরা দেখিতেছি, গবর্ণমেণ্টের সাহসের অভাব নাই। কিন্তু সকল কর্ম্ম সাহস-সাধ্য নহে। উপরোক্ত পদ্যাংশে মহামান্য ষ্টেট্ সেক্রেটরী মহাশয় যাহাকে "difficulties" কঠিন ব্যাপার বলিয়াছেন, তাহার কঠিনতাব যে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। কারণ, সম্যক্ উপলব্ধি হইলে তাঁহার দ্বারা এবং অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তন্নিরাকরণের জন্য ঈদৃশ অযোগ্য উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব হইত না।

এক কথায় এই ব্যবস্থার অসঙ্গতি ব্যক্ত করা যাইতে পারে—প্রতিভূ দ্বারা প্রকৃতার্থের সাধনা করা কঠিন। ইংরাজ গ্রন্থকার বা ইংরাজ শিক্ষকের পক্ষে হিন্দুদিগের প্রাণস্পর্শ করিয়া কথা কহাই কঠিন। আর যাহা অন্তস্তল বা মর্ম্ম স্পর্শ না করে, এবং যাহা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর জ্ঞান না হয়, এমন কথায় নীতি শিক্ষা হইতে পারে না। ন ব্যাজেন চরেৎ ধর্ম্মং। ধর্ম্ম কর্ম্মে ছল কৌশল বা ইংরাজী পলিসি policy খাটিবে না। ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা ফাঁকে ফাঁকে চলে না। ইংরাজীতে যাহাকে half-heartedness বলে, তাহা দ্বারা কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করা দুর্ঘট। সুতরাং ইউরোপীয় লেখকের গ্রন্থ বা শিক্ষকের উপদেশ দ্বারা এ দেশীয়দিগের ধর্ম্ম ও নীতির শিক্ষা বিধান সর্ব্বাংশেই কঠিন, তাহার সন্দেহ কি? ফলেও সেই কঠিনতা দুষ্পরিহার্য্য হইয়া রহিল। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত হইল না।

যাহা হউক, তথাপি গবর্ণমেণ্টের উৎসাহোদ্দীপক মধুর বাণী ব্যর্থ হইবার নহে। বিশেষতঃ দূরদর্শী গবর্ণমেণ্ট সমস্ত পৃথিবীর ভাব গতি বুঝিয়া আমাদের হিতার্থ যাহা বলেন, তাহা মহামূল্য বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট আমাদেব অনুকূলে এক পদ অগ্রসর হইলে আমরা শত পদ অগ্রসর হইতে পারি।

আলোচ্যমান বিষয়ে ইংরাজ-রাজ সুদূর ইংলণ্ড হইতে আমাদের শ্রেয়ঃ সাধনের জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা এদেশীয় লোকের অবশ্যই শিরোধার্য্য। এদেশীয়দিগের মধ্যে যাহারা স্কুল-পাঠ্য পুস্তক সকল প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া কতকগুলিন পুস্তক লিখিয়া ফেলিলেন। তদবধি স্কুল ও কলেজে "নীতি" নামধেয় বিস্তর পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। Religious and moral Training শব্দের বহু আলোচনায় উহা এক প্রকার পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ফলে সেই একাকার। "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।" মহামান্য ষ্টেট্ সেক্রেটরী মহোদয়ের কথিত "a grave defect in the educational system of India" পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

উত্তরা কি কমলমণি হইতে পারে ?

যেমন ধর্ম্মতত্ত্বে নবীন বাবু বঙ্কিম বাবুর শিষ্য, তেমন চরিত্রাঙ্কনেও তিনি বঙ্কিম বাবুর পথগামী। তাঁহার উত্তরা বঙ্কিম বাবুর কমলমণি; তাঁহার শৈলজা বঙ্কিম বাবুর আয়েসা; তাঁহার মনসা বঙ্কিম বাবুর আসমানী, এবং তাঁহার দুর্ব্বাসা বঙ্কিম বাবুর গজপতি দিগ্‌গজের উপাদানে সৃষ্ট। মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইলেও দাসীবৃত্তি-শালিনী কবিতা রাজরাণীর আসনে শোভা পায় না। আমরা অতি গভীর দুঃখের সহিত বলিতেছি, কুরুক্ষেত্রের কবিতা অনুকরণের উপর ফুটিতে গিয়া সেইরূপ দৃষ্টি-কটু হইয়াছে।

অনুকরণে যে দোষ, কৃতীও তাহা হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পায় না। যেরূপ অন্তস্তলদর্শিনী চিন্তা হইতে, কার্য্যকারণের যেরূপ খাটি বিশ্লেষণ হইতে, সর্ব্বোপরি স্বভাবের যেরূপ অটুট ভিত্তির উপর প্রকৃত কবিতার সৃষ্টি, অনুকারী কবি তাহা কোথায় পাইবেন? ফলতঃ সেরূপ চিন্তা, বিশ্লেষণ ও স্বভাব জ্ঞান তাঁহার পক্ষে তত আবশ্যক নহে। কেননা, ভিতরে ভিতরে তিনি এক মহা কবির পথে চালিত—দোষগুণের জন্য তাঁহার চিন্তা হইবে কেন? এই শ্রেণীর কবিগণ এক ধর্ম্মে অনুবাদক মাত্র, আদর্শ স্থানীয় কবির কথা নিজের কথায় প্রকাশ করেন মাত্র। ৺ রাজকৃষ্ণ রায়ের ন্যায় ইহাঁরা প্রাহ্নে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে অনবরত কবিতা লিখিতে পারেন বটে, কিন্তু যাহা প্রকৃত ও মৌলিক কাব্য, তাহাতে ইহাঁদের অধিকার জন্মে না। নবীন বাবুর কুরুক্ষেত্রে এতাদৃশী হীনা কবিতার প্রাচুর্য্য অধিক। ভূধর-সাগরোত্তেজিতা চট্টো-বাসিনী কবিতাশক্তি কাঁটানপাড়ার বিষবৃক্ষের সহিত জড়িত হইতে গিয়াই এই হতভাগ্য দেশকে এক মহারত্ন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। উত্তরার চরিত্রে পাঠক ইহার এক নিদর্শন দেখিতে পাইবেন।

কুরুক্ষেত্রের দ্বিতীয় সর্গে উত্তরার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। উত্তরার চরিত্র যেরূপ ভাবে আরব্ধ, যদি সেইরূপে স্ফুট ও সমাপ্ত হইত, না জানি উত্তরা কি চমৎ-কারিণী নায়িকা হইতেন। আমরা উত্তরাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, পাঠক দেখিবেন, এই বিকচ পঙ্কজিনী কর্দ্দমাক্ত হইয়া কি প্রকার হতশ্রী হইয়াছেন।

উত্তরার প্রথম উদয় "প্রীতিপূর্ণ শান্তির ত্রিদিবে।" সেই স্থান কবির অতুল্য বর্ণনা শক্তির প্রভাবে কিরূপ রমণীয় হইয়াছে, দেখুন:—

> ঝটিকা বিক্ষুব্ধ, মত্ত, বিধূর্ণিত
> পারাবার গর্ভে মরকত পুর
> শোভে বরুণের, শান্তির আধার—
> বরুণ বারুণী—কি চিত্র মধুর।
> রণ ঝটিকায় মত্ত বিক্ষোভিত
> কুরুক্ষেত্র গর্ভে, শোভার আধার
> শোভিছে শিবির—শান্তির ত্রিদিব
> প্রীতিপূর্ণ—অভিমন্যু উত্তরার।

এই প্রীতিপূর্ণ শিবিরে—

> প্রীতির স্বপন প্রতিমা যুগল,
> সুখ শান্তিভরা জ্যোৎস্না মুখে,
> প্রীতির স্বপন নয়নে তরল,
> সুখ শান্তিভরা জোৎস্না বুকে।
> ক্ষুদ্র একখণ্ড ফুল্ল নিরমল।
> বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরিয়া,
> সৃজিলেন বিধি মূর্ত্তি উত্তরার,
> অঙ্গে অঙ্গে রূপ তরঙ্গ তুলিয়া।

শত শরচ্চন্দ্র ও ইন্দ্রধনু সংগ্রহ করিয়াও ভারতচন্দ্র বিদ্যায় এরূপ রূপ ফলাইতে পারেন নাই।

কিন্তু এত গেল উত্তরার রূপ, তাঁহার হৃদয় ?

আনন্দ নির্ঝর উছলে হৃদয়ে—
আনন্দ নিঝর নয়নে ভরা
আনন্দ নিঝর ক্ষুদ্র রক্তাধর
ঢালে অবিরাম আনন্দ ধারা।
সে হাসি আনন্দ আনন্দ সে ভাষা
কাঁদিতে ও হাসি অশ্রুতে ভাসে।
অভিমান ভরে থাকে যদি বালা
কোথা হাসি যেন লুকায়ে হাসে।
যথায় উত্তরা তথা উচ্চ হাসি
তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁশরী ঝঙ্কার—
যথায় উত্তরা তথা উচ্চ ভাষা
কিশোরীর ? না, না, স্বর্গীয় বীণার।

এই সদানন্দময়ী পবিত্র স্বর্গীয় বীণার বয়ঃক্রম কত, ইহা জিজ্ঞাস্য হইবে বিবেচনা করিয়া কবি উত্তর দিতেছেন ;—

এই হাসি রাশি কুসুম কাননে
কৈশর যৌবন করিছে কি রণ,
কহিছে যৌবন "উত্তরা যুবতী"
কিশোর কহে "না, কিশোরী এখন।"

আর সমালোচক বলেন,

"না না,
উত্তরা এখন গর্ভবতী হন।"

এই স্থান হইতে আমাদের দুর্ভাগ্যের আরম্ভ। যে বালিকা সে দিন গোগৃহ যুদ্ধের সময় পুতুলের বস্ত্রের জন্য লালায়িত, সে আজ গর্ভবতী। বোধ হয় ছয় মাস কালও অতীত হয় নাই, সেই উত্তরা এক্ষণে গর্ভবতী। ইহাতে নবীন বাবুর দোষ দিব কি ? ইহা নৈমিষারণ্যের কীর্ত্তি ও হিন্দুর দুর্ভাগ্য!

যে সময় কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধের আরম্ভ, তখন আর্জুনি অভিমন্যু পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সীমান্তে দণ্ডায়মান। আমরা গণেশ দেউস্কর নহি যে, উত্তরার বয়ঃক্রম পলানুপলে ঠিক করিয়া বলিতে পারিব। তবে বোধ হয়, তিনি সে সময় একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করেন নাই। সৌভাগ্যের বিষয় সে সময় সহবাস-সম্মতি-আইন বিধিবদ্ধ ছিল না। তাহা হইলে, যুধিষ্ঠির যেরূপ খাটি ধার্ম্মিক ছিলেন, অভিমন্যুকে আর শান্তির ত্রিদিবে থাকিয়া গর্ভবতী বালিকার পশ্চাৎ ছুটাছুটি করিতে হইত না ; লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া জেলখানায় থাকিতে হইত।

এখানে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর কথানুসারে উত্তরা, অভিমন্যু, পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়কে আদি মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করেন, কেননা তাহা না হইলে মহাভারতের পারস্পরিক ঘটনার সামঞ্জস্য হয় না, তাঁহাদিগকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদসংগ্রহকর্ত্তা কবির মনে কি এতাদৃশ বালিকা গর্ভবতীর কথা উদয় হওয়ার সম্ভব ? যে সময়ে হিন্দু জীবন চূড়ান্ত বলবিক্রমে, জ্ঞান বিজ্ঞানে সুশোভিত, সে সময়ের বৈদিক কবি কি ১১, ১২, ১৩ কি ১৪ বর্ষীয় বালিকাকে গর্ভবতী করিয়া জনসমাজে উপস্থিত করিতে পারেন ?

ফলে আদি মহাভারতের সহিত এই সকল চরিত্রের কোন সংস্রব নাই। আদি মহাভারত আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পরে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই সমুদায়ই নৈমিষারণ্যের ব্রাহ্মণ পুঙ্গবগণের কীর্ত্তি-ধ্বজা। নবীনচন্দ্র অজ্ঞাতসারে সেই ধ্বজবাহক সাজিয়াছেন। নবীনচন্দ্র উত্তরার গর্ভের বিষয় বিস্মৃত হন নাই।

"শৈ। তুমি কৌরবের লক্ষ্মী, আছে মা গর্ভে তোমার
একই অঙ্কুর মাত্র কৌরবের ভরসার।
মানবের আশাতরু ধর্ম্মরাজ্যে ভিত্তিভূমি
হবে তব পুত্র, হবে ধর্ম্মরাজ্যে লক্ষ্মী তুমি।
১৭শ সর্গ, ৩৩৩ পৃ

যে উত্তরা কবির কল্পনায় গর্ভবতী বলিয়া স্থিরীকৃত, সেই উত্তরার চরিত্র পাঠক আবার অনুসরণ করুন।

অভিমন্যু চিত্র আঁকিতে জানিতেন। পূর্ব্ববর্ণিত শিবিরে বসিয়া তিনি ভীষ্মের শরশয্যা চিত্রিত করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ "আনত।" এমন সময়ে উত্তরা "চুপে চুপে" পশ্চাৎ আসিয়া কহিলেন ;—

"রণ ক্ষেত্র হতে দিলে পিটটান ?
জীব হত্যা রণে হল কি অপ্রীতি ?
কত শত আজ দিলে বলিদান ?"

অভিমন্যু ভীষ্ম-শরশয়নাঙ্কনে বিরত হইলেন না। কিন্তু উত্তর করিলেন।

"যথার্থ উত্তরে। দিয়াছি পিটটান।
যুঝিতে যুঝিতে কি মনে পড়িল,
কার হাসিটুকু, কার মুখখান।"

তাহার পর সেই একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা "দেখি দেখি" বলিয়া স্বামীর আনতমুখ উন্নত করিলে,অভিমন্যু বলিলেন,

"এই মুখ বটে, এ হাসিটুকু।"

অতঃপরে কি হইল,—

অধরে অধর হইল মিলিত
অধরে অধর রহিল গাথা
অধরে অধর কি সুধা ঢালিল
নিমীলিত চারি নয়ন পাতা।

গর্ভবতী উত্তরার মনে তখন কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে, দেখুন ;—

"নরহত্যা কবি মিটেনি কি সাধ ?
নারীহত্যা কেন এরূপে আবার ?"

অভিমন্যু আবার উত্তরা হইতেও কিছু কার্য্যিজ্ঞ, কহিলেন,—

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে করে নরহত্যা
যেজন, এ কথা সাজে কি তায় ?
তবে নরহত্যা মানি শ্রেষ্ঠ তব,
মারিয়া বাঁচাও দিনে শত বার।
ইচ্ছা, থাকি প্রেম অনন্ত স্বপনে
অই বুকে মরি, জাগিনা আর।

এই প্রকারে ত ভীষ্মশরশয্যার চিত্রকর অভিমন্যু ও গর্ভবতী উত্তরার অতি পবিত্র মনোবৃত্তির বিনিময় হইল। কিন্তু ইহাতেও চিত্রকর স্বকার্য্য হইতে বিরত হন নাই। উত্তরা তখন চুপেচুপে তাহার তুলিটি লইয়া চম্পট। "চোর! চোর।" বলিয়া অভিমন্যু তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। উত্তরাও বনকুরঙ্গিনীর মত ঘুরিয়া ফিরিয়া এবং "হাসির ঝলকে শিবির আলা" করিয়া ধাবমানা হইলেন। অভিমন্যু তখন

ক্রীড়াবন ত বন কুরঙ্গের মত,
পশ্চাতে পশ্চাতে কিশোর ধায়,—
মুখভরা হাসি, প্রেমভরা আঁখি,
দুইটি বিদ্যুত খেলিয়া বেড়ায়।"

কুরঙ্গিনী অতঃপরে ধরা পড়িলেন ; —

"এ বার যুবক ধরিল ঝাপটি,
"হিহি" উচ্চ হাসি হাসিছে বালা,
কর হতে তুলি লইল কাড়িয়া
চাপিয়া হৃদয়ে কুসুম মালা।

মালা ত হৃদয়ে চাপিয়া গেল ; হাসি রাশির উপর ও অজস্র চুম্বন বর্ষণ হইতে লাগিল ;—

চুম্বিলা সে হাসি আবার আবার
হাসিতে সুন্দর মিশিল হাসি।
নিপীড়িত যুগ্ম কুসুম স্তবক
ঢালিল হৃদয়ে অমৃত রাশি।

এখন উত্তরা কি দয়ার পাত্র। তাঁহার বদন মুক্তকেশাবৃত হইয়া যুবকের বাম-প্রকোষ্ঠে শোভিতেছে,যুবকের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে তাহার ক্ষীণ কটিতট কুসুমদামের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আর উত্তরা নিজে

জ্যোৎস্নার লতা উত্তরীর মত
শোভিতেছে বক্ষে, মোহিত প্রাণ।

চুম্বিছে যুবক আবার আবার
ফুলে ফুলে সেই পুষ্পিতা লতা,
আবার আবার হাসিব তরঙ্গ।
কি ভাষা হাসির। মরি কি কথা।

আমরাও ভাবিতেছি, মরি কি কথা! এ কথাটা বোধ হয় ভাগবতের রাধাকৃষ্ণের নিষ্কাম প্রেমের কথা হইবে।

যাহা হউক, রণ সাঙ্গ হইল;—

"সাঙ্গ হল রণ, আবার আসনে
বসিল যুবক আঁকিতে ছবি।
কহিল পাগলী দেখ লো চাহিয়া
জগতে অতুল বীরত্ব ছবি।"

আমরাও এই অবসরে বঙ্কিমচন্দ্রের অতুল কবিত্ব ছবি দেখিব ও দেখাইব।

পাঠকেরা অবশ্য অবগত আছেন যে, বিষবৃক্ষে "মহাসমর" নামে একটি অধ্যায় আছে। তাহাতে বাঙ্গালা কেরাণী বাবু শ্রীশচন্দ্র ও তদীয় সহধর্ম্মিণী কমলমণির মহাসমরের কথা আছে। আমরা তাহার খানিক অংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

কমলমণি। শুধু কি তাহ? সতীশের নিমন্ত্রণ আমার নিমন্ত্রণ আর তোমার নিমন্ত্রণ।

শ্রীশ। আমার নিমন্ত্রণ কেন?

ক। আমি বুঝি একা যাব? আমাদের সঙ্গে গাড়ু গামছা নিয়ে যাবে কে?

শ্রী। এ সূর্য্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুর জামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দুদিনের জন্য একটা ঠাকুর জামাই দেখিয়ে দিতে পারি।

কমলমণির বড় রাগ হইল। সে ভ্রুকুটি করিল এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজখানায় লিখিতেছিল,তাহা ছিড়িয়া ফেলিল। শ্রীশ হাসিয়া বলিল "তাহা লাগ্‌তে আস কেন"? কমলমণি কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিল "আমার খুসী আমি লাগ্‌বো।"

শ্রীশচন্দ্র কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিলেন "আমার খুসী আমি বল্‌বো।" তখন কোপযুক্ত কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইল। রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণি অধীর হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিল।

দেখিয়া সতীশচন্দ্রের বড় প্রীতি জন্মিল। তিনি জানিতেন যে, মুখচুম্বন তাহার ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজভোগ আদায়ের অভিলাষে মার জানু ধরিয়া দাড়াইয়া উঠিল এবং উভয়ের মুখপানে চাহিয়া হাসির লহর তুলিলেন। "সে হাসি কমলমণির কর্ণে কি মধুর বাজিল! কমলমণি তখন সতীশকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিলেন। পরে শ্রীশচন্দ্র ও কমলের ক্রোড় হইতে তাহাকে লইলেন এবং ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিলেন।"

ইহার পর রসিক বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কালে ভগদত্ত ও অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অর্জ্জুনকে তন্নিবারণে অক্ষম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্ষ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন। সেইরূপ কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষম যুদ্ধে সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র সকল আপন বদন মণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল।"

আমরা অবগত নাই উত্তরার গর্ব্ভে থাকিয়া পরীক্ষিৎ উত্তরাভিমন্যুর এই মহাস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না? তবে আমরা দেখিতে পাই "রণ সাঙ্গ" হইয়াও সাঙ্গ হয় নাই। যুবা যে ছবি আঁকিতে বসিয়াছিলেন, সে ছবি আঁকা সাঙ্গ হইয়া-

ছিল বটে। কিন্তু "সায়কে শায়িত" ভীষ্মমূর্ত্তি "কি নিষ্ঠুর দৃশ্য" বলিয়া উত্তরার তাহা ভাল লাগিল না। বরঞ্চ অভিমন্যুর তদ্বিধ আশা আকাঙ্ক্ষার আভাস পাইয়া তিনি ছবি লইয়া পলায়ন করিলেন এবং বলিলেন,

"এখনি উনুনে করি সমর্পণ
এ সাধের ছবি করিব ছাই।
ফেলিয়া সে ছাই হিরণ্বতী জলে,
দিব করতালি, তাই তাই তাই।"

ইহার পরে উত্তরা কক্ষ গালিচায় শুইয়া পড়িলেন ;—

কুসুম কোমল কক্ষ গালিচায়
কুসুমিতা লতা ঢলিয়া পড়ি,
কাম-স্বপ্ন শয্যা পুষ্পিত উরসে
হাসিছে ছবিটি চাপিয়া ধরি।

* *

মুগ্ধপ্রাণ যুবা চাহিয়া চাহিয়া
ঈষদ্ ঈষদ্ করে পরশন,
বুবঙ্কিম গ্রীবা সুগোল সুন্দর
পার্শ্বব্রীড়ালয় মার্জ্জিত কাঞ্চন।
দিয়া গড়াগড়ি হাসিতেছে বালা
লহরে লহরে ছুটিছে হাসি,
বিকাশিছে মরি উন্মেষ যৌবন
লহরে লহরে কিরূপ রাশি।

উত্তরার "কামস্বপ্ন শয্যাপুষ্পিত উরসে" এক্ষণে কি প্রকার চিত্তবৃত্তি স্ফুরিত হইতেছে, তাহা আমরা সবিশেষ বলিতে পারিব না। তবে দেখা যায়, তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, হৃদয়ের অন্য বৃত্তি সকল নিবিয়া গিয়া অবশতার সহায়তা করিতেছে, হস্ত হইতে চিত্র স্খলিত হইতেছে।

দিয়া গড়াগড়ি হাসিতে হাসিতে
চিত্র হইতে চিত্র পড়িল খসিয়া।
এক চিত্রকরে অন্য চিত্র বক্ষে।
হাসিয়া যুবক লইল তুলিয়া।
প্রাণেশের করে ক্ষীণকটি খানি,
যেন ফুলধনু দুলিয়া পড়ি,
আলু থালু কেশ, আরক্ত বদনে
আনত নয়নে কি ক্রীড়া মরি!
অশ্রান্ত হাসির আবেশ নয়নে
পতিমুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া
বাড়াইছে কর ধরিতে সে ছবি—
খেলে দুই পদ্ম কি লীলা করিয়া।
কি লীলা করিয়া খেলে কর্ণফুল!
কি লীলা করিয়া খেলিছে বলয়!
দোলে মুক্তা হার কিবা লীলা করিয়া!
শিঞ্জিনী শিঞ্জন কিবা লীলাময়।

ইহার পর আবার সেই সহস্র চুম্বনের পুনরভিনয় হইল।

আবার আবার সহস্র চুম্বন,
চুম্বন সহস্র আবার আবার ;
হাসির লহরে সহস্র সহস্র
কুসুম বর্ষণ কিবা অনিবার।

কিন্তু ইহাতে উত্তরার মনে ক্রোধ জন্মিল ; তিনি বলিলেন,

"নাহি চাহি ভালবাসার ঢঙ্।
বড়ই আমার লেগেছে বিষম।"

যুবা হাসিয়া কহিলেন

"লেগেছে কোথায়—
শরীরে, মনে কি নাকের আগায় ?
দিতেছি ঔষধ "আয় কাছে আয়।"

উত্তরাও ছাড়িবার পাত্রী নন ;—

"আয় কাছে আয়"—মাথা হেলাইয়া
হাসি কান্না মুখে কহিল উঠি।"

যে উত্তরাভিমন্যুকে শান্তির ত্রিদিবে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে পরস্পরকে "আয় আয়" করিয়া গালিচায় শুইয়া পড়িয়া ডাকাডাকি করিতেছে। পাঠক ইহার পর আর কি দেখিতে চান ?

তবে উত্তরা একটুক বুদ্ধিমতী ছিলেন, ছবিটি লইয়া এক্ষণে পলাইয়া দাইমা সুলোচনার নিকট চলিয়া গেলেন। সেখানে অভিমন্যু উত্তরায় একটা মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। সুলোচনা দাসী চিফ্ জষ্টিস্ মহাশয়া।

"আমার উপরে কে সে বিচারক।"

বলিয়া কি রায় দিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই।

আমরা দ্বিতীয় সর্গে উত্তরার চরিত্রের যে চিত্র পাইলাম, তাহা বিস্তারশঃ উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্কিম বাবু শ্রীশ-কমলমণিতে যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, ইহা কি তদপেক্ষা অন্যতর? তদপেক্ষা ইহা বিপুল বটে, কিন্তু মূলে সেই একই চিত্র।

তবে বঙ্কিম বাবুর চিত্র নির্দ্দোষ। তিনি কোন গর্ভবতী ললনাকে এরূপ অবস্থায় উপস্থিত করেন নাই। কোন হিন্দু কবিই গর্ভবতী ললনার এরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার অঙ্কিত করেন নাই। ইহা কতদূর স্বাভাবিক, সে বিষয়েও আমাদের গভীর সন্দেহ। স্বাভাবিকই হউক আর অস্বাভাবিক হউক, প্রতিভাশালীর কবির হস্তে ভারত-ললনাকে এরূপ অশ্লীলতার আকণ্ঠ মগ্ন কে ইচ্ছা করে? সত্য বটে, বিদ্যার চরিত্রে অশ্লীলতা চূড়ান্ত স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কৈফিয়ৎ আছে, নবীনচন্দ্রের কৈফিয়ৎ নাই।

পাঠকেরা স্মরণ করুন, সীতা গর্ভবতী অবস্থায় কিরূপ অঞ্চল পাতিয়া শুইয়া থাকিতেন। সুদক্ষিণা অজকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রভাতকল্পা শশীযুক্তা শর্ব্বরীর ন্যায় কেমন পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন। আর তুলনা করুন, সেই পৌরাণিক সাহিত্য হইতে গর্ভবতী নায়িকা "আরক্ত বদনা" লইয়া নবীনচন্দ্র কামস্বপ্ন রাগরঞ্জিতা উত্তরার কি চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। তবে নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' নাকি ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত; এই যা বলুন।

কেন উত্তরার চরিত্র এইরূপ হইল, কেন প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা ও কবিত্ব আস্তে আস্তে আমাদিগকে স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়া নরকের উপান্তভূমে ফেলিয়া গেল, ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, অনুকরণস্পৃহা ইহার মূল কারণ। কবির মনে তখন শ্রীশ-কমলমণির চিত্র জাগ্রত এবং তাহা হইতে তিনি বঙ্ লইয়া স্বীয় চিত্রে তুলিকা-পাত করিতেছেন। ভুল হইতেছে, উত্তরা কমলমণি নহে, শ্রীশ অভিমন্যু নহে; তথাচ কবি উঠিতে পারিতেছেন না। ভুল করিয়াও সেই অনুকৃত পথে ধাবিত হইতেছেন। আর উত্তরার চরিত্রাঙ্কন যদি তাঁহার নিজস্ব হইত, কৈশর যৌবনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মানা গর্ভবতী হিন্দু ললনার কি এক লজ্জাশীল চিন্তান্বিত সঙ্কোচভাব—লজ্জাবতী লতার সঙ্কোচ ভাবের মত—কি এক অপূর্ব্ব চিত্র নবীনচন্দ্রের হস্ত হইতে চিত্রিত দেখিতাম, তাহার তুলনা নাই। আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ তাহা হইল না।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (৮)

মল্লবংশ।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মল্লদেব ললিতপট্টনের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অনন্ত বা আনন্দমল্লের পুত্র বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অনন্ত মল্ল ১২২০—৪০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নেপালে রাজত্ব করেন। বংশাবলীতে এই মল্লদেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই মল্লদেবের দ্বারাই নেপালে মল্লবংশের অধি-

কার দূরীভূত হয়। পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া, নিম্নে মল্লবংশের আনুমানিক রাজত্ব সময় নির্দ্দিষ্ট হইল। কালক্রমে সমগ্র নেপালে মল্লবংশের আধিপত্য বিস্তারিত হয়। মল্লদেবের অধস্তন অষ্টম পুরুষ জয়স্থিতিমল্লের আধিপত্য সম্ভবতঃ নেপালের সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। জয়স্থিতিমল্লের প্রপিতামহ নাগেন্দ্র-মল্লের সময়ে ১২৪৬ শকাব্দে (১৩২৪খ্রীঃ) মিথিলার রাজা হরিসিংহ দেব নেপাল আক্রমণ করেন। চারি পুরুষ রাজত্বের পর, হরিসিংহ দেবের বংশ নেপাল হইতে বিলুপ্ত হয়। হরিসিংহ দেবের প্রপৌত্র শ্যামসিংহ দেবের মৃত্যুর পর, মল্লবংশের অপ্রতিহত প্রভুতা নেপালে সংস্থাপিত হয়। এই সময় হইতে বংশাবলীর প্রদত্ত নামমালা অধিক পরিমাণে সত্য ও সমূলক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। জয়স্থিতি মল্লের বংশধরদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

মল্লবংশ।

মল্লদেব (১২৪০—৬০খ্রীঃ)
জয়ভদ্রমল্ল (১২৬০—৮০)
নাগমল্ল (১২৮০—১৩০০)
জয়জগৎমল্ল (১৩০০—২০)
নাগেন্দ্র মল্ল (১৩২০—৪০)
উগ্রমল্ল (১৩৪০—৬০)
অশোকমল্ল (১৩৬০—৮০)
জয়স্থিতিমল্ল (১৩৮০—১৪০০খ্রীঃ)

সূর্য্যবংশ।

হরিসিংহ দেব (১৩২৪—৫০খ্রীঃ)
মতিসিংহ দেব (১৩৫০—৭০)
শক্তিসিংহ দেব (১৩৭০—৯০)
শ্যামসিংহ দেব (১৩৯০—১৪১০খ্রীঃ)

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হরিসিংহ দেব আযোধ্যায় প্রাদুর্ভূত হন। তিনি সূর্য্যবংশে ও ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান জাতির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি নেপালের দক্ষিণাংশে সুবিস্তীর্ণ জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বিস্তীর্ণ ও বনাকীর্ণ ভূভাগ "তরাই" নামে পরিচিত। কালক্রমে সিমরাউনগড়ে তাঁহার রাজধানী সংস্থাপিত হয়। রাজধানীতে তিনি কুলদেবতা তুলজা ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ভুজবীর্য্যে মিথিলায় আপনার প্রাধান্য স্থাপন করেন। মিথিলা তাঁহার শাসনদণ্ডের অধীন হওয়ার পরে, তিনি কুলদেবীর আদেশক্রমে নেপাল আক্রমণ করেন। নেপালের কিয়দংশ অধিকার করিয়া, তিনি ভাটগাঁয় আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। এইরূপে হরিসিংহ দেব মিথিলা ও নেপাল এক শাসনদণ্ডের অধীনে আনয়ন করেন। সিমরাউনগড় ও ভাটগাঁ হইতে তিনি এই উভয় রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মিথিলা স্বাধীনতা অবলম্বন করে। নেপালের বংশাবলীর মতে ৪৪৪ নেপালী সংবতে (১৩২৪ খ্রীঃ) হরিসিংহ দেব নেপালে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার প্রপৌত্র শ্যামসিংহ দেবের রাজত্ব কালে নেপালে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। তাহাতে অনেক প্রাণী বিনষ্ট ও বহুতর গৃহাদি ভূমিসাৎ হয়। ৫২৮ নেপালী সংবতের (১৪০৮খ্রীঃ) ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। রাজা শ্যামসিংহের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়। অনন্তর মল্লবংশের একাধিপত্য নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মল্লবংশীয় জয়স্থিতিমল্ল সূর্য্যবংশের দৌহিত্র ছিলেন। শিলালিপির দ্বারাও এই সম্পর্কের বিষয় জানা যাইতেছে।

নেপালের দুইখানি শিলালিপিতে এই হরিসিংহ দেবের নাম পাওয়া যাইতেছে।

তন্মধ্যে প্রথম লিপি ৭৫৭ নেপালী সংবতের (১৬৩৭ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসের বৃহস্পতিবারে ও শুক্লাদশমী তিথিতে খোদিত হয়। ললিত-পট্টনের মল্লবংশীয় রাজা সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের আদেশে ইহা উৎকীর্ণ হয়। এই লিপি উক্ত বৈষ্ণব রাজার প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের পূর্ব্ব পুরুষ মহেন্দ্রমল্ল, হরিসিংহদেবের প্রতিষ্ঠিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহেন্দ্রমল্লের পুত্র শিবসিংহ দেব। শিবসিংহ দেবের পুত্র হরিহর সিংহ। হরিহর সিংহের পত্নী লালমতীর গর্ভে রাজা সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের জন্ম হয়। সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের গুরুর নাম বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।

"প্রাবীণ্যপ্রথিতঃ প্রতাপমথিত-প্রত্যার্থিপৃথ্বীপতি-
প্রোদ্দামপ্রমদোঘলোচন-পয়ঃ-প্রাবৃদ্ধ বারাং নিধিঃ।
জাতঃ শ্রীহরিসিংহ দেব নৃপতি র্দাতাবদাতান্বয়ে,
সংপ্রাপ্তঃ পৃথুনা নৃপেণ সমতাং যো বৃত্তিদাতা সতাং।"২।

নেপালের মহারাজ প্রতাপমল্ল নিজের বংশাবলী ত্রিশটী শ্লোকে রচনা করেন। তাঁহার আদেশে ৭৭৮ নেপালী সংবতে (১৬-৫৮ খ্রীঃ) এই রাজ বংশাবলী পশুপতিনাথের মন্দিরের অঙ্গনে এক শিলাখণ্ডে রাজার আদেশে উৎকীর্ণ হয়। অদ্যাপি এই শিলালিপি তথায় বর্ত্তমান আছে। ইহাতে সুকবি ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজ প্রতাপমল্ল আপনাকে হরিসিংহদেবের বংশধর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে লিখিত রহিয়াছে যে, সূর্য্যবংশে বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর এই বংশে যথাক্রমে দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রাম ও লব প্রাদুর্ভূত হন। হরিসিংহ দেব এই সূর্য্যবংশে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মিথিলায় রাজত্ব করেন। তাঁহার আদেশে মিথিলায় অসংখ্য জলাশয় ও সরোবর খনিত হয়। রাজা যক্ষমল্ল এই হরিসিংহদেবেরই বংশধর ছিলেন।

"জাতঃ শ্রীহরিসিংহদেব-নৃপতিঃ প্রৌঢ়প্রতাপোদয়ঃ।
তদ্বংশে বিমলে মহারিপুহরে গাম্ভীর্য্যরত্নাকরঃ॥
কর্ত্তা যঃ সবসামুপেত্য মিথিলাং সংলক্ষ্য লক্ষপ্রিয়ো।
নেপালে পুনরাঢ্য বৈভবযুতে স্থৈর্য্যং বিধত্তে চিরং॥১০॥
মাণিক্যপ্রতিম প্রতাপপটলৈ-রাদীপ্তলোকত্রয়ো
মুক্তাপংক্তিসহস্রশোভনযশোবৃন্দেন সংশোভিতঃ।
পক্ষত্যাকৃতিকর্ণ বারণ-গিরিগ্রামোবন-ব্যাকুলং।
পারাবারমিবেহ যঃ পরিহসত্যাধায় চিত্তেঽচ্যুতং॥১১

রাজা হরিসিংহদেবের নিকট মিথিলার ইতিহাস সবিশেষ ঋণী। তাঁহার আদেশে মিথিলার প্রামাণিক ইতিহাস "পাঞ্জী" লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। মৈথিল ব্রাহ্মণগণ তাল-পত্রে আপনাদের বংশাবলী লিখিতে আরম্ভ করিয়া, "পাঞ্জিয়ার" নামে পরিচিত হয়। মিথিলার পাঞ্জিয়ার বাঙ্গলার কুলজ্ঞ ঘটকের অনুরূপ। ১২৪৮ শকাব্দে (১৩২৬ খ্রীঃ) রাজা হরিসিংহ দেবের আদেশে মিথিলার "পাঞ্জী" সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়।

"শাকে শ্রীহরিসিংহদেবনৃপতে র্ভূপার্কতুল্যে জনি।
তস্মাদন্তমিতেঽব্দকে দ্বিজগণৈঃ পাঞ্জী-প্রবন্ধঃ কৃতঃ।"
(বঙ্গদর্শন, ৪।৮৪ পৃষ্ঠা)

মিথিলার রাজা হরিসিংহ দেবের সময়ে মিথিলায় সংস্কৃতের সবিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হয়। চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর তাঁহার অমাত্য-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি "রত্নাকর" নামে সাত খানি স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি আপনাকে 'মহাসান্ধিবিগ্রাহিক' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। চণ্ডেশ্বরের পিতার নাম বীরেশ্বর ঠাকুর। "ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা" নামক পুস্তকে আমরা চণ্ডেশ্বরের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। "বিবাদরত্নাকর" নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থের শেষভাগে চণ্ডেশ্বর লিখিয়াছেন যে, ১২৩৬ শকাব্দে (১৩১৪ খ্রীঃ) তিনি 'তুলাপুরুষ' নামে মহাদান ব্যাপার সম্পন্ন করেন। বাগ্বতী (বাঘমতী) নদীর তীরে তিনি অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষে এই দান কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি রাজা হরিসিংহদেবের নাম উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার কুলদেবী ভবানীর উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজ হরিসিংহ দেবের নেপাল বিজয়ের বিবরণ এই পুস্তকের আরম্ভে উল্লি-

খিত হইয়াছে। ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পর এই বিবাদরত্নাকর রচিত হয়। এই বর্ষে মহারাজ হরিসিংহ দেব নেপালের কিয়দংশ অধিকার করিয়া, ভাটগাঁয় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। জার্ম্মেন ওরিয়েণ্টেল সোসাইটীর পুস্তকালয়ের একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থের শেষভাগ দৃষ্টে হরিসিংহদেবের নেপালে প্রতিষ্ঠার কাল ১২৪৫ শকাব্দ (১৩২৩-২৪ খ্রীঃ) বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ১৩১৪খ্রীঃ হরিসিংহদেব যে মিথিলার অন্তর্গত সিমরাউনগড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার অমাত্য চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের রচিত "বিবাদরত্নাকর" গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

"সর্ব্বোপকারে সুরবাহিনীব,
সর্ব্বার্থসিদ্ধৌ কমলালয়েব।
সর্ব্বাশ্রয়া পাতু পবিত্রয়ন্তী
শ্রীমৎক্ষিতীশং মুদিতা ভবানী॥
"শ্রীচণ্ডেশ্বরমন্ত্রিণা মতিমতানেন্ প্রসন্নাত্মনা,
নেপালাখিল ভূমিপালজয়িনা পুণ্যাত্মনা কর্ম্মণা।
বাগ্বত্যাঃ সরিত স্তটে সুরধুনী সাম্যং দধত্যাঃ শুচৌ,
মার্গে মাসি যথোক্তপুণ্যসময়ে দত্ত স্তুলাপুরুষঃ॥
রস-গুণ-ভুজ-চন্দ্রৈঃ সম্মিতে শাকবর্ষে
সহসি ধবলপক্ষে বাগ্বতীসিন্ধুতীরে।
অদিত তুলিতমুচ্চৈ-রাত্মনা স্বণরাশিং
নিধিরাখিলগুণানাং উত্তরঃ সোমনাথঃ॥"
(বিবাদরত্নাকর)

হরিসিংহদেবের প্রতিষ্ঠিত সূর্য্য বংশের সহিত নেপালের মল্লবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে, মল্লবংশ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া শাসন-লিপিতে পরিচিত করিয়াছেন। মল্লবংশীয় মহারাজ জয়স্থিতি মল্ল সূর্য্যবংশের দৌহিত্র ছিলেন। নেপাল হইতে আনীত একখানি হস্তলিখিত পুস্তকের শেষভাগ দৃষ্টে, ১৩৮৫খ্রীঃ জয়স্থিতিমল্ল নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া, বেণ্ডল সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৫১২ নেপালী সংবতে খোদিত জয়স্থিতি মল্লের নামাঙ্কিত এক শিলালিপির বিবরণ বংশাবলীতে উল্লিখিত হইয়াছে। বংশাবলীর মতে তাঁহার পিতা অশোকমল্ল বাগমতী, মানমতী ও রুদ্রমতী নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে কান্তীপুর নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন।

জয়স্থিতিমল্লের পত্নীর নাম রাজল্লাদেবী। রাজমহিষী রাজল্লাদেবীর গর্ভে ধর্ম্মমল্ল, জ্যোতিমল্ল ও কীর্ত্তিমল্ল নামে মহারাজ জয়স্থিতিমল্লের তিনটী পুত্র জন্মে। পিতার মৃত্যুর পর ধর্ম্মমল্ল ও জ্যোতিমল্ল যথাক্রমে পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ধর্ম্মমল্লের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিমল্ল নেপালের রাজত্ব করেন। ধর্ম্মমল্ল ও জ্যোতিমল্লের নাম বংশাবলীতে উল্লিখিত হয় নাই। জ্যোতিমল্ল লক্ষাহুতি দিয়া এক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তিনি দেবপট্টন নগরে পশুপতিনাথের মন্দিরের চূড়ায় এক স্বর্ণ কলস প্রতিষ্ঠিত করেন। ৫৩৩ নেপালী সংবতের (১৪১৩ খ্রীঃ) মাঘ মাসের শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে ও রবিবারে এই সুবর্ণ কলস স্থাপন করেন। নেওয়ারী অক্ষরে এই শিলালিপি রাজাদেশে উৎকীর্ণ হয়। পশুপতিনাথের মন্দিরের পশ্চিমদ্বারের বামপার্শ্বে এই লিপি খোদিত রহিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ জ্যোতিমল্লের মহিষীর নাম সংসার দেবী। এই রাণীর গর্ভে মহারাজের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। যুবরাজ যক্ষমল্ল ভাটগাঁ নগরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, যুবরাজ অনেক প্রজার প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। যক্ষমল্লের ভগিনী রাজকুমারী জীবরক্ষার সহিত রাজা ভৈরবের পরিণয় সম্পন্ন হয়। যক্ষমল্লের জ্যেষ্ঠপুত্র জয়ন্তরাজ ভাটগাঁর শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শিলালিপির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। বংশাবলীর মতে ১৪৫৩খ্রীঃ ভাটগাঁর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। যক্ষমল্লের মৃত্যুর পর নেপাল তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়।

শ্রীসূর্য্যবংশ প্রভবঃ প্রতাপঃ,
শ্রীপট্টবন্তঃ স্থিতিমল্লদেবঃ।
রাজল্লদেব্যাঃ পতিরিন্দুমূর্ত্তি,
তস্যাত্মজঃ শ্রীজয়ধর্ম্ম মল্লঃ॥২॥
তস্যানুজো গুণনিধিঃ সুকৃতৈকসিন্ধু,
ভ্রাতা তু মধ্যজবরো জয়জ্যোতিমল্লঃ।
তস্যানুজো মদনরূপসমানদেহঃ,
ভ্রাতা কনিষ্ঠো রুচিরো জয়কীর্ত্তিমল্লঃ॥৩৪॥
শ্রীজ্যোতিমল্ল-হৃদয়নন্দন-যক্ষমল্লঃ,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরবপুরতিমঞ্জুবাণীঃ।

ভক্তাপুরীনগর বাসিতসৌখ্যকারী,
দুর্ভিক্ষদুঃখভয়হারণ দেবমূর্ত্তিঃ ॥৮॥
জয়লক্ষ্যাঃ সুতঃ শ্রীমান্ সুনয়ঃ পুণ্যবৎসলঃ।
জয়ন্তরাজেতি বিখ্যাতো জয়লক্ষ্মীপতিঃ সুধীঃ॥৯
অনেন পুণ্যেন চ তস্য ভূযাৎ,
সহস্র বর্ষাযুরহার্য্য কীর্ত্তিঃ।
নরেশ্বরঃ শ্রীজয়জ্যোতিমল্লঃ,
সৎপুত্র পৌত্রৈঃ সহভৃত্যবর্গৈঃ ॥১০॥
সংবন্নেপালকাখ্যে ত্রিভুবনদহনে কামবাণে প্রযাতে,
মাঘে শুক্লে চ কামে তিথিবিদিতে,প্রীতিযোগে চ পুণ্যে।
বারে পূষাভিধানে, মকররবিগতে যুগ্মরাশৌ শশাঙ্কে,
শম্ভোঃপ্রাসাদশৃঙ্গে কনকময়ধ্বজং তত্র
সংরোহণংস্থাৎ" ॥১১॥

মহারাজজ্যোতিমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্তরাজ ভাটগাঁয় ও কনিষ্ঠ রত্নমল্ল কাটমাণ্ডু নগরে স্ব স্ব রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। শিলালিপির জয়ন্তরাজ বংশাবলীতে জয়রামমল্ল নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। এক্ষণে মল্লবংশের নামমালা ও আনুমানিক সময় নির্দ্দেশ করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহাদের নামাঙ্কিত শিলালিপির উল্লেখ করিব।

(মল্লবংশীয় নৃপতিগণ।)

জয়স্থিতিমল্ল (১৩৮০ ১৪০০ খ্রীঃ।
ধর্ম্মমল্ল (১৪০০-১০) | (১) জ্যোতিমল্ল (১৪১০-৪০) | কীর্ত্তিমল্ল
যক্ষমল্ল (১৪৪০-৬০) | জীবরক্ষা + ভৈবব

(১৪৬০-৮০) জয়ন্তরাজমল্ল (ভাটগাঁ) | রত্নমল্ল (কাটমাণ্ডু) (১৪৬০ ৮০)
(১৪৮০ ১৫০০) সুবর্ণমল্ল | সূর্য্যমল্ল (১৪৮০ ১৫০০)
(১৫০০-২০) প্রাণমল্ল | অমবমল্ল (১৫০০-২০) | নবেন্দ্রমল্ল (১৫২০ ৪০)
(১৫২০-৪০) বিশ্বমল্ল | মহেন্দ্রমল্ল (১৫৪০-৬০)
(১৫৪০ ৬০) ত্রৈলোক্যমল্ল | সদাশিবমল্ল (১৫৬০-৮০) | শিবসিংহমল্ল (১৫৮০-১৬০০)
(১৫৬০-১৬০০)(২) জ্যোতিমল্ল | হরিহরসিংহমল্ল (১৬০০-২০)
(১৬০০-৪০) নরেন্দ্রমল্ল (নরেশমল্ল) | লক্ষ্মীনৃসিংহমল্ল (১৬২০-৪০) | সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল (১৬২০-৬০)
(১৬৪০-৭০) জগৎপ্রকাশমল্ল | প্রতাপমল্ল (১৬৪০ ৯০) | শ্রীনিবাসমল্ল (১৬৬০ ১৭০১)
(১৬৭০ ৯০) জিতামিত্র মল্ল | পার্থিবেন্দ্র মল্ল(১৬৯০-৯১) | নৃপেন্দ্রমল্ল | মহীন্দ্রমল্ল (১৬৯১-১৭০৮) | চক্রপতীন্দ্রমল্ল | যোগনরেন্দ্র মল্ল (১৭০১-২০)
(১৬৯০ ১৭৩০)ভূপালেন্দ্রমল্ল | ভাস্করমল্ল (১৭০৮-২৮) | যোগমতী
(১৭৩০-৪০) রণজিৎমল্ল | জগজ্জয়মল্ল(১৭২৮-৪৮) | লোকপ্রকাশমল্ল (১৭২০-৩০) | যোগপ্রকাশ (১৭৩০ ৪০) | বিষ্ণুপ্রকাশ

রাজেন্দ্রপ্রকাশ | জয়প্রকাশ (১৭৪৮-৬৮ খ্রীঃ) | রাজ্যপ্রকাশ | নরেন্দ্রপ্রকাশ | চন্দ্রপ্রকাশ
কন্যা
(১৭৪০-৫০)বিশ্বজিৎমল্ল
(১৭৫০-৬০) তেজনরসিংহমল্ল

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভক্তির জয়।

(১)

কৌমুদী-বসন পরি
চারুচন্দ্র শিরে ধরি
বসন্ত যামিনী,
ঝিল্লীর মধুর রবে
গায়িছে আনন্দে ওই
আনন্দ রূপিনী।
চৌদিকে সহস্র ফুল
মল্লিকা চামেলী যুঁই
রয়েছে ফুটিয়া,
মন্দ মন্দ গন্ধবহ
সুগন্ধ নিশ্বাস ছাড়ি
চলিছে বহিয়া।
অদূরে রজত গঙ্গা
সুধা প্রবাহিনী রূপে
মোহিয়া নয়ন,
তরল তরঙ্গে রঙ্গে
মৃদু কুলকুল স্বরে
করিছে গমন।
নিস্তব্ধ প্রাণীর কণ্ঠ
নিদ্রার কোমল অঙ্কে
সুপ্ত ধরাতল,
পড়িছে শিশির বিন্দু
নবদূর্ব্বাদলে যেন
মুকুতা উজ্জল।
সম্মুখে জাহ্নবী ওই
পশ্চাতে কুটীর, ঊর্দ্ধে
অনন্ত আকাশ,
বিমল-চন্দ্রিকা স্নাত
যোগমগ্ন মহাযোগী
সাধু হরিদাস।

শুভ্রবেশ শুভ্রকেশ
শুভ্র শ্রীমুখের জ্যোতি
শুভ্র চন্দ্রিকায়,
নিস্পন্দ প্রকৃতি পরে
যেন রজতের গিরি
ওই দেখা যায়।

(২)

হেন কালে শুন ওই
মধুর শিঞ্জিত যেন
নূপুর-নিক্কন,
আসিছে কামিনী এক
অনঙ্গ মোহিনী রূপে
মোহিয়া নয়ন।
বিলাস বিলোল নেত্রা
মন্থর গামিনী ওই
গুরু নিতম্বিনী,
উছলি উছলি যেন
পড়িছে রূপের স্রোত
সুচারু হাসিনী।
বঙ্কিম কটাক্ষ ভঙ্গি
যৌবন মদিরা মাখা
বদন কমল,
উন্মত্ত কত লোক
পান করি হায় ওই
রূপের গরল।
সমাধি ভঙ্গের তরে
প্রেরিয়াছে দুষ্ট লোক
সাধুর সদন,
তাই ওই বিলাসিনী
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে
বলিছে বচন।

"বলি ওগো সাধুবর
শুনিয়াছি তুমি নাকি
দয়ার সাগর ?
সকলেরই ইচ্ছা নাকি
পূর্ণকর তুমি, আমি
শুনি নিরন্তর !
তাই এই ভিক্ষামাগি
পূর্ণকর অভিলাষ
ওহে মহাজন,
নিতান্ত বাসনা মম
অদ্য তব সহ নিশা
করিব যাপন।"

(৩)

ভাঙ্গিল ধেয়ান, সাধু
মেলিল নয়ন, দেখি
বারবিলাসিনী,
একবিন্দু অশ্রু তাঁর
করুণ নয়ন হতে
ঝরিল অমনি।
একটি নিশ্বাস হায়
মিশিল নিশার বায়
মুহূর্ত্তের পরে,
হৃদয় সমুদ্র আজি
হইয়াছে উচ্ছ্বসিত
যেন কার তরে।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে
অতি মৃদু মৃদু স্বরে
বলিল বচন,
"প্রতীক্ষা করগো শুভে!
ধ্যান সমাপিয়া আসি
করি সম্ভাষণ।"
বলিয়া মহান ধ্যানে
বসিলেন মহাযোগী
মগ্ন জ্যোছনায়
নিস্তব্ধ প্রকৃতি যেন
বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে
অনিমেষ চায়।

(৪)

তৃতীয় প্রহর নিশা
সুদূর বিলম্বী ওই
পূর্ণ শশধর,
শব্দহীন বসুন্ধরা
শান্তির কোমল ক্রোড়ে
কেবা মনোহর !
ক্বচিৎ শ্বাপদ শব্দ
ক্বচিৎ পেচকরব
পক্ষ-বিধূনন,
স্তব্ধতার রাজ্যে যেন
বিদ্রোহী প্রজার দল
করে কুমন্ত্রণ।
সম্মুখে বসিয়া ওই
বিস্ময়ে হেরিছে সেই
বারবিলাসিনী,
দর দর অশ্রুরূপে
ছুটিছে যোগীর নেত্রে
প্রেমমন্দাকিনী।
এখনো ধেয়ান তার ভাঙ্গে
নাই, ভাঙ্গিবে কি ?
সে যে সেথা নাই,
প্রেমের অনন্ত রাজ্যে
পশিয়াছে, পুলকিত
দেহখানি তাই।
যথায় কালিন্দী তীরে
বাঁকা শিখিপাখা শিরে
রাধিকার মন,
মোহন মুরলী করে
বাজাইত মৃদু বেণু
মুরলী মোহন ;

শুনিয়া বাঁশীর রব
গাভী বৎস আদি সব
আসিত ছুটিয়া,
ময়ূর ময়ূরী সনে
নাচিত তমাল বনে
পুচ্ছ বিস্তারিয়া;
মিলি যত গোপবধূ
ছুটিত আকুল প্রাণে
মঞ্জু কুঞ্জবনে,
উছলি যমুনা জল
ছল ছল কল কল
ছুটিত উজানে;
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
হইয়া আপনা হারা
অনিমেষ চায়,
হেরি প্রকৃতির পতি
আনন্দে প্রকৃতি সতী
পুলকিত কায়!

সেই মধু বৃন্দাবনে
বিরাজে ভকত চিত
বঁধুয়ার সনে,

পরাণে পরাণে বান্ধা
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা
নয়নে নয়নে!

তাই সর্ব্ব কলেবরে
রোমাঞ্চ উঠিছে তার
পুলক-বিহ্বল!

তাই বুঝি ঝরিতেছে
প্রেমমন্দাকিনীওই
নয়নের জল।

বিস্ময়ে চাহিয়া আছে
চিত্রার্পিত যেন ওই
বারবিলাসিনী,

হৃদয়ে কি বাজিয়াছে?
নয়নে কি লাগিয়াছে?
কি ভাবিছে ধনী?
ত্রিযামা বিগত প্রায়
চন্দ্র অস্তাচলে যায়
পশ্চিম গগনে,
উদিয়াছে শুক তারা
বিহঙ্গ কাকলী রব
ছুটিছে কাননে।
রক্তিম-কপোলা উষা
পূর্ব্বাসার দ্বার খুলি
নামিতেছে ধীরে,
বহিছে প্রভাতী বায়ু
ফুটিছে প্রভাতী ফুল
সরসীর নীরে।
মঙ্গল আরতি করি
বন্দি চরণারবিন্দ
বিহ্বল হৃদয়,

শ্যামাম্বরা বসুন্ধরা
চুম্বি রশ্মিদল, দেখে
সূর্য্যের উদয়।

দেখিতে দেখিতে ওই
দ্যুতিমান অংশুমালী
বিরাজে গগনে,

দেখিতে দেখিতে ছুটে
কিরণ সমুদ্র প্লাবি
সকল ভুবনে।

ধ্যানমগ্ন হরিদাস
সূর্য্যরশ্মি আলোকিত
প্রশান্ত বদন,

দেখিয়া গণিকা সেই
সহিতে না পারি উঠে
করিয়া ক্রন্দন।

উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে কাঁদে
দু নয়নে বহিতেছে
শ্রাবণের ধারা,
হৃদয়ের উৎস আজি
ছুটিয়া গিয়াছে, কাঁদে
পাগলিনী পারা।
যেন শত আশীবিষে
দংশে মর্ম্মস্থল তার,
তীব্র হলাহল,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে খেলিতেছে,
কাঁদিতেছে অভাগিনী
তাই অবিরল।

(৬)

দ্বিতীয় প্রহর বেলা
বসি সাধু হরিদাস
আপন কুটীরে,
সম্মুখে ভাসিছে এক
দীন হীনা অভাগিনী
নয়নের নীরে।

মুড়ায়েছে চারু কেশ
ছিঁড়িয়াছে চারু বেশ
পরিয়াছে চীর,
যৌবনে যোগিনী বালা
সাজিয়াছে ভিখারিণী
রহস্য গভীর!
ইঙ্গিতে, জাহ্নবী নীরে
স্নান করি প্রণমিল
সাধুর চরণে,
করুণায় আর্দ্র হয়ে
হরিনাম মন্ত্র সাধু
দিলেন তখনে।
ওই শুন স্বর্গ ধামে
বাজিছে দুন্দুভি, শত
দেব কণ্ঠে বয়,
"জয় জয় হরিদাস
ভক্ত চূড়ামণি, জয়
ভকতির জয়।"

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সেন।

রাজা রামমোহন রায়। * (১)

রাজা রামমোহন রায়—ভারতের গৌরব-স্থল। পৃথিবীর মহাজনগণের তিনি অন্যতম। তাঁহার অসাধারণ গুণ। এ সকল চিরবিদিত, সর্ব্ববাদিসম্মত। তথাপি একটা কথা উঠিয়াছে, রাজা রামমোহন রায়, গ্রাম্য বিরোধে প্রলিপ্ত থাকিতেন কি না; তাঁহার কোনরূপ অত্যাচার বা অবিচার ছিল কি না; দলাদলিতে তাঁহার কত দূর অনুরাগ সম্ভব, এই সন্দর্ভে তাহাই আলোচ্য বিষয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের "সাহিত্যে" "রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল" প্রস্তাব লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগকে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে হইতেছে। তাঁহার ঐ প্রবন্ধ প্রচার জন্যই এই বিষয় উত্থাপিত

* যে কারণে এই প্রবন্ধ, "সাহিত্যে" মুদ্রিত হইল না, এস্থলে তাহার নির্দ্দেশ আবশ্যক। চৈত্রে ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ নিঃশেষ করা আবশ্যক, এই কারণে "সাহিত্য" পত্রে ইহা মুদ্রিত না হইবার প্রধান হেতু। দ্বিতীয় হেতু, প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের ইচ্ছা, উহা ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেই প্রকাশোপযুক্ত হয়। তৃতীয় হেতু, বিলম্বে প্রবন্ধটী লিখিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণের খণ্ডন করিবার প্রয়োজন নাই। প্রবন্ধটী যে ধরণের, তাহাতে উহা দীর্ঘ না হইলেই নয়। তৃতীয় কারণের উত্তর পাঠকগণ, প্রবন্ধ মধ্যেই পাইবেন।—প্রবন্ধলেখক।

হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে এ কথার কোন জল্পনা কল্পনাই ছিল না। আলোচনার সুবিধার্থে ও সুমীমাংসার নিমিত্তে অগ্রেই বটব্যাল মহাশয়ের বক্তব্য অংশের আদ্যোপান্ত প্রতিলিপি প্রদান করা কর্ত্তব্য; তৎপরে তৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশিত হইলে, পাঠকগণ, প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বটব্যাল বাবু লিখিয়াছেন,—

"মহাত্মা রামমোহন রায়কে বাড়াইতে গিয়া,তাঁহার জীবন-চরিত-লেখক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়,অপর এক জন নিরপরাধী মৃত ব্যক্তির নামে কলঙ্ক দিয়াছেন। বোধ হয় অনবধানতা-বশতঃ, অথবা ভ্রান্তিমূলক কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করাতে, এইরূপ ঘটিয়াছে।

"উক্ত জীবনচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছেঃ—

'কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ হাজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপতি হয়, রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া সে ব্যক্তি তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বটব্যালের লোক সকল অতি প্রত্যূষে আসিয়া রামমোহন রায়ের বাটীর নিকট ক্রমাগত কুক্কুট-ধ্বনি করিত, এবং সন্ধ্যার পর তাঁহার অন্তঃপুরে গো-হাড় প্রভৃতি পদার্থ নিক্ষেপ করিত। এই প্রকার অত্যাচার দ্বারা পরিবারগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের অসাধারণ ধৈর্য্য কিছুতেই পরাভব মানিল না। কোন প্রকার প্রতিহিংসা করা দূরে থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই সদ্ভাব দ্বারা অসদ্ভাবকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার মিষ্ট কথায় ও সদুপদেশে তাহারা ভুলিবার লোক ছিল না। বরং তাঁহাকে একান্ত ধৈর্য্যশীল দেখিয়া উৎপাত আরো বৃদ্ধি করিয়াছিল। পরিশেষে আপনা আপনি সকলই থামিয়া গেল।'

"চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উপরি উক্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে যাহা শুনা যায়, তাহাতে উল্লিখিত চিত্রটি নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়। রায় বংশের সহিত বটব্যাল বংশের দলাদলির অনেক কথা। সে সমুদায় এখানে লেখা অনাবশ্যক। উভয় বংশই খানাকুল কৃষ্ণনগরের আদিম-নিবাসী নহেন। প্রথম, বটব্যাল বংশের আদি পুরুষ খানাকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ বর্দ্ধমান রাজ সরকারে চাকুরি করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে ধনশালী হয়েন এবং সমাজে তৎকালোচিত সৎকার্য্যাদি দ্বারা প্রচুর মান সম্ভ্রম উপার্জ্জন করেন। ঐ সময়ে রায় বংশের আদিপুরুষ রাধানগরে আসিয়া বাস করেন। ক্রমে তাঁহারা বংশপরম্পরায় উন্নত হইয়া দেশে মান সম্ভ্রম স্থাপনের জন্য যত্নবান্ হয়েন এবং কৃষ্ণনগর অঞ্চলে একটি দলের সৃষ্টি করেন।

"রাজা রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায়, বর্দ্ধমান রাজসংসারে ইজারা ইত্যাদিতে অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েন। রামজয় বটব্যাল তৎকালে রাজসংসারে এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকায়, ঐ টাকা আদায়ের তদ্বিরের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ঐ টাকা আদায়ের যত্ন করায়, এবং ইজারা হইতে অপসৃত করায়, রামজয়ের উপর রায়বংশের ক্রোধ জন্মে। এই সময়েই প্রথমে রায় ও বটব্যাল বংশের মধ্যে শত্রুভাব সূত্রপাত হয়। বৃদ্ধগণের মুখে ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া শুনা যায়। রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া দলাদলির সূত্রপাত হয় নাই।

"রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যালের মধ্যে কে কাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, হুগলির বিচারাদালত সমূহের নথি অনুসন্ধান করিলে, তাহার কতক কতক নিদর্শন আজিও পাওয়া যাইবে। নিম্নে একটি সুরশালার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,

"২৪১ নং। ৪৯ কানুন। জেলা হুগলির জজ শ্রীযুক্ত ওকিলী সাহেব। ১৮১৮।১৫ এপ্রেল। বাদী রামজয় বটব্যাল। প্রতিবাদী রামমোহনরায়, বাদীর আরজি এই যে,প্রতিবাদী রামমোহন রায় ১২২১ সালে লাট-মজকুর পত্তনী তালুক খরিদ করিয়া ১২২২ সালের ২০ এ অগ্রহায়ণ তারিখে তালুকদার রামমোহন রায় ও উহার নায়েব জগন্নাথ মজুমদার এক শতের অধিক লাঠিয়াল লোক লইয়া দলাদলির আখেজে দাঙ্গা হাঙ্গামা

দ্বারায় রামনগর গ্রামের ৭৯/২।০ বিঘার মধ্যে ৫১৸১০ ফসল ও মৌজে বিল্লক গ্রামে ১০/১ ও দাইনান গ্রামে ৮।।৪ বাগানের আম্র ইত্যাদি ১৭৫ টা গাছ কাটিয়া ৭০।। বিঘা জমি হইতে বেদখল ও আবাদী ধান্য ফসল লুটতরাজ করে। একারণ ২০৯২৲ টাকার দাবিতে নালীশ।''

"এই মোকদ্দমায় জজ আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে বাদী ডিক্রি পাইয়াছিলেন।*

"ইহার উপর টীকা টিপ্পনি করা আমরা অনাবশ্যক বোধ করি। কেনন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে খর্ব্ব করা আমার অভিপ্রায় নহে। তিনি যে সকল গ্রাম্য-কলহে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রামের লোক এখনও বিস্মৃত হয় নাই, কিন্তু সে সকল কথা এক্ষণে প্রচার করায় কাহারও কোন ফল নাই। তাঁহার সৎকার্য্য ও সদভিপ্রায় সকলই আমাদের স্মরণীয় হওয়া উচিত। তাঁহার জীবন-চরিত-লেখক মহাশয় যদি অনর্থক ৺রামজয় বটব্যালের উপর কলঙ্ক দিয়া তাঁহাকে বাড়াইবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে এই প্রতিবাদ আবশ্যক হইত না। গ্রন্থকার মহাশয় যদি রামজয়কে চিনিতেন, তাহা হইলে, যেরূপ অমর্য্যাদার সহিত তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঘটিত না। আর প্রকৃত পক্ষে রামজয়, রামমোহনের উপর উৎপাত করা দূরে থাকুক, রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।" (১)

"সাহিত্যে" ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তাহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। কাশীপুরের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় উমেশচন্দ্র বাবুর প্রযত্নে ঐ বৃত্তান্ত মুদ্রিত হয়। তৎপরে ইণ্ডিয়ান্ মিরারের সংবাদ স্থলেও উহা পরিগৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর "ভারতীতে" (২) শ্রীমান্ বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম-এ উহার প্রতিবাদ করেন। তাহাতে সকল কথা খণ্ডনের চেষ্টা ছিল না। আমরা রামমোহনের সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা কথা নানা পত্রিকায় লিখিতেছি, এই কারণেও অধিকাংশ লোকের অনুরোধে উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। কেবল অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়াই লেখনী ধারণ করি নাই। এ সম্পর্কে আমাদের কর্ত্তব্য বোধ হওয়াতেও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার আবশ্যকতা হইল।

বটব্যাল মহাশয়, যে ভাবে যে ভাষায় রামমোহন রায়কে চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত ও অনুপযুক্ত।

এই ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রেই দুইটী কথা ব্যক্ত করা সঙ্গত মনে করি।

(১ম) কি বিদ্যা-বুদ্ধি, কি শাস্ত্রজ্ঞান, কি পদ-মর্য্যাদা, কি বিষয়-বিভব কিছুতেই রামমোহন ও রামজয়ের তুলনাই হয় না। (২য়) বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক, রামমোহন রায়ের দল-ভুক্ত ব্যক্তি, ইহা যেন কেহ মনে স্থান না দেন। তিনি তন্মতাশ্রয়ীও নহেন। অতএব এরূপ লোকের কথা এস্থলে গ্রহণীয় হইবার যোগ্য। কেবল তাহাই যথেষ্ট নয়। আমরা তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছি।

১। এ বিষয়ে আমরাও উমেশচন্দ্র বাবুর ন্যায় বলি যে, "স্থানীয় প্রাচীন লোকের নিকট যাহা শুনা যায়, তাহাতে উল্লিখিত চিত্রটি (উমেশচন্দ্র বাবুর বর্ণনা) নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক।" যাঁহারা প্রাচীন বিষয়ের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা এখনও বলেন, রামজয় বড়ালই(৩) অত্যাচারী। তিনি একে তো বর্দ্ধ-

* "এই বিবরণ ও ফয়সালার নকল রামজয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বটব্যাল আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

(১) সাহিত্য, ১৩০১ সাল, অগ্রহায়ণ।

(২) ভারতী, ১৩০১ সাল, পৌষ মাস।

(৩) এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, রামজয়ের উপাধি "বড়াল" ছিল—"বটব্যাল নয়। সুতরাং আরজিতে আমাদের সন্দেহ হয়। কেননা আরজিতে রামজয় "বটব্যাল" দেখিতেছি, রামজয় 'বড়াল' দেখিতে

মান-রাজগোষ্ঠীর কর্ম্মচারী, এ কথা উমেশচন্দ্র বাবুও স্বীকার করেন। সেই বর্দ্ধমান-রাজ-গোষ্ঠীর সহিত রামমোহনের পিতার (রামকান্ত রায়ের) সম্প্রীতি থাকা দূরে থাকুক, বরং অপ্রীতিই ছিল। রামজয় এই পরাক্রান্ত প্রভুর কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সুতরাং দুর্দ্দান্ত ও উৎপীড়ক। তাহাতে আবার স্বপ্রদেশে রায়গোষ্ঠীর প্রাধান্যে ঈর্ষ্যান্বিত। অতএব উৎপীড়ন ও অত্যাচার, কাহার পক্ষে সম্ভব, তাহা সকলের জ্ঞান-গোচর হউক। তবে আমরা স্বীকার করি, রামমোহনের নায়েব জগন্নাথ মজুমদার অত্যাচারী ছিলেন। এই বটব্যাল বাবুর "সাহিত্যে" এই প্রস্তাব প্রচারের বহুপূর্ব্বে এই "সাহিত্য" পত্রেই(৪) তাহা স্বীকার করিয়াছি।

জমিদারী কার্য্যে জগন্নাথের অতুল ক্ষমতা ছিল। স্বয়ং রামমোহন রায় তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। কর্ম্মচারীকে প্রভু ভয় করেন, এটা অনেকেই অদ্ভুত কথা ভাবিবেন। জগন্নাথ, রামমোহনের পিতার আমলের কর্ম্মচারী; সেই হেতু তাঁহার প্রতি প্রভুর কতক সম্ভ্রম ছিল। একদা জগন্নাথ মজুমদারকে রামমোহন রায় ডাকাইয়া পাঠান। উহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। বিব্রত লোকের প্রার্থনায় রাজা, তাঁহাকে তলব করিতে বাধ্য হন। রামমোহন কলিকাতায় অবস্থিত; আর সে ব্যক্তি খানাকুল কৃষ্ণনগরে থাকিত। সে ব্যক্তি শিবিকারোহণে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার ভীমাকৃতি ও স্থির-মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। জগন্নাথের গম্ভীর প্রকৃতি বার বার তাঁহার মনে উদিত হওয়াতে, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথকে কিয়দ্দূরে দেখিতে পাইয়া সমীপস্থ লোকদিগকে বলিলেন—"বেটার চেহারা দেখ্‌ছ। বেটাকে দেখ্‌লেই ভয় হয়। কি বল্‌ব?" এই সকল কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সে ব্যক্তি নিকটস্থ হইয়া কহিল, "কি জন্যে ডেকেছেন? আপনি বিদ্যে করেছেন, তাই ক'রে যান। যার তার কথা শুন্‌বেন না, তাতে বিষয় বিভব রক্ষা হবে না"। রামমোহন কেবল বলিলেন, "তুমি অত্যাচার কর, শুন্‌তে পাই"। ইহার উত্তরে তিনি শুনিতে পাইলেন, "অত্যাচার অতঃপর আর শুনিতে পাইবেন না।"

কিছুপরেই ইহার প্রসঙ্গ বলিতে হইবে।

২। "বটব্যাল বংশের আদিপুরুষ খানাকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ, বর্দ্ধমান-রাজসংসারে চাকুরি" করিতেন। লেখায় লোকে ভাবিতে পারেন, ঐ বংশীয়গণ যেন ক্রমান্বয়ে ঐ কর্ম্ম করিয়া আসিতেন। প্রকৃত কথা কিন্তু তাহা নয়। এস্থলে বলা উচিত মনে করিতেছি যে, বড়ালবংশের আদি পুরুষ কে, তাহা লিখিত হয় নাই। মৎসম্পাদিত "পুরোহিত" (৫) পত্রে আমরা খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের ইতিবৃত্তের একাংশে ঐ বংশের যে বর্ণনা করিয়াছিলাম, তাহা হইতে চিত্রপ্রদর্শনবৎ তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, কে কে বর্দ্ধমান-রাজসংসারে কর্ম্ম করিতেন,—

কোন সংশয় হইত না। আমরা স্বচক্ষে ঐবংশের অনেক প্রাচীন দলিল দেখিয়াছি, তৎসমুদায়ে "বড়াল" লেখা আছে। ঐতিহাসিক তত্ত্বের জন্যই এ কথার অবতারণা।

(৪) সাহিত্য, ১২৯৮ সাল, ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত "রামমোহন রায় সম্বন্ধে কয়েকটী অজ্ঞাত বৃত্তান্ত" প্রস্তাব দেখ।

(৫) পুরোহিত, ১৩০১ সাল, বৈশাখ মাস, ২৫-৩১ পৃষ্ঠা দেখ।
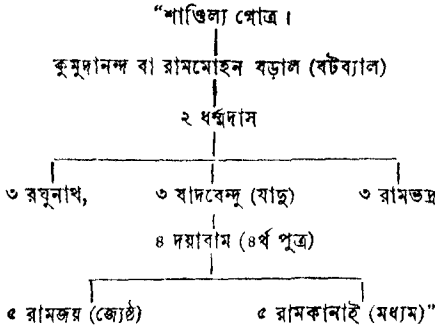
আদিপুরুষ কুমুদানন্দ বা রামমোহন বড়ালের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ যাদবেন্দু, চতুর্থ পুরুষ দয়ারাম, তদীয় তনয় রামজয়, যাদবেন্দুর ভ্রাতুষ্পুত্র সাহেবরাম, এই চারিজন বর্দ্ধমান রাজ-সংসারে কর্ম্ম করিতেন। সুতরাং সকলেই দেখিলেন, রাজ-সংসারে তিন পুরুষ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। প্রথম দুই পুরুষ বর্দ্ধিষ্ণু ছিলেন না।

২। "মান সম্ভ্রম স্থাপন করিতে তাঁহাদিগকে (রায়-বংশকে) যত্নবান্" হইতে হয় নাই। তাঁহারা পূর্ব্বাবধিই মানী, জ্ঞানী, ধনী ছিলেন।

৩। যে সময় "রায়-বংশের আদিপুরুষ রাধানগরে আসিয়া বাস করেন" বলিয়া উমেশচন্দ্র বাবুর সংস্কার, তাহা ভুল। যদি পুরুষ ধরিয়া মিলান যায়, তাহাতেও উহা ঠিক্ হয় না। এক বংশের মধ্যেই ভ্রাতুষ্পুত্র, পিতৃব্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্রও, পিতামহ-পর্য্যায়ের লোক অপেক্ষা বয়সে বড়। সকল স্থলেই ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। অধিক কি, তাঁহাদের বংশেও, তাহাদের নিজ-শাখাটী যত বিস্তৃত, তিনি যে রামজয়ের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের শাখা, তদপেক্ষা অল্প-প্রসর। তাঁহাদের বংশ তালিকা দেখিলেই, চক্ষু কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইবে।

৪। রামজয়, রাজা রামমোহনের সমসাময়িক। কিন্তু তিনি রাজা রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের সমসাময়িক নন। উমেশচন্দ্র বাবু এখনও ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন, আমাদের উক্তি সত্য কি না অবগত হইতে পারিবেন। পিতৃ-বর্ত্তমানে জমিদারীর কার্য্য-পরিদর্শন করিবার অধিকার, রামমোহনের হয় নাই। দেব-দেবীর অভক্ত হওয়ায়, প্রতিমা-পূজার প্রতিবাদ করায়, তিনি পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। রামমোহন ও তৎকর্ম্মচারী জগন্নাথ মজুমদার, রামজয় বটব্যালের সাময়িক লোক, তাহার নিদর্শন-জন্য আমরা বটব্যাল মহাশয়ের অবলম্বিত নথিই প্রমাণ-স্থলে গ্রহণ করিতেছি।

৫। রামজয়, রামমোহনকে "ইজারা হইতে অপস্থত" করেন নাই(৬)এবং তন্নিবন্ধন "রায়-বংশের ক্রোধ জন্মে" নাই। রায়বংশের যে শাখায় এই প্রবন্ধ-লেখক অন্তর্গত, তাঁহাদের স্বতন্ত্র দল। সেই দলের সহিত বটব্যালদের বরাবর সম্প্রীতিই ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে। এ কথার তত্ত্ব তিনি এখনও বৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমাদের উক্তির সপক্ষেই প্রমাণ পাইবেন।

৬। উমেশচন্দ্র বাবু মাজিষ্ট্রেট্। তিনি বিচারক হইয়া কি কেবল নথির উপর নির্ভর করিয়া ডিক্রী-ডিস্‌মিস্ করেন ? রামজয়ের পক্ষে ডিক্রী দিয়া রামমোহনকে হারাইয়া দেওয়ায়, সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। রায়-ফয়সালা উদ্ধৃত করিতে পারিলে, বরং উমেশচন্দ্র বাবুর কথা বিবেচ্য হইতে। তৎপরে ইহাই বিচার্য্য বিষয়ের অন্তর্গত হইত যে, উহা গ্রহণীয় কি না—উহাকে প্রামা-

(৬) ইহার বিবরণ, পাঠক মহাশয় পশ্চাৎ দেখিতে পাইবেন।

ণিক ঘটনা আছে কি না। কেন না, প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা গিয়াছে, অসত্য মোকদ্দমারও বিচারালয়ে জয় হয়। আর, যখন এখানে রায়-ফয়শালারই অভাব, তখন তাঁহার কথা বিচারাধীন হওয়ারই অযোগ্য। অতএব উমেশ চন্দ্র বাবু সাধারণের নিকট রামমোহনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহা অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য হইল।

৭। "হুগলীর বিচারাদালত সমূহের নথি অনুসন্ধান" না করিয়াই কেবল মুখে বা লেখায় রাজা রামমোহনের অত্যাচার অথবা অন্যায্য ব্যবহারের উল্লেখ করাতে, লোকে ঐ প্রবন্ধ-লেখককেই হেয় জ্ঞান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার কথায় ভাল ভাল লোকে আস্থা স্থাপন করিবেন কেন? তিনি রামমোহনকে যে ভাবে যে ভাষায় সাধারণ-সমীপে প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বা তাঁহার মত শিক্ষা-প্রাপ্ত উপযুক্ত লোকের সমুচিত কার্য্য হয় নাই।

৮। "এই মোকদ্দমায় জজ্-আদালতে ও সদরদেওয়ানী-আদালতে বাদী, ডিক্রী পাইয়াছিলেন" এইটী লিখিয়াই মাজিষ্ট্রেট্ উমেশ-চন্দ্র বাবু সন্তুষ্ট! কি প্রকার ডিক্রী, তাহার কিছুমাত্র নির্দ্দেশ দেখিলাম না। রামজয় যদি ডিক্রীই পাইয়া থাকেন, তবে তাহা টাকারই ডিক্রী হইবে। কিন্তু আরজিতে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামের কথা দেখিতেছি, তজ্জন্য অবশ্যই ফৌজদারীতে অভিযোগ হইয়া থাকিতে পারে। লেখক মহাশয়, অবশ্যই জানেন—দেওয়ানী আদালতে ফৌজদারী কাণ্ডে উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট নয়। তাহার জন্য ফৌজদারিতে স্বতন্ত্র নালিশ করিতে হয়।

৯। উক্ত মোকদ্দমা যদি রীতিমত চলিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রামমোহন রায়ের পক্ষ হইতে কোন না কোন জবাব দাখিল হওয়ার কথা। দলাদলির নিমিত্ত রামমোহন, লুটতরাজ করিয়াছিলেন বলিয়া, আরজিতে যে উল্লেখ রহিয়াছে, বিচারপতি তাহার কোন 'ইস্যু' ধার্য্য করিয়াছিলেন কি না, ইহাও জানা আবশ্যক।

১০। আর এক কথা। যদি বাদী রামজয় ডিক্রীই পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও, কি তাঁহার বর্ণিত প্রতি কথাই সত্য হইবে? অর্থাৎ আরজিতে যে "দলাদলি" উল্লিখিত, তাহার প্রত্যেক অক্ষর কি ঠিক্? যদি রামমোহন, ক্ষতি-পূরণের দায়ী হইয়া থাকেন, তবে প্রমাণিত হইবে,—"দলাদলির আথেজে কি লুটতরাজ" হইয়াছিল? এ সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র বাবুর প্রমাণ নিতান্তই ক্ষীণ। তাঁহার পুঁজির মধ্যে রামজয় বটব্যাল মহাশয়ের পক্ষীয় আরজি। তাহাই তাঁহার অবলম্বন—তাহাই তাঁহার একমাত্র সম্বল। এই অতি-মাত্র অপ্রবল বস্তুর আশ্রয়ে এক মহতের অপবাদ করা, আর ভেলা লইয়া সাগর পার হওয়া, উভয়ই তুল্য বিষয়।

১১। "রাজা রামমোহন রায়, গ্রাম্য কলহে" কখনই স্বয়ং সংসৃষ্ট থাকিতেন না—কদাচ ঐরূপ ব্যাপারে তিনি লিপ্ত ছিলেন না। তবে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ বাবুর সহিত দেওয়ানী মকদ্দমা চলিয়াছিল। তাহাও তাঁহার কর্ম্মচারীর দোষেই ঘটিয়াছিল। এখানে একটা তর্ক উঠিতে পারে। রাজা রামমোহন কি কারণে সেই উৎপীড়ক কর্ম্মচারীকে অপসৃত করেন নাই? ইহার উত্তর উপস্থিত মত লিখিয়া দিলে, তাহা মনঃকল্পিত, যদি কাহারও এরূপ সন্দেহ হয়, তাই সকলেরই মনঃপূত করিবার উদ্দেশে আমরা এই উপস্থিত প্রতিবাদের

বর্ষাবিক কালের লিপি হইতে কতক কতক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"জগন্নাথ নামে তাঁহার এক উগ্রপ্রকৃতি নায়েব ছিল। সে প্রজাদের ও তাঁহার জ্ঞাতিদের সহিত সদ্ব্যবহারের পরিবর্ত্তে বিপরীতাচরণ করিতে ভাল বাসিত। বিষয়-কর্ম্মে সে অতিশয় নিপুণ ছিল। বয়সে ও কার্য্যে তাহার প্রবীণতা জন্মিয়াছিল বলিয়া, তাহাকে সহসা কর্ম্মচ্যুত করা, তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হইত না। তিনি স্বয়ং জমিদারির জটিল ব্যাপার বুঝিতেন না। তদ্ভিন্ন, জগন্নাথ অনেক দিনের কর্ম্মচারী ও বিশ্বস্ত ভৃত্য, ইত্যাদি বিবিধ হেতু বশতঃ তাহাকে কিছু দিন রাখিতে হইয়াছিল। লোকে তাহার বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিত, তৎসমস্ত সত্য কিনা, রাজা সন্দেহ করিতেন। কিছু কাল পরে এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহাতে রামমোহনের ভ্রম-ভঞ্জন হইল, তাঁহার চক্ষুঃ-কর্ণের বিবাদ মিটিল।

"ঐ কর্ম্মচারী জগন্নাথ, সুপ্রিম কোর্টে এক মোকদ্দমার আপীল করিয়াছিল। ঐ মোকদ্দমাটী যাদবচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে চলিতেছিল। যাদবচন্দ্রের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। রাজা রামমোহন রায়, এই সময়ে মোকদ্দমা শুনিতে যাইতেন, প্রত্যেক বারে যাদবচন্দ্রকে ষোলটি টাকা দিতেন, আপন রুমালে তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিতেন। যাদবচন্দ্র এই মোকদ্দমার জয়ী হন। রামমোহন রায় মহাশয় শেষে বলেন, "চাকর আর ছেলের মধ্যে বিবাদ চল্‌ছিল। চাকর পরাস্ত হ'ল। ছেলের জেদ বাহাল হ'ল, ভালই হ'ল।' কি সাধুতা। নিজের পরাভবকে চাকরের পরাভব মনে করা ও প্রতিপক্ষ জেতাকে ধন্যবাদ প্রদান ও অর্থ সাহায্য করা লোকাতীত ক্ষমতা কি না, এই বিচারের ভার, পাঠকগণের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তদুপলক্ষে যে ভূমি হস্তভ্রষ্ট হইল বা যে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইল, তাহার ক্ষতিলাভ গণনা না করা কি সামান্য মনস্বিতার পরিচায়ক? জগন্নাথের ব্যবহার আমাদিগকে "চরিতাবলীর" একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—"যাহারা রাজসংসারে চাকরি করে, তাহারা প্রায় দুশ্চরিত্র হয়।" (৭)

(৭) সাহিত্য, ১২৯৮ সাল, ফাল্গুন মাস, ৬৩৫ পৃষ্ঠা।

১৩। বটব্যাল বাবু কি প্রমাণ-বলে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন যে, "জমিদারি হইতে রামমোহনকে অপসৃত" করা হইয়াছিল? কোন আদালতে ইহার কোন নজির আছে কি? রামমোহনের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ঐ জমিদারি রামমোহনের পৌত্রদ্বয়ের অধিকারে রহিয়াছে। রামজয় বটব্যালকে খর্ব্ব না করিলে, কি রামমোহনের মহত্ত্ব কমিয়া যাইত—লেখকের এ কথায় হাস্য-সংবরণ করা অসম্ভব। রামজয় বটব্যাল নির্গুণ মানব ছিলেন না। তিনি বদান্য পুরুষ ছিলেন, ইহা স্বীকার করি—

"রামজয়ের মত অল্প অন্নদাতাই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ ১০।১২জন অতিরিক্ত লোক লইয়া ভোজনে বসিতেন। রামজয়, নিজকন্যা নিমুর অতি সমারোহে পরিণয় ক্রিয়া সমাধা করেন।" (৮)

"তিনি একদা বর্দ্ধমান হইতে আসিতেছিলেন। পথে তাঁহার শিবিকাবাহকেরা তামাক খাইবার নিমিত্ত গৃহস্থ-বাটী হইতে প্রার্থনা করিয়া আগুন পায় নাই। পরে তাহারা বলে, আমরা "রামজয় বড়ালের বেহারা।" গৃহস্থেরা তাহাতেও কর্ণপাত করে না। গৃহস্থগণ বলিয়াছিল, 'রামজয় বড়াল আবার কে?" এই কথা শুনিয়া তিনি বেহারাদিগকে নিজ-গ্রামাভিমুখে যাইতে নিষেধ করিলেন, তাহাদিগকে বর্দ্ধমানের পথে পুনর্যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। তথায় গিয়া উপনীত হইলেন, রাজবাটীর সকলে তটস্থ হইলেন। কারণানুসন্ধানে সকলে তাঁহার অবমাননার বিষয় জ্ঞাত হইলেন। তৎপরে তিনি বর্দ্ধমান হইতে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে আসিবার পথের উভয়-পার্শ্বস্থ গ্রাম ইজারা লইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, নিজাধিকার ভিন্ন অপরের অধিকারে পদার্পণ করিব না। কেন না পরাধিকারে মান নাই।" (৯)

তিনি কেমন একগুঁয়ে ব্যক্তি ছিলেন, এখন তাহার পরিচয় পাইতে পাঠকের অব-

(৮) মৎ-সম্পাদিত পুরোহিত, ১৩০১ সাল, বৈশাখ।

(৯) পুরোহিত, ১৩০২ সাল, বৈশাখ মৎ-সম্পাদিত দেখ।

শিষ্ট নাই। ফলতঃ রামজয় বটব্যালের পক্ষীয় লোকদের রামমোহন-ভবনে গবাদির অস্থি (গোহাড়) নিক্ষেপ করা ও কুক্কুটধ্বনি করা যথার্থ ব্যাপার। ইহার বিষয় বহু বার ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট শ্রুত আছি। ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। রামজয় বটব্যাল, অন্য বিষয়ে গুণবান্ হইলেও অন্ততঃ এই বিষয়ে "নিরপরাধ" নন। বটব্যাল বাবুর স্মরণার্থে বলি, বটব্যালদের দল, দুর্দ্দান্ত-দুর্দ্ধর্ষ, ইহার সংবাদ প্রাচীনেরা এখনও রাখেন। এক প্রাণীরও মনে ইহা স্থান না পায় যে, আমরা রামমোহন রায়ের দোষ ও গুণ উভয়েরই সংবাদ রাখি। রামমোহন রায়ের দোষের প্রসঙ্গ দেখিয়া হয় তো কতিপয় লোক স্তম্ভিত হইবেন। একমাত্র জগৎপতি ভিন্ন মানব, যতই সগুণ হউন না কেন, তিনি কদাচ দোষ-সম্পর্করহিত—অপাপ-বিদ্ধ হইতে পারেন না। ফলে, আমরা তত্ত্ব-পদার্থের ক্রীত দাস, সত্যের অকপট ভৃত্য। আমরা লোকমাত্রেরই গুণ-পক্ষপাতী, সুতরাং দোষের বিষম বিপক্ষ। তজ্জন্যই সাধারণের গোচরে দুইটি মাত্র কথা বলিব।

(ক) "অনুসন্ধানে" রামমোহনের বেদে অনভিজ্ঞতা-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। (১০)

(খ) আইন দ্বারা সামাজিক প্রথা রহিত করার তিনি ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, ইহাও প্রদর্শিত করিতে বাকী রাখি নাই। ইহাতে সতীদাহের ইতিবৃত্তে তাঁহার অনেক গুরুত্ব কমিয়াছে। (১১)

(গ) ইতিহাস লিখিতে গিয়া সতীদাহে তাঁহার কত কৃতিত্ব তছিল, তাহা "প্রকৃতিতে" (১২) "সতীদাহের আমূল ইতিবৃত্ত" "বামাবোধিনী পত্রিকায়" (১৩) "কে সতীদাহ নিবারণ করেন" সন্দর্ভে "হিন্দুমেগাজিন্" (১৪) ও "জন্মভূমিতে" (১৫) "সহমরণ" প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে। উমেশচন্দ্র বাবু ও সাধারণ পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, আমরাই প্রথমে বটব্যাল-বংশের কীর্ত্তি-কলাপ, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মৎসম্পাদিত "পুরোহিত" পত্রে সর্ব্ব-সমক্ষে-ঘোষণা করিয়াছি। সুতরাং একের প্রতি অত্যাচার, দ্বেষ, অপ্রীতি,—অন্যের প্রতি পক্ষপাত, অতি ভক্তি ইত্যাদি,—আমাদের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না।

উমেশচন্দ্র বাবু অমূলক বিষয়ের অবতারণা না করিয়া যদি প্রমাণ-সহকারে সন্দর্ভ-রচনে অভিনিবিষ্ট থাকেন, সকলেই তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে। নচেৎ তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধ, সাংখ্যদর্শন প্রস্তাব, রূপ-সনাতন ও শ্রীচৈতন্যদেব ইত্যাদি সন্দর্ভবৎ তাহা সর্ব্বানুমোদিত হইবে না।

এত দিন ইচ্ছা করিয়া এ প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত ছিলাম। উমেশচন্দ্র বাবু শিক্ষিত ব্যক্তি। ইংরেজি শিক্ষিত হইয়াও বাঙ্গালায় তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন, ইহা আহ্লাদের বিষয়। তদ্ভিন্ন তিনি আমাদের অঞ্চলীয় লোক—উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। আমরা তদ্বংশের ঐতিহাসিক। নানা-হেতু-বশতঃ প্রতিবাদে অপ্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু নির্ভীক,

(১০) অনুসন্ধান, ১২৯৯ সাল, ১৫ই আষাঢ়।
(১১) ঐ ঐ ১৫ই শ্রাবণ।

(১২) প্রকৃতি, ১২৯৮ সাল, ২৭ শে ভাদ্র।
,, ,, ,, ৩ রা আশ্বিন।
,, ,, ,, ১০ই ,,
(১৩) বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৮ সাল, মাঘ মাস।
(14) Hindu Magazine, October, 1891, Vol. I, No. I, "Suttee & Ram Mohan Roy.
(১৫) জন্মভূমি, ১৩০০ সাল, ফাল্গুন মাস।

স্বাধীনচেতা, তত্ত্বপ্রিয়, প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য্য, নিরবচ্ছিন্ন গুণস্তুতি বা দোষ-ঘোষণা নয়। এ কারণ এই সকল কথা নিবদ্ধ করিতে হইল। অধিকতর অনুসন্ধান করিয়া যদি তিনি প্রবন্ধাদি রচনা করেন, বড়ই ভাল হয়। তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে তদীয় চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (১৭)

গো-বসন্তের চিকিৎসা।

পাস্তার্ অনুমোদিত টিকা-রস প্রস্তুত করণ প্রণালীর মূল,তীব্র রসকে ক্রমান্বয়ে ২০ ও ১২ দিবস ধরিয়া দিবারাত্রি ঠিক্ ৪২°।৪৩° সাণ্টি-গ্রাদ্ উত্তাপে রাখিয়া দেওয়া। গো-বসন্তের তীব্র-রস ২০ দিবস ৪২°।৪৩° উত্তাপে থাকিয়া এতাদৃশ হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয় যে,ইহা টিকা দিবার জন্য প্রথমতঃ ব্যবহৃত হইলে কোনই অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা থাকে না। "প্রথম টিকা-রসটী" (Premier Vaccine) ব্যবহৃত হইয়া গেলে,কয়েক দিবস পরে যদি "দ্বিতীয় টিকা-রসটী" (Deuxieme Vaccine) ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে এই রসের ব্যবহার দ্বারাও কোন ক্ষতি হয় না। ১২ দিবস ধরিয়া তীব্র রস (Virulent Virus) ৪২°। ৪৩° উত্তাপে রাখিলে "দ্বিতীয় টিকা-রস" প্রস্তুত হয়। যদি ৪২°।৪৩° উত্তাপের পরিবর্ত্তে কোন দিবস কোন সময়ে ৪১° বা ৪৪° উত্তাপ হইয়া পড়ে তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। ১২ দিবসের স্থানে যদি ১১ বা ১৪ দিবস ধরিয়া তীব্র রসকে ৪২°।৪৩° উত্তাপে রাখা যায়, তাহা হইলেও তীব্রতার পরিমাণ প্রায় একই প্রকারে হ্রাস হইবে। টিকা-রস প্রস্তুতের কারখানায় যতদূর সাধ্য সময় ও উত্তাপের মাত্রা ঠিক্ রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু মাত্রা যদি সামান্য পরিমাণে এদিক্ ওদিক্ হয়, তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। যেখানে সময় তিন ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট, সেখানে দুই চারি মিনিট্ এদিক্ ওদিকে ক্ষতি হয় না, কিন্তু তিন ঘণ্টার স্থানে এক ঘণ্টা বা বার ঘণ্টা হইলে চলিবে না। সেই মত, যেখানে উত্তাপের মাত্রা ৪২° নির্দ্দিষ্ট আছে, সেখানে ৩২° বা ৫০° উত্তাপ হইলে ক্ষতি হইবে, কিন্তু ৪১° বা ৪৩° হইলে ক্ষতি হইবে না।

সময় নির্দ্দেশের জন্য এলার্ম্ ঘড়ি ব্যবহার করা যাইতে পারে। উত্তাপ ঠিক্ রাখিবার জন্য এতুভ পাস্তর্ (Etuve Pasteur) নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রটী একটী আল্মারির আকারে নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে গ্যাসের আলোক-শিখা ও গরম জলের নল (worm) এমন ভাবে সাজান আছে যে, শীতাধিক্য হইলে শিখাটী স্বতঃই অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া নলের মধ্যস্থিত জলকে উষ্ণতর করিয়া দেয়। আবার গ্রীষ্মাধিক্য হইলে, জল ফাঁপিয়া একটী সূক্ষ্ম কাচের নলের মধ্যে ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে দেখা যায়। জলের উচ্চতা নিবন্ধন জলের নিম্নতলে চাপ্ অধিক হয়। নলের নিম্নপ্রদেশে একটী রবারের পটাহ আছে। এই পটাহে যে পরিমাণ চাপ্ লাগে, ইহা সেই পরিমাণে স্ফীত হয় এবং পটাহের অপর পৃষ্ঠার স্থান সঙ্কীর্ণ

করিয়া দেয়। এই স্থানটী গ্যাস্ যাইবার প্রণালী। যন্ত্রটী এমন চমৎকারভাবে গঠিত যে, অতি সামান্য গ্রীষ্মাধিক্য হইলেই দীপশিখার হ্রাস ও অতি সামান্য শীতাধিক্য হইলেই দীপশিখার বৃদ্ধি হইয়া, আপনা হইতে আল্মারির মধ্যস্থ শীতোত্তাপ দিবারাত্রি ঠিক্ একই রূপ রাখিয়া দেয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধার জন্য পাস্তার্ যে নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, এভুভ্-পাস্তার্ তন্মধ্যে একটী। জল বিশুদ্ধ করিবার যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাস্তার্-আবিষ্কৃত ফিল্টারের দ্বারা যত সহজে ও যত নির্দ্দোষভাবে জল পরিষ্কৃত হয়, এরূপ অন্য কোন উপায়ে হয় না। পাস্তারের এই দুইটী 'আল্গা'আবিষ্কারের দ্বারা নানাবিধ উপকার দর্শিতেছে।

ইউরোপের অনেক স্থানেই এককালীন পাস্তারের কারখানা হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় টিকা-রস আম্দানী করার নিয়ম হইয়া গিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় টিকা-রস ব্যবহারের পরে সমস্ত জন্তু গো-বসন্ত রোগ হইতে রক্ষিত হইয়াছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য, পালের কয়েকটী গরু বা ভেড়াকে 'তীব্র টিকা-রস' (Virulent Vaccine)দ্বারা টিকা দেওয়া হয়। তিন প্রকার টিকা রস ৩ বারে ডাকযোগে পাঠান হয়। টিকারস আসিলেই উহা ব্যবহার করিয়া লইতে হয়। পাস্তারের কারখানা হইতে রওনা হইবার তিন চারি দিবসের মধ্যে টিকা-রস ব্যবহার করা আবশ্যক। টিকা-রসের মধ্যে কৈশিকাণু ও বীজাণু দুই প্রকার অণুই মিশ্রিত থাকে। কৈশিকাণু বায়ব্ধিক (*Ærobic*) অণু, অর্থাৎ বায়ু ব্যতীত এই অণু মরিয়া যায়। যে শিশির মধ্যে টিকা-রস ভরিয়া পাঠান হয়, ঐ শিশির মধ্যে কিছু বায়ু থাকে বলিয়া কৈশিকাণুগুলি ৩।৪ দিবস জীবিত থাকে। গো-বসন্তের বীজাণু বায়ু-বিহীন স্থানেও অনেক কাল জীবিত থাকে। কিন্তু বীজাণু দ্বারা টিকা দেওয়ায় সর্ব্বদা ফল দর্শে না। জীবিত কৈশিকাণু যেমন শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই শোণিতের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং এক দিবসের মধ্যেই অল্প বিস্তর রোগোৎপাদন করিয়া টিকা দেওয়ার কার্য্য সফল হইল বুঝাইয়া দেয়, বীজাণু শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাদৃশ সত্বর কার্য্য করে না। শোণিতের মধ্যে বীজাণু হইতে উদ্ভিজ্জমান কৈশিকাণু জন্মিতে না জন্মিতেই শোণিতস্থিত শ্বেত-কণিকা(White blood-corpuscles বা Phagocytes Pasteur) বীজ গুলিকে খাইয়া হজম করিয়া নষ্ট করিয়া দিতে পারে। এ কারণ বীজাণু মাত্র ব্যবহার দ্বারা টিকা দেওয়ার ফল হইতেও পারে, না হইতেও পারে। পাছে বায়ু অভাবে এক কালীন কৈশিকাণু সমস্ত মরিয়া যায়, একারণ পাস্তারের কারখানা হইতে টিকা-রস দূরদেশে পাঠাইতে হইলেই, বীজাণু অবস্থাগত টিকা-রস মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ স্থলে টিকা দিবার ফল যথাযথ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভারতবর্ষে যদি পাস্তারের কারখানা হইতে টিকা-রস আনিতে হয়, তাহা হইলে বায়ু অভাবে পথেই সমস্ত কৈশিকাণু মরিয়া যাইবে। যে রস আসিয়া উপস্থিত হইবে,তাহার মধ্যে কেবল বীজাণুর উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। বীজাণু হইতে টিকার ফল অনিশ্চিত। একারণ যদি পারিস নগর হইতে টিকা-রস আনিতেই হয়, তাহা হইলে

মিশ্রিত অবস্থায় না আনিয়া উহা বীজাণু অবস্থায় আনাই শ্রেয়ঃ। এখানে মাংসের ক্বাথে ঐ বীজাণু পাত করিয়া, কৈশিকাণু অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করিয়া পরে ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু বীজাণু অবস্থায় পারিস নগর হইতে ভারতবর্ষে গো-বসন্তের টিকা-রস আম্‌দানী করিবার পক্ষেও একটী বাধা আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ৪২°।৪৩° উত্তাপে ১২ দিবস থাকিয়া তীব্র বীজ অনেক হ্রস্বতা লাভ করে এবং এই উত্তাপে ২০ দিবস থাকিলে বীজ আরও অধিক হ্রস্বতা লাভ করে। লোহিত সাগর ও আরব সাগরে সময়ে সময়ে স্বভাবতঃই ৪০°।৪২° উত্তাপ হইয়া থাকে। এরূপ উত্তাপের মধ্যে ১২।১৪ দিবস ধরিয়া টিকা-রস থাকিলে, ইহার হ্রস্বতা এত অধিক হইয়া পড়িবে যে, ইহার ব্যবহারে কোনই উপকার পাওয়া যাইবে না। যদি টিকা-রস পাস্তারের কারখানা হইতে আনিতেই হয়, তাহা হইলেও এই রস যে নলের মধ্যে করিয়া আনা হইবে, তাহা বরাবর বরফের মধ্যে করিয়া আনিয়া ভারতবর্ষের কোন শীত প্রধান স্থানে রাখা আবশ্যক। এই সকল কারণেই গো-বসন্তের টিকা প্রস্তুতের কারখানা আল্‌মোড়া পাহাড়ের নিকট প্রস্তুত হইতেছে। ঐ স্থান হইতেও দেশময় টিকা-রস চালান করিতে হইলে শীতকালে করা আবশ্যক হইবে। শীতকালেই গো-বসন্ত আরম্ভ হয়। একারণ শীতকালেই টিকা দিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আল্‌মোড়া হইতে ভারতবর্ষের সকল স্থানে ৩।৪ দিবসের মধ্যে টিকা-রস আম্‌দানী করিয়া ব্যবহার করিয়া লওয়া চলিতে পারে না। যদি ব্যবহৃত হয়, তবে বীজাণুর উপরই নির্ভর করিতে হইবে, এবং ফল অনিশ্চিত হইবে। যথাযথ ফল পাইতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশে অন্ততঃ এক একটী করিয়া পাস্তার্‌-আলয়(Institute Pasteur) হওয়া আবশ্যক। পাস্তার্ আলয়ে কেবল গো-বসন্তের টিকা-রস প্রস্তুত হইবার কথা নহে। জলাতঙ্করোগ প্রভৃতি নানা সংক্রামক রোগের টিকা-রস প্রস্তুত হইলে পাস্তার আলয় গুলির দ্বারা মনুষ্য ও ইতর জন্তুর বহুধা উপকার হইতে পারিবে। পাস্তার-আলয় প্রস্তুতের জন্য এ যাবৎ বঙ্গদেশেই অধিক অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু আরও অনেক অর্থ সংগৃহীত না হইলে কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে না। যে কয়েকজন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এই সাধু উদ্দেশ্যের বিপক্ষে বদ্ধপরিকর হইয়া, এদেশীয় লোকদিগকে ইহার সাহায্যে যোগদিবার জন্য নিবারণ করিতেছেন, তাঁহারা আপনাদের হৃদয়গত ফরাশি-বিদ্বেষের পরিচয় মাত্র দিতেছেন। গো বসন্তের টিকা-রস প্রস্তুত করিতে গো-মাংস অথবা কুক্কুট-মাংসের ক্বাথ ব্যবহার হইয়া থাকে বটে; কিন্তু যে কয়েকজন ইংরাজ নীতির ভাণ করিয়া পাস্তার্‌-আলয় স্থাপনের বিপক্ষে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা কি গো-মাংস অথবা কুক্কুট-মাংস ভক্ষণ করেন না? জৈন সম্প্রদায়ের লোকদিগের এ প্রস্তাবে সহায়তা করার আশা করা যায় না বটে, কিন্তু ইংরাজ, বাঙ্গালী প্রভৃতি জাতির গো-বসন্তে টিকা দিবার ব্যবস্থায় কিছুই আপত্তি হওয়া উচিত নহে। গো-বসন্ত রোগে টিকা দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষে বৎসরে বৎসরে যে কত লক্ষ লক্ষ গরু বাঁচিয়া যাইবে, তাহা বলা যায় না। এ ব্যবহারের উদ্দেশ্য জীব-হত্যা নহে, জীবরক্ষা। যে রোগের চিকিৎসা

প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই রোগের চিকিৎসা না করিয়া, জন্তুদিগকে কষ্ট পাইয়া মরিতে দেওয়ায় পাপ আছে।

পারিস নগর হইতে বীজাণু অবস্থাগত টিকা-রস আনিয়া এদেশে উহাকে কৈশিকা-বস্থায় পরিণত করিয়া ও পরিমাণে বৰ্দ্ধিত করিয়া লওয়া অপেক্ষা পূর্ব্বাপর সমস্ত কার্য্যই এদেশে হওয়া উচিত। টিকা-রস ও কাথ প্রস্তুতের ব্যবসায় এক্ষণে পারিস্ নগরে প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু টিকা-রস ও কাথ ক্রয় করায় যেরূপ ব্যয় হইবে, তদপেক্ষা এ দেশে এ সকল প্রস্তুত করিয়া লইলে অনেক স্বল্প ব্যয়ে হইয়া যাইবে। টিকা-রস ফ্রান্স দেশ হইতে আমদানী করিতে হইলে যে ইহা পথে বিকার প্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইয়া পড়িবে, এ বিষয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। একারণ প্রথম হইতে কি কি প্রণালী অবলম্বন দ্বারা টিকা রস প্রস্তুত করা যায়, সমস্তই ক্রমশঃ বর্ণনা করা যাইবে।

পাস্তার্ অনুমোদিত উপায়ে গো-বসন্তের টিকা-রস সকল প্রস্তুত করিতে হইলে এই কয়েকটী সরঞ্জাম আবশ্যক।

(১) গ্যাসের ফুকনী নল (Blowpipe) ফুকনী নলের শিখায় কাচের নল গলাইয়া টিকা-রস প্রস্তুতাদি কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ কাচের নল, শিশি ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়। এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিতে অভ্যাস আবশ্যক। পাস্তারের শিক্ষাগারে এই সকল সামগ্রী ছাত্রেরা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে। গ্যাসের ফুকনী-নলের সাহায্যে মাংসের কাথের বোতল, টিকা-রস ঢালিবার 'বদ্‌নার' আকারের বোতল, বীজরক্ষা করিবার নল, ইত্যাদি গলাইয়া বন্ধ করা যায়। টিকা-রস পাঠাইবার বোতল কিরূপে কাচের নল গলাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়, টিকা-রসের বীজ মাংসের কাথে বপন করিবার জন্য যে সূক্ষ্ম নল ব্যবহৃত হয়, তাহা কিরূপে নল গলাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়, রোগে মৃত জন্তুর শরীর হইতে রক্ত শোষণ, অথবা এক আধার হইতে অন্য আধারে টিকা-রস শোষণ করিয়া স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে পিপেট ব্যবহৃত হয়, তাহাই বা কাচের নল গলাইয়া কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, এসকল বিষয় লিখিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন আকারের কাচের নল পারিস নগরে ক্রয় করিতে পারা যায়। কিন্তু নল গলাইয়া যখন এসকল সামগ্রী প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তখন অধিক মূল্যে এসকল ক্রয় করিয়া অন্য দেশ হইতে আম্‌দানী করা নিষ্প্রয়োজন।

(২) একটী হিমাধার (Refrigerator)। এই আধারের মধ্যে টিকা-রসের বীজ সম্বৎসর কাল রক্ষিত হইতে পারে। প্রথম টিকা-রসের বীজ দুই বৎসর কাল ধরিয়া, এবং দ্বিতীয় টিকা-রসের বীজ এক বৎসর কাল ধরিয়া, শীতল স্থানে (১০°।১২° সাণ্টিগ্রাদ্ উত্তাপে) রক্ষা করা যাইতে পারে। এরূপ স্থানে থাকিয়া টিকা-রসের বীজ দুই বা এক বৎসর কাল হ্রস্বতা প্রাপ্ত, রূপান্তরিত বা মৃত হয় না। বীজ হইতে টিকা-রস প্রস্তুত করিয়া লইয়াও উহাকে শীতল স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য ২২°।২৩° সাণ্টিগ্রাদ্ উত্তাপ আবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান স্থলে ২২°। ২৩° সাণ্টি-শৈত্য পাইতে হইলে হিমাধার আবশ্যক। টিকা-রস ২২°।২৩° সাণ্টি উত্তাপের অধিক উত্তাপে থাকিলে শীঘ্রই বিকৃত হইয়া যায়। এ কারণ ভারতবর্ষের নিম্ন প্রদেশ সকলে পাহাড় হইতে টিকা-রস লইয়া আসিয়া ব্যবহার করিয়া লওয়া শীতকালেই চলিতে পারে। ২২°।২৩° উত্তাপে টিকা-রস সতেজ অবস্থায় থাকে, অথচ ইহাতে বীজাণু জন্মিয়া যায় না। এই উত্তাপে ইয়ুরোপে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এবং এদেশে শীতকালে লাভ করা যাইতে পারে। অধিক উত্তাপে কার্য্য করিতে হইলে, হিমাধার আবশ্যক। অধিক শীতে কার্য্য করিতে হইলে এতুভপাস্তার্ আবশ্যক।

(৩) অন্ততঃ দুইটী এতুভ-পাস্তার্ আবশ্যক। একটী এতুভের উপরের দুই থাকে কৈশিকাণু অবস্থাগত প্রথম টিকা-রস, অপরটীর উপরের দুইটী থাকে কৈশিকাণু অবস্থাগত দ্বিতীয় টিকা-রস রাখা উচিত। একটী এতুভের নিম্নের থাকে বীজাণু অবস্থাগত প্রথম টিকা-রস, এবং অপরটীর নিম্নের থাকে

উচিত। টিকার 'বীজ' মাংসের ক্কাথে বপন করিলে, প্রথম কয়েক দিবস কৈশিকাণু বা 'জটাবাঁধা' লক্ষিত হয়। দশ দিবস পর্য্যন্ত ক্কাথের মধ্যে অণু জন্মিয়া পুনরায় বীজ হইতে থাকে। ১০ দিবসের পরে টীকা-রসকে 'পুরাতন টিকা-রস' কহে। পুরাতন ও নূতন টিকা-রস এবং প্রথম ও দ্বিতীয় টিকা-রস পৃথক পৃথক্ স্থানে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। একটীর স্থলে অপরটী ভুলক্রমে প্রযুক্ত হইলে, হয় টিকা দেওয়া কার্য্য ব্যর্থ হয়, অথবা উহা হইতে অনিষ্টপাত হয়। এতুভের মধ্যে তিনটী থাক্ আছে। সর্ব্ব নিম্নের থাকের উত্তাপ যদি ৩৫° সাণ্টিগ্রাদ্ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তদুপরিস্থিত থাকের উত্তাপ ৩২° ও সর্ব্বোপরিস্থ থাকের উত্তাপ ২৯° নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। মাংসের ক্কাথে বীজ বপন করিয়াই ২৯° উত্তাপে আধারগুলি রাখা কর্ত্তব্য। এক দিবস কাল ২৯° উত্তাপে রাখিবার পরে উক্ত আধার (flacons) গুলিকে আর এক দিবস কাল নিম্নের থাকে ৩২° বীজাণু অবস্থাগত দ্বিতীয় টিকা-রস রাখা উত্তাপে রাখা উচিত। তৃতীয় দিবসে আধার গুলির চারি ভাগের তিনভাগ এতুভ হইতে বাহির করিয়া লইয়া ২৩° উত্তাপের ন্যূন উত্তাপ যুক্ত কোন স্থানে রাখিতে হয়। ২৬°। ২৭° উত্তাপে থাকিলেও অতি শীঘ্র অণু বাড়িয়া গিয়া উহা বীজে পরিণত হইয়া যায়। বীজাণু অবস্থা রোধ করিবার জন্য টিকা-রসকে প্রথম দুই দিবস পরেই শীতল স্থানে রাখিতে হয়। যতগুলি আধারে টিকা-রস প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার এক-চতুর্থাংশ এতুভের সর্ব্ব নিম্ন থাকে রাখিয়া দিবার উদ্দেশ্য, উহাতে শীঘ্র শীঘ্র বীজাণু জন্মাইয়া লওয়া। টিকা-রসের এক-চতুর্থাংশ বীজাণু যুক্ত ও অপর তিন অংশ কৈশিকাণু যুক্ত হইলেই টিকার ফল ভাল হয়। একারণ একটী এতুভ "প্রথম টিকা-রস" ও অপরটী "দ্বিতীয় টিকা-রসের জন্য ব্যবহার করা উচিত, এবং এতুভের উপর দুইটী থাক্ "নূতন" এবং নিম্ন থাকটী "পুরাতন" টিকা-রস রাখিবার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

শ্রীনিত্য গোপাল মুখোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

আমার দেবতা।

১

আমি বসায়েছি যারে, হৃদয়-আসনে,
বসন্তের ফুল-হাসি,
শারদ জোছনা-রাশি,
দারুণ বৈশাখী ঝড় বহিছে সঘনে;
ঊষার কোমল ছবি,
নিদাঘ-মধ্যাহ্ণ-রবি,
সাঁঝের শ্যামল ছায়া গগন-প্রাঙ্গনে;
উজ্জ্বলে মধুরে মিশে তাহার আননে।

২

তার কি তুলনা মিলে এমর ধরায়?
আধ স্নেহ—আধ প্রেম;
আধ হীরা—আধ হেম;
আধ শক্তি, আধ ভক্তি, কিবা শোভা পায়!
আধ ছায়া—আধ কায়া;
আধ মোহ—আধ মায়া;
আধ লাজ, আধ ভয়, মিলিয়াছে তায়;
সে স্নেহের সে প্রেমের তুলনা কোথায়?

৩

বীরের হৃদয় তার, ধীর-স্থির মন;
সুখ স্বার্থ পরিহরি,
পরার্থে পরাণ ভরি,
শোণিত করিছে জল, পরের কারণ;
অজেয় সংসার-রণে
যুঝিছে সে প্রাণপণে,
কেবল পরেরি তরে আত্ম-বিসর্জ্জন;
ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা তার সবি অতুলন।

৪

কে বলে সে নিরমম পাষাণ সমান?
পাষাণ পাষাণ নয়;
পাষাণে নিঝর বয়;
অবিরাম স্নেহ-ধারা করিতেছে দান;

বাহিরে কঠোর যদি,
ভিতরে অমৃত-নদী;
কলকল ঢল ঢল চির-বহমান;
পীযূষে পূরিত মরি তাহার পরাণ।
বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সে যে এধরায়;
সে ত দেবতার মত,
দেব-ভাবে অবিরত
শুষ্ক প্রাণে সুধা দানে পরাণ জুড়ায়;
আমি তারে ভক্তি-ভরে,
পূজি গো হৃদয়-ঘরে,
মুগধ বিভল চিত তার গুণ গায়;
"পুরুষ" তাহার নাম, নমি তার পায়।

নারী।

আরতি।

প্রেমময়ি!
বুঝিতে চাহিছ আজি প্রণয় যাহার,
লুকায়ে রেখেছ তারে অন্তরে তোমার!
গাহিতে জানি না গান,
পারি না বুঝাতে প্রাণ,
ধ্যান-মগ্ন রহি, শুধু তোমারে ভাবিয়া;
উজ্জ্বল মানস পটে,
তোমারি যে ছবি উঠে,
আত্মহারা হ'য়ে থাকি বিস্ময়ে চাহিয়া!
এমন সৌন্দর্য্য ভরা,
এত শোভা মনোহরা,
প্রেমের এমন মূর্ত্তি দেখিব না আর;
শান্তি প্রীতি পবিত্রতা,
কি লাবণ্য সরলতা,
একত্রে মিশিয়া আছে অঙ্গেতে তোমার!
মধুর আননে তব,
স্বর্গ শোভা নিত্য নব,
করুণা উঠিছে ফুটি নয়নের কোণে;
মলয়া বহিছে শ্বাসে,
হাসিতে প্রকৃতি হাসে,
মন্দাকিনী বহে বুকে নিভৃতে নির্জ্জনে!
অঞ্চল ভূমেতে লুটে,
পারিজাত ফুটে উঠে,
ও রাঙ্গা চরণ তলে যাচিছে মরণ;
অলকার যত শোভা
প্রাণারাম মনোলোভা,
চৌদিকে পড়িয়া আছে বেড়িয়া চরণ!
বিশুদ্ধ চিত্তের আগে,
ও মূরতি সদা জাগে,
যোগিজন শান্ত হৃদে আরাধ্য দেবতা!
চিত্ত ভরি উঠে প্রীতি,
ধ্যান করি নিতি নিতি,
ধেয়ানে জগত লুপ্ত বিলুপ্ত মত্ততা!
বুঝাতে পারি না প্রিয়ে,
তোমারে হৃদয় দিয়ে,
তোমারি মাঝারে হেরি নিখিল সংসার!
প্রেমের প্রদীপ জ্বলে,
আরতি করিব ব'লে,
দূরে রাখ' বিশ্বমূর্ত্তি অনন্ত অপার,
ধর' সে মোহিনী মূর্ত্তি সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার!

শ্রীবিপিন বিহারী রক্ষিত।

প্রেম-নৈরাশ।

(১)

প্রেম-পুষ্প অর্ঘ্য দিয়ে—চরণে ঢালিনু হিয়ে,
প্রাণের প্রতিমা—সে ত হ'ল না সদয়!
কাঁদিয়াছি কত দিন—তবু সে মমতা হীন—
আমার জীবনে সেই ক'রেছে প্রলয়।
সুখ সাধ গেছে ঘুচে, আকাঙ্ক্ষা গিয়াছে মুছে,
জীবন হ'য়েছে শুধু মহা মরুময়!
চাহিলে প্রাণের পানে আতঙ্ক উদয়।

(২)

চাঁদ সে হাসে না হাস—কুসুমে নাহিক বাস,
ঊষায় মাধুরী নাই—ধরণী কঙ্কর!
প্রিয় যে, আসিলে পাশে, নয়ন উথলি ভাসে,
আপনার দুখে থাকি আপনি কাতর।
পরতে পরতে জ্বলে হৃদয়ের অন্তস্তলে
যে বহ্নি, জ্বলিবে জানি, সে ত নিরন্তর—
কেন রমণীর প্রাণ কঠিন প্রস্তর?

(৩)

মিছে তবে অর্চ্চনায় পূজিলাম দেবতায়—
স্নেহ-বিন্দু ছিল না কি হৃদয়ে তাহার!
কেন হেন নির্ম্মমতা, বুঝিতে ব্যথীর ব্যথা
নাহি এতটুকু তার লেশ করুণার?
হৃদয়ের কক্ষে কক্ষে ভ্রমি সে দেখেছে চক্ষে
তার রূপ-প্রতিবিম্ব জাগে অনিবার;
তবু সে পাষাণী কই হ'ল না আমার!

(৪)

তীব্র বাসনার সনে ধুঝিয়াছি প্রাণপণে—
কই পারিয়াছি প্রেম করিতে দমন?
তবু তার—মুর্ত্তি, স্মৃতি পূরিয়া র'য়েছে ক্ষিতি
তাহারি লাবণ্যছটা উছলে গগন!
সেই ধর্ম্ম—সেই পুণ্য, সে বিনা সকলি শূন্য,
সে ব্যাপিয়া আছে মম সমস্ত জীবন!
সে ছাড়া ত আমি নই—তবু সে স্বপন!

(৫)

ঘৃণা, তিরস্কার তার সে মম অঙ্গের ভার,
তবু সে দেবতা সম আরাধ্য আমার!
তার মুখে স্বর্গ ভাসে, সুধা ক্ষরে তার হাসে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে—রূপ-পূর্ণিমার!
তাহার সুরভি-ঘ্রাণ ল'য়ে বায়ু বহমান—
নিশ্বাসে নিশ্বাসে স্পর্শ পাই সে তাহার!
ভিতরে বাহিরে মম তার অধিকার!

(৬)

ভাবিয়াছি কতবার, ভাবিব না তারে আর,
রুধিব মনের দ্বার—নিষ্ফল কামনা!
কিন্তু কি অবোধ মন—ধৈর্য্য নাহি এক ক্ষণ—
জীবন ত্যজিতে পারি—পারি না ভাবনা।
সে নিরেট—সে পাষাণ—হউক না নিরমাণ,
না বুঝুক্ অভাগার হৃদয়-বেদনা!
আমি কি ছাড়িতে পারি তাহার সাধনা?

(৭)

সব শূন্য—সব ফাকা, শুধু তার মূর্ত্তি আঁকা—
আকাশ, পৃথিবী সিন্ধু আমার হৃদয়!
মুদিলে নয়ন দুটী তার চিত্র উঠে ফুটি,
বিহ্বল হইয়া তারে দেখি বিশ্বময়!
তার ঘৃণা-হলাহল, করিয়াছি কণ্ঠতল,
উগারিতে নারি—হোক্ সদ্য মৃত্যুময়;
জানি সে রমণী বড় কঠিন—নির্দ্দয়!

(৮)

আমি এ হৃন্মেদ যাগে আহুতি দিয়েছি আগে—
"আমার আমার" কথা—ক্ষুদ্র অভিমান!
তবে কেন মরি খেদে মিছা-মিছি কেঁদে কেঁদে?
হউক্ না বিষভরা তার প্রতিদান!
আমি যে বেসেছি ভাল, বাসিব সে অন্তকাল,
থাকুক্ না মাঝখানে শত ব্যবধান;
হউক না রমণীর কঠিন পরাণ!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

উপহার।

১

কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?
অসীম আকাশ খুঁজে, সাগরের তলা খুঁজে,
গহন নগর পল্লী পর্ব্বতের চূড়া খুঁজে,
পাইয়াছি শুধু এই দগধ-বিষাদ-ভার,
মরমের জ্বালা এতে জ্বলে অনিবার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

২

গিয়েছিনু ফুল-বনে তুলেছিনু গ'ণে গ'ণে,
গোলাপ চামেলী বেলী বকুল চম্পক-সনে,
অশ্রু প'ড়ে বার বার হয়ে গেছে অশ্রুধার,
গেঁথেছিনু মন-সাধে সুচিকণ হার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

৩

কনক ছুঁইলে হাতে কলঙ্ক জনমে তাতে,
মাটী হয়ে যায় হীরা অভাগা যে পরশিতে,
দংশয়ে ফণিনী হয়ে ছুঁইলে মুকুতা-হার,
আমি যে গো পাপময় বিষের পাথার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

৪

আছে অশ্রু দুখময় হেরিলে না দয়া হয়,
ভিজাইতে উপাধান শুধু সে নিশীথে বয়,
ছিল হিয়া, চিতানলে পু'ড়ে এবে ছার খার,
দানব পিশাচ তাহে করে হাহাকার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

৫

স্ববগ ভরত টানি মাখিয়া পরাণখানি,
ঢালিয়া চরণে দিব বড় সাধ মনে মানি,
প্রাণ যে আমার নাই আছে শুধু হাহাকার,
জ্বলে তথা শ্মশানের অগ্নি অনিবার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

৬

সাধুতা মরিয়া গেছে, পুণ্য ধর্ম্ম উ'ড়ে গেছে,
ভকতি মুকতি নাই নরক পড়িয়া আছে,
ব্যর্থ এই অশ্রু দিয়া রচিয়াছি পারাবার,
ইচ্ছা হয় লহ পদে এ দুখের ভার,
কিবা দিব উপহার কি আছে আমার?

দিনামার হিন্দুরমণী জানকী বাই।

আজ ঠিক পাঁচ বৎসরের কথা বলিতেছি। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এক দিন লণ্ডনের ব্রিটীশ মিউজিয়মে বুলাকীরাম শাস্ত্রী আমার নিকট রুশিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৭।২৮ বৎসর হইবে। বুলাকীরাম জাতিতে ক্ষত্রিয়, নিবাস পঞ্জাব প্রদেশ, তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পরীক্ষায় শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত। বুলাকীরাম সে সময় বারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন মাত্র, সনন্দ পান নাই, তাহা পাইতে ছয় মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং ঐ কাল মধ্যে ইউরোপের কিছু দেখিয়া শুনিয়া দেশে ফিরিবার সংকল্প করিয়াছেন। রুশিয়া দেখা বিশেষ মানস, কারণ পঞ্জাবে গেলে অনেকে তাঁহাকে রুশীয়দের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে;—সে প্রদেশে রুশের কথার কিছু বেশী আলোচনা। আমিও এই সময়ে ছয় মাসের জন্য ইউরোপীয় মহাদেশ পর্য্যটনে বাহির হইবার উদ্যোগে ছিলাম। সুতরাং যে কয় দিন হয় এক সঙ্গে ভ্রমণ করিবার মত জানাইলাম; এবং তাঁহার মতানুযায়ী প্রথমে রুশিয়ার দিকে যাওয়া স্থির হইল। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিবসে নরওয়ে যাত্রা করা গেল।

নরওয়ের রাজধানী ক্রিষ্টিয়ানিয়া (Christiania) হইতে আমি উত্তরান্তরীপ (North Cape) যাত্রা করি; আমার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় তিনি ক্রিষ্টিয়ানিয়াতেই থাকেন। পরে যথা সময়ে আর্ক্টিক প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে আবার একত্রে ভ্রমণ আরম্ভ হয়। রুশিয়া ব্যতীত অন্যান্য স্থান দেখিবার জন্য তাঁহার তত স্পৃহা ছিল না। মূলকথা, রুশের মুল্লুক দেখা ভিন্ন পর্য্যটন তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। বিধাতার লীলাখেলা বিধাতাই বুঝেন, ক্ষুদ্র কীটাণুকীট মানুষ কি বুঝিবে? আমরা যতই কেন করি না, যে দিকে গেলে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইবে, তিনি ঘাড় ধরিয়া আমাদিগকে সেই দিকেই লইয়া যান। ইচ্ছা,প্রবৃত্তি থাকুক আর নাই থাকুক, অজ্ঞাতসারে কলের পুতুলের মত আমাদিগকে সেই দিকেই চালিত হইতে হয়। ক্রিষ্টিয়ানিয়া হইতে রুশিয়া যাইতে গেলে, অবশ্য সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হলমে(Stockholm) গিয়া জাহাজে উঠিতে হয়। ওখান হইতে ষ্টক্‌হল্‌ম্ সোজা রেলপথ। কিন্তু লণ্ডন হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে বন্ধু বুলাকীরাম বলেন যে, গোথাখালের (Gotha canal) অনেক সুখ্যাতি শুনা হইয়াছে, সুতরাং ঐ পথেই যাওয়া পরামর্শ। পর্য্যটন প্রিয়তা তাঁহার কিছু মাত্র না থাকিলেও অনেক ঘুরিয়া ঐ খাল দিয়াই তাঁহাকে যাইতে হইবে; কারণ সেখানে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে একটী বিশেষ ও আশ্চর্য্য ঘটনা ভগবান সংঘটিত করিবেন, তাঁহার ব্যবস্থায় লেখা আছে:—গোথা-খাল একটী জীবন্ত নবন্যাসের রঙ্গভূমি হইবে। বিশ্বরাজাধিরাজের হুকুম মানিতেই হইবে; কাজেই সকল সংক্ষেপ পথ ছাড়িয়া আমাদিগকে গটেনবর্গ (Gottenburgh) যাত্রা করিতে হইল। এখানে পঁহুছিবার পরদিন মধ্যাহ্নে 'পালাস' (S S "Pallas") নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া খালের যাত্রী হই। বাস্তবিকই এই খাল দিয়া গটেনবর্গ হইতে ষ্টক্‌হল্‌ম্ যাওয়া পৃথিবীর মধ্যে একটী মহা উপা-

দেয় বিহার। তিন দিন লাগে ; ইহার মধ্যে কত প্রকার মনোরম দৃশ্য দেখা যায়, কত সুন্দর সুন্দর হ্রদ, দ্বীপ, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন উপবন, এবং অবশেষে সমুদ্র শাখা ও অসংখ্য দ্বীপ পুঞ্জের মধ্যদিয়া ষ্টক্‌হল্‌মে উপনীত হইতে হয়। খালের বিবরণ স্থানান্তরের বিষয়, এখানে সে বিষয়ে কিছু বলিবার দরকার নাই।

পালাস জাহাজে আমরা নানা দেশীয় নর নারী মিলিয়া ৩০।৩৫ জন আরোহী ছিলাম। খাওয়া দাওয়া, গল্প গুজব, আমোদ প্রমোদ ভিন্ন আমাদের আর কি কাজ ছিল? কেবল মধ্যে মধ্যে ব্যায়ামের জন্য কেহ কেহ লকের (Lock) নিকট জাহাজ হইতে নামিয়া কতক দূর খালের ধারে ধারে পদব্রজে চলিতেন। যাত্রীদের মধ্যে একটী দিনামার (Danish) পরিবার বুলাকীরাম ভায়ার বিশেষ আকর্ষণের সামগ্রী ছিলেন। কাপ্তেন আমাকে মধ্যে মধ্যে এ কথা বলিতেন। আমি বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারি নাই ; কারণ অবকাশ পাইলে আমি একটী বৃদ্ধা রুশ রমণীর সহিত কথোপকথন দ্বারা রুশিয়া সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিতাম। ইনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় আড্‌মিরাল কোজাকর ভিশের (Admiral Kozakervitch) বিধবা পত্নী। আড্‌মিরাল মহাশয় বহুকাল মধ্য-আসিয়ার একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আমুর নদীস্থ একটী দ্বীপ তাঁহার নামে অভিহিত। ইনি অতি সহৃদয়,আমাদের দেশের প্রাচীন গিন্নিবান্নির মত লোক ; ইংরাজীভাষা সুন্দর জানিতেন। রুশিয়া ও মধ্য আসিয়া সম্বন্ধে তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছি,তাহাও স্থানান্তরের বিষয়। দিনামার ভদ্রলোকটী স্ত্রী ও দুইটী সুন্দরী যুবতি কন্যা সমভিব্যাহারে আমাদের ন্যায় খাল-বিহারে বাহির হইয়াছেন। প্রায় বৈকালে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গে খালের ধারে হাঁটিয়া ভ্রমণ করেন ; মধ্যাহ্নে জাহাজের একপার্শ্বে বসিয়া দুইটী কন্যার সঙ্গে আলাপ দ্বারা সুখে কালাতিপাত করেন। লণ্ডনেও তিনি এইরূপ অনেক পরিবারের সঙ্গে মিশিতেন, সুতরাং এক্ষেত্রে উহাতে কোন নূতনত্ব আমার চক্ষে লাগে নাই। যাহা হউক, অতি সুখে কয়দিন কাটাইয়া যথা সময়ে ষ্টক্‌হল্‌ম্ পঁহুছিলাম। পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণান্তে সব ছাড়াছাড়ি হওয়া গেল ; কে কোথায় গেলেন, কোন নির্দ্দেশ নাই। ইহার কয়েকদিন পরে আমরা রুশিয়া চলিয়া যাই, সুতরাং আর তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। রুশিয়া হইতে পুনরায় ষ্টক্‌হল্‌মে আসিলে,হঠাৎ এক দিন বুলাকীরামের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় ; এবং তাঁহারা যে হোটেলে থাকিতেন, ভায়া সেই খানে নিমন্ত্রিত হন। আমার সহিত কিন্তু আর দেখা শুনা নাই।

সুইডেন হইতে আমরা জার্ম্মেণি (Germany) যাই। বার্লিনে (Berlin) কয়দিন থাকার পর বুলাকীরাম লণ্ডন ফিরিয়া যান। তার পর কয়মাস নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া যখন লণ্ডনে প্রত্যাগমন করি, তখন দুই এক দিন মাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন ; আমিও দুই মাস পরে অন্যদিক পর্য্যটনে বাহির হই। দেশে আসিবার পর তাঁহার খোঁজ খবর বড় একটা পাই নাই। কয়দিন হইল হঠাৎ তাঁহার এক পত্র দ্বারা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাই পত্রস্থ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

যদিও ঐ দিনামার পরিবারের সহিত

উৎসবমেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই বুলকীরাম তাঁহাদের ঠিকানা লইয়াছিলেন ও তাঁহারাও উঁহার ঠিকানা জানিতেন। চারি বৎসরকাল তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য পত্রাদিও লেখালেখি হইয়াছিল। গত ১৮৯৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লণ্ডন নগরে ঐ কন্যাদ্বয়ের কনিষ্ঠাটীর সঙ্গে শিখধর্ম্ম প্রথানুসারে বুলাকীরামের বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার হিন্দু পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ইহাতে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন। এখন বিবাহের পর যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাই ভারতের পক্ষে অতীব অভিনব ব্যাপার। ইহাতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে কি লক্ষিত হয়, ভাবিয়া দেখা উচিত। ভাল মন্দ আমি কিছু বলি না, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সে অধিকার কোথায়? উহার বিচার ভারতোদ্ধারকারী মহোদয়গণের হাতে। চিরাগত-প্রিয় রক্ষণশীল "আর্য্য" একদিকে চিন্তা করুন; আর পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী "অহিন্দু" ভায়ারা অপর দিকে নৃত্য করুন; আমরা উভয়ের মধ্যে নিবিষ্টচিত্তে দাঁড়াইয়া দেখি। অনেকে বলিতে পারেন, পঞ্জাবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? তাহা হইলে "ভারতোদ্ধার" কথাটা মাটি হয়, কন্‌গ্রেস রসাতলে যায়; সুতরাং তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? বাঙ্গালী পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নত, পঞ্জাব অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে; অপর দিকে নিম্ন বঙ্গভূমে সমস্ত আর্য্য শোণিত আসিয়া দেশহিতৈষণার প্রবল স্রোত চালাইয়াছে, পঞ্জাবে অনার্য্য মুসলমানীভাব অনেক পরিমাণে বিদ্যমান;—একথা বলিলেও চলে না। যে দিক দিয়া যাওয়া যায়, আর্য্যপ্রভাব জাগাইবার ব্যাপারেই হউক, আর সমগ্র ভারত ইউরোপীয় ভাবে পুষ্ট করিবার উদ্যমেই হউক, পঞ্জাবকে বাদ দিয়া চলা যায় না। ভূতের ও বর্ত্তমানের পঞ্জাব-গৌরব খসাইয়া লইলে ভারত-গৌরব কতটুকু থাকে, বলা কঠিন।

বুলাকীরাম লিখিয়াছেন, তাঁহার দেশস্থ জাতীয় ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ নবদম্পতীকে সাদরে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিয়াছেন।

("The most wonderful thing, perhaps, you will observe is that my wife has been taken into the Hindu society by the people of my province. My own family has received her with open arms and the leading Hindus with whom we have been guests have had no objection to dine with her. My servants are all Hindus—Brahmins and Khetryas).")

সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ বিনা আপত্তিতে তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহাদের সংসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় চাকর-বাকর রহিয়াছে—অর্থাৎ পাচকাদি মুসলমান বা খ্রীষ্টান নয়।

পঞ্জাবের সামাজিক মহারথীগণ যাহা করিতেছেন, তাহা ত শুনিলেন। এখন খ্রীষ্টান ইউরোপে লালিতা পালিতা দিনামার যুবতী লাঞ্ছিত ও শ্বেতাঙ্গ-পদ-দলিত ভারতীয় পরিবারের গৃহলক্ষ্মী হইয়া কি করিতেছেন, একবার শুনুন। এ সকল বিধাতার লীলা, কালের খেলা, উনবিংশ শতাব্দীর ভেল্কিবাজী। তিনি ভারতীয় পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া "জানকী বাই" নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

("My wife is now a thorough Hindu and rejoices in the name of Janaki Bai. She dresses like a Hindu lady and wears Hindu shoes.")

প্রায় ৪।৫ মাস অতীত হইল তাঁহাদের এক কন্যা হইয়াছে; তাহার নাম রাখা হইয়াছে "শকুন্তলা"। নামকরণোপলক্ষে বুলাকীরামের শাশুড়ী সুদূর ডেনমার্ক হইতে পঞ্জাবে আসিয়া ভোজকলাবে নিয়মিত রূপে যোগ দিয়া লুচিমণ্ডা খাইয়া গিয়াছেন।

এখন ভাটপাড়ার কোন ভট্টাচার্য্যের টিকি-ধারী পুত্রের সহিত এই কন্যা শকুন্তলার বিবাহোপলক্ষে ফলার করিতে পারিলে আমরা পরম সুখ লাভ করি; এবং হিন্দু সমাজের মুখ উজ্জ্বল হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

দুইখানি পুস্তক।

১। ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবন-চরিত।—রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর চিন্তাশীল সুলেখক। তাঁহার প্রণীত পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবন-চরিত সাধু হিন্দু জীবনের একখানি আদর্শ চিত্র। প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা উল্লেখ করিয়া আমি আক্ষেপ করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্ণ চরিত্র উপহার দিয়া কেবল আমার আশা মিটান নাই—ভ্রাতৃ কর্ত্তব্য, অতিযত্নে, কোমলতা ও ভক্তির সহিত প্রতিপালন করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা ভাষা উপকৃত হইয়াছে। ৺প্রেমচন্দ্রের অনেক শিষ্য অদ্যাপি জীবিত আছেন; তাঁহাদের নিকট হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের আখ্যায়িকা অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যতদূর পারা যায়, সংগ্রহ করিয়া একখানি বৃহত্তর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। শিষ্য সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। আর দশ পনর বৎসরে প্রায় সকলে অদৃশ্য হইবেন। তখন এমন সুযোগ আর ঘটিবে না।

তাই বলিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ নহে। প্রেমচন্দ্র পণ্ডিত ও সাধু। তাঁহার নিরীহ প্রকৃতি প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় সংসারের অন্তরালে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করাইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের ন্যায় সমাজ-সমরে বীরের ন্যায় তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইতে তাঁহার প্রকৃতি সঙ্কুচিত হইত। তাই বলিয়া তিনি শুষ্ক সন্ন্যাসী ছিলেন না। বন্ধু বান্ধব শিষ্য লইয়া কাব্যশাস্ত্রের অমৃতরস আস্বাদনে তাঁহার দিনপাত হইত। তাঁহার দেহ সুন্দর, বেশ সুন্দর, ভোজন সুন্দর, বল সুন্দর, প্রকৃতি সুন্দর। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসিয়া নীরবে তিনি স্বভাবের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেন। এই সৌন্দর্য্য প্রিয়তা তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসকেও সৌন্দর্য্যময় করিয়াছিল। তিনি সকল ধর্ম্মের যুক্তিমত্তায় বিশ্বাস করিতেন, কৃচ্ছ্রসাধনে উৎসাহ দিতেন না, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে ঘৃণা করিতেন না। চরিত্রের পবিত্রতা, হৃদয়ের কোমলতা ও প্রেমময়ের সাক্ষাৎ অনুভূতি, এই তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস। চরিত্রের মধুরতা ও কাব্যালোচনা তাঁহার ধর্ম্ম জীবনকে সৌন্দর্য্যময় করিয়াছিল। সত্যং শিব সুন্দরং তাঁহার উপাস্য। প্রেমচন্দ্র কাব্যরসের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার রসজ্ঞতার নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে, আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, সাধনা করিলে তিনি রাফেলের ন্যায় চিত্রকর হইতে পারিতেন। কাব্য-ব্যাখ্যার সময় তাঁহার চিত্রবিদ্যার পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হইত। এমন সুন্দর জীবনের আখ্যায়িকায় হৃদয় আকৃষ্ট হয়—ঘটনার বৈচিত্র্যে, কথাগুলির মিষ্টতায় এবং রামা-

ক্ষয় বাবুর লেখার গুণে যত পড়ি, তৃপ্তি হয় না, আরো পাইতে ইচ্ছা হয়; তাই গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ না হইলেও আরো বৃহৎ দেখিতে বাসনা করি।"

কাব্যরসে রসিক হইলেও দর্শনতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বে প্রেমচন্দ্রের অভিনিবেশ ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। শিষ্যগণ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে বিনীত দৃঢ়তার সহিত তিনি যেরূপে ঐ সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন, কোন দার্শনিক বা সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত তাহা অপেক্ষা গুরুতর উপদেশ দিতে পারিতেন না।

একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘটনা-শূন্য নিরীহ জীবনে কি থাকিতে পারে যে, দুই শত পৃষ্ঠার একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ হয়! যাদুকর দণ্ডমাত্র আন্দোলন করিয়া মরুভূমে রসালবৃক্ষ উৎপাদন করিয়া তাহাতে সুরস ফল উৎপাদন করিতে পারেন। রামাক্ষয় বাবু চিন্তাশীল দার্শনিকের ন্যায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবন যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। একটি কথার নিরর্থক ব্যবহার হয় নাই, একটী কথা হইতে আর একটী কথা আবশ্যক হইলে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়া লেখনী সংযত করিয়াছেন। তাঁহার ভয় হইয়াছে, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। প্রকৃত সুলেখকের ন্যায় তিনি আত্মসংযমের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ সংযম না করিলে আমরা পরিতৃপ্ত হইতাম।

মাইকেল সাহেবী বাঙ্গালী, প্রেমচন্দ্র বাঙ্গালীর বাঙ্গালী, হিন্দুর হিন্দু। মাইকেলের জীবন-চরিত্রের সহিত প্রেমচন্দ্রের জীবন-চরিত্রের তুলনা করিতে বড়ই ইচ্ছা জন্মে। নানা কারণে আমরা সে ইচ্ছা দমন করিলাম। কেবল এই মাত্র বলিতে পারি, জীবন-চরিত্র রচনায় রামাক্ষয় বাবু অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নব্যভারতে অতিমানুষী বা আধিভৌতিক ঘটনা সম্বন্ধে আমি কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তর্কবাগীশের জীবন-চরিত্রে রামাক্ষয় বাবু কয়েকটী আধিভৌতিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। অতি বিশ্বস্ত লোকের নিকট হইতে এগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে, কোন কোনটী তাঁহার প্রত্যক্ষ। সুতরাং অবিশ্বাসের সম্ভাবনা নাই। আমরা তাহার কয়েকটী ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। এই উপলক্ষে পাঠকগণ রামাক্ষয় বাবুর লিপি-চাতুরীর পরিচয় পাইবেন। সাত্ত্বিক জীবনের অধিকার কতদূর, তাহার আভাস পাইবেন এবং এরূপ ঘটনা সম্বন্ধে তখন আমরা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার কিছু প্রমাণ পাইবেন।

মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বে মধ্যম ভ্রাতার অনুনয় ও অনুরোধসূচক পত্র সকলের উত্তরে প্রেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, বিসূচিকারোগে তাঁহার জীবন শেষ হইবে। ইতিপূর্ব্বে যৌবনে দুইবার এই রোগ হইয়াছিল, পরিত্রাণও হইয়াছিল। আগামী বৈশাখের পূর্ব্বে যে এই রোগ ঘটিবে, তাহার পরিণাম দেখিয়া একবার বাটী যাইবার ইচ্ছা রহিল। প্রেমচন্দ্রের গণনার ফল অব্যর্থ।

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পদ প্রাপ্তির কিছু দিন পরে একবার ফাল্গুন মাসে সূর্য্যগ্রহণ হয়, সর্ব্বগ্রাস হওয়ায় গ্রহণ কাল বিস্তীর্ণ ও মধ্যাহ্নকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। প্রেমচন্দ্র বড়বাজারের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে স্নান ও জপ সমাপন করিয়া লোকের স্নানাদি কার্য্য দেখিতেছিলেন এবং অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণের প্রতীক্ষা করিতে-

ছিলেন। তাঁহার অনতিদূরে এক বিষয়ী লোক বেগুণে রঙের একখান বস্ত্র দ্বারা আপন মস্তক ও দেহের অধিকাংশ আচ্ছাদিত করিয়া জপে বসিয়াছিলেন। এই সময়ে পাগলের মত এক ভিক্ষুক তথায় আসিল এবং আপন ছিন্ন-বস্ত্র-খণ্ড মেলিয়া ভিক্ষা-লব্ধ শশা, শাঁক আলু প্রভৃতি ফলমূল আহার করিতে লাগিল। শশায় কামড় দিবার তৃপ্তিকর আঘ্রাণ পাইয়া ঐ বাবুটি বিচলিতচিত্তে ক্রোধভরে "মলো ব্যাটা পাগ্‌লা, আর জায়গা পেলেনা, সম্মুখে এসে খেতে বস্‌লো, দূর হ" বলিয়া উঠিলেন। ইহা শুনিয়া ফলাহারী ভিক্ষুক আর একটা শশায় কামড় মারিয়া কচ্‌ কচ্‌ চিবাইতে চিবাইতে সমীপবর্ত্তী প্রেমচন্দ্র প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিল,—"আমি পাগল, বাবুটী জপে মগ্ন, কি জপ কচ্চেন জান? কাল কুঠী হ'তে ফিরে যাবার বেলায় জোড়াসাঁকোর বাজারে এক জোড়া জুতা কিনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দরে বনে নাই, আর দুই আনা বেশী দিয়া ঐ জোড়াটী আজ লয়ে যাবেন, এই জপ কচ্চেন।" এই বলিতে বলিতে ভিক্ষুক আপন ছিন্নবস্ত্র-খণ্ডস্থিত ফলমূলগুলি বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিয়া চলিল। বাবুটী অকস্মাৎ বেগুণে রঙের গাত্র-বস্ত্র খানি আসনে ফেলিয়া ভিক্ষুর পাছে পাছে দৌড়িলেন এবং তাহার পায়ে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুক এক একবার তাহাকে পদাঘাত করিতে করিতে দৌড়িতে লাগিল। মনের কথা টানিয়া বলিয়াছে, বাবুটীর প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে, আর কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? প্রেমচন্দ্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভিক্ষুকের পার্শ্বে পার্শ্বে বেগে চলিলেন।

এক সাধু তিনবার প্রেমচন্দ্রের বাসায় আসিয়াছিলেন ও এক এক রাত্রি মাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। দিবাভাগে তিনি আতপ চাউল, মুগ, তরকারী, ঘৃত সৈন্ধবাদি সমস্ত দ্রব্যে একত্রে গঙ্গাজল সহ এক হাঁড়ীতে দিয়া পাক করিতেন। সিদ্ধ অন্ন লইয়া চুলার অগ্নিতে তিনবার আহুতি প্রদান করিতেন এবং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতেন। এক দিবস চুলাতে হাঁড়ী বসাইয়া সাধু আর খানিক গঙ্গাজল চাহিলেন। ভৃত্য জালা হইতে যে জল আনিয়া দিল, তাহা অতি ঘোলা ও অপবিত্র দেখিয়া সাধু তাহা গ্রহণ করিলেন না। আর জল ছিল না, ভারী জল আনিতে গিয়াছিল, আসিয়া পৌঁছে নাই, ভৃত্য সঙ্কেত করায় সাধু পিতলের একটা বড় কলস লইয়া দ্রুতপদে নীচের তলায় নামিয়া গেলেন। নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে গেলেন বলিয়া ভৃত্য মনে করিল। প্রেমচন্দ্র তখন অন্তগৃহে পূজা করিতেছিলেন। পূজাশেষে উঠিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী দীঘীর ঘাটে লোক পাঠাইলেন, সাধুকে তথায় পাওয়া গেল না। এদিকে চুলার অন্নে জলাভাব হইল। প্রেমচন্দ্র ও বাসার অপর সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে সাধু এক কলস গঙ্গাজল সহ অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। চাঁপাতলা হইতে নিকটবর্ত্তী গঙ্গার ঘাট যাতায়াতে এক ক্রোশের অধিক সন্দেহ নাই। গাড়ীতে যাতায়াত করিলেও তত অল্প সময়ের মধ্যে গঙ্গার ঘাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব। অন্যে এ বিষয়ের রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। প্রেমচন্দ্র ঈষৎ হাস্য বদনে নীরব রহিলেন এবং সাধুর প্রতি সমধিক ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কলসে যে গঙ্গাজলই আনীত

হইয়াছিল, পুষ্করিণীর জল ছিল না, তাহা সকলের পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইয়াছিল।

পুরীতে অবস্থান সময়ে এক নিশা শেষে উঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অকস্মাৎ জাগরিত ও চকিত হইয়া উঠিলেন এবং মস্তক প্রদেশে প্রেম চন্দ্রকে দেখিবেন ভাবিয়া নিদ্রাজড়-লোচন-যুগল সতৃষ্ণভাবে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গৃহে আলোক সত্বেও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার শিরোভাগে তক্তপোষের উপরে দক্ষিণ পদ তুলিয়া এবং কতকখানি ফালি কাপড় ধরিয়া প্রেমচন্দ্র শক্তভাবে পুল্‌টিস বাঁধিয়া দিবার নিমিত্ত কনিষ্ঠ সহোদরকে সঙ্কেত করিতেছেন। ঐ রাত্রিতে আর তাঁহার নিদ্রা হইল না। পরদিন তিনি কাশীতে এক পত্র লিখিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন— আপনার কটিদেশের অধোভাগে কোন স্থানে ক্ষত হইয়াছে কি না, ও তাহাতে পুল্‌টিস লাগান হইতেছে কি না? কল্য রাত্রিতে স্বপ্নানুভূত একটী বিষয়ের যাথার্থ্য জানিবার নিমিত্ত এই জিজ্ঞাসা। এ প্রশ্নের অন্য উদ্দেশ্য নহে জানিবেন। ইহার উত্তরে প্রেমচন্দ্র কনিষ্ঠ সহোদরকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—দেখিতেছি, তোমার স্বপ্নটী অতি অদ্ভুত। সত্যই আমার দক্ষিণ উরুর অধোভাগে একটী বড় ফোড়ো হইয়াছে। বড়বধূ ভালরূপে পুল্‌টিস বাঁধিতে পারেন না। বিশেষতঃ কথিত রাত্রিতে পুল্‌টিস্‌টী মনোমত ভাবে বাঁধা না হওয়ায় তাহা টিপিয়া ধরিয়া তাকিয়ার উপরে হেলিয়া পড়ি এবং মাতৃবিয়োগের পরে বাম উরুতে এইরূপে যে এক ফোড়া হইয়াছিল, তাহাতে পুলটিস্ আমি বাঁধিয়া তুমি যথোচিত শুশ্রূষা করিয়াছিলে, এক্ষণে নিকটে থাকিলে বিশেষ যত্ন করিতে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হই। ইহাই তোমার স্বপ্নদর্শনের কারণ জানিবে।

২। জ্ঞানদাস (জীবনী ও টীকা সমেত) শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

রমণী বাবু কৃতবিদ্য ধনবান্ যুবা পুরুষ। অনাদৃত বৈষ্ণব কাব্য সঙ্কলনে তাঁহার অভিরুচি হইয়াছে। আনন্দের কথা। দুঃখের বিষয়, ইতিপূর্ব্বে আমরা তাঁহার চণ্ডীদাসের সুখ্যাতি করিতে পারি নাই। এবার তাঁহার জ্ঞানদাসেরও সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না।

পরের ধন আপন বলিয়া পরিচয় দিবার রোগ ভদ্রজনোচিত নহে। রমণী বাবুর এই রোগটী বড় বেশী। শক্ত রোগের তীব্র চিকিৎসার প্রয়োজন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই রমণী বাবু বলিতেছেন "প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী কতক কতক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনী আদৌ প্রকাশিত হয় নাই।" সেই জন্য, বোধ হয়, বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া রমণী বাবু জ্ঞানদাসের জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন। বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিমস্ ও গ্রিয়ার্সন সাহেব বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনী যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনী আদৌ প্রকাশিত হয় নাই, একথা সত্য নহে। হইতে পারে, রমণী বাবুর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ সকল মহাত্মাগণের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, রমণী বাবু তাহাদিগের সংবাদ পান নাই। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি কয়েকটী বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবির জীবন-চরিত প্রকাশিত করি। এবং আমার অনুরোধ-

ক্রমে ভক্তিনিধি হারাধন দত্ত আমার ভ্রমগুলি দেখাইবার জন্য কয়েকটী মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন। ভক্তিনিধির ও আমার রচিত বৈষ্ণব-কবি-চরিত নব্যভারত ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমার প্রবন্ধগুলি কেবল নব্যভারতে ও ভক্তিনিধির প্রবন্ধগুলি নব্যভারত ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই সকল প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলন করিয়া গত বৎসর আমার বন্ধু বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য একখানি সুপাঠ্য বৈষ্ণব-কবিচরিত প্রকাশিত করেন। সুতরাং জ্ঞানদাসের জীবন-চরিত রচনা সম্বন্ধে রমণী বাবুর মৌলিকতার ভাণ সম্পূর্ণ ঘৃণার্হ। কেহ ভাবিতে পারেন যে, হয় ত সে প্রবন্ধ বা পুস্তক রমণী বাবু দেখেন নাই। এ জন্য আমারা ভক্তিনিধির প্রবন্ধ ও রমণী বাবু রচিত-জ্ঞানদাস জীবনী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিতেছি যে, রমণী বাবু-কেবল ঐ সকল প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, এমন নহে, তাহার ভাষা পর্য্যন্ত তুলিয়াছেন।

ভক্তিনিধি

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে, পীতাম্বর আচার্য্য, শ্রীদাস দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর এই ভিন্ন অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থের ভিতর জ্ঞানদাসের জীবনী নাই।

রমণীবাবু

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞানদাসের জীবনী পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানদাসের নাম ব্যক্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

পীতাম্বর আচার্য্য, শ্রীদাস, দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ জ্ঞানদাস, মনোহর।

প্রভেদের মধ্যে এই ভক্তিনিধি চরিতামৃতকে প্রামাণিক গ্রন্থ ও রমণী বাবু ভক্তিরত্নাকরকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়াছেন।

ভক্তিনিধি

আমাদের এখান হইতে ৪ ক্রোশ ব্যবধান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতলপুর নামক একটী গণ্ডগ্রামে যে কয়েক ঘর গোস্বামী বাস করেন, তাঁহারা মঙ্গল ঠাকুরের বংশ।

রমণী বাবু

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতলপুর নামক যে একটী গণ্ডগ্রাম আছে, সেখানে কয়েক ঘর গোস্বামী বাস করেন, তাঁহারা মঙ্গল ঠাকুরের বংশ।

ভক্তিনিধি

বীরভূম জেলার অধীন ইন্দ্রাণী নামে যে দেশ আছে, যে দেশে মহাভারত-রচয়িতা ✓ কাশীরাম দাস বাস করিতেন, যে স্থানের পূর্ব্ব ৪ ক্রোশ ব্যবধান একচক্রা নগর, অর্থাৎ যে নগরে শ্রীশ্রীহারাই পণ্ডিতের গৃহে শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে নগরের পশ্চিম দুই ক্রোশ ব্যবধান কাঁদড়া নামে যে পল্লী আছে, সেই কাঁদড়া পল্লীমধ্যে বহুগোষ্ঠী সম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে মঙ্গল বংশে শ্রীজ্ঞান দাসের জন্ম হয়। জ্ঞানদাস শ্রীজাহ্নবা দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দারপরিগ্রহ করেন নাই, তদীয় দায়াদগণ শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ গোস্বামীপদে অভিষিক্ত হন। এ পর্য্যন্ত সেই স্থানে শ্রীজ্ঞানদাসের মঠ আছে। প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমায় তত্র স্থানে জ্ঞানদাসের দিবসিক উপলক্ষে মহোৎসব এবং তিনি মেলা হয়।

রমণী বাবু

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত ইন্দ্রাণী নামে যে দেশ আছে, যে দেশে মহাভারত-রচয়িতা মহাত্মা কাশীরাম দাস বাস করিতেন, যে স্থানে ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে একচক্রা নগরে যে থানে শ্রীশ্রীহারাই পণ্ডিতের আলয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নগরের পশ্চিমে বিপ্রকুলে মঙ্গলবংশে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাস শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞাতিবর্গও শ্রীজাহ্নবাদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গোস্বামী পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের মঠ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রতিবৎসর পৌষপূর্ণিমায় সেখানে জ্ঞানদাসের দিবসিক উপলক্ষে মহোৎসব হয় এবং তিন দিন মেলা হয়।

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ভক্তিনিধির প্রবন্ধ হইতে রমণী বাবু ঘটনা ও ভাষা উভয়ই চুরী করিয়া আপনার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

জ্ঞানদাসের জীবনীর এক অংশে রমণী বাবু লিখিয়াছেন "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় পদসমুদ্র বাছিয়া অপ্রকাশিত পদ সকল আমাকে দয়া করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় আজ জ্ঞানদাস ঠাকুরের পদ সকল প্রকাশিত হইল। ভক্তিনিধি মহাশয়ের ঋণ এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।" তাই বলিয়া বুঝি জীবনীর ঋণ অস্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইয়া থাকিবে।

সাধারণতঃ জ্ঞানদাসের যতগুলি পদ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা রমণী বাবুর গ্রন্থে ৯৬ টি পদ অধিক আছে। চণ্ডীদাসের সমালোচনার সময় আমরা একটী সূচীপত্রের অভাব উল্লেখ করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, জ্ঞানদাসের পদাবলীর সঙ্কলনেও রমণী বাবু এ অভাবটী পূর্ণ করেন নাই। পাঠককে আপন আপন সূচীপত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এই ৯৬টী নূতন পদের মধ্যে ১৩টী পদে জ্ঞানদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয় না। কোন্ যুক্তি বলে রমণী বাবু এগুলিকে জ্ঞানদাসের পদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। হইতে পারে, ষোড়শ গোপালের রূপবর্ণন বিষয়ক পদাবলী বৈষ্ণব সমাজে জ্ঞানদাসকৃত বলিয়া চিরদিন পরিচিত হইয়াছে। সঙ্কলনে সে কথার উল্লেখ করা আবশ্যক ছিল। এবং সে প্রবাদ কত দূর যুক্তি-সঙ্গত, তাহারও বিচার করা প্রার্থনীয়। কয়েকটী পদ গ্রন্থ বিশেষে চণ্ডীদাস, অনন্ত দাস বা যদুনন্দনের ভণিতা যুক্ত দৃষ্ট হয়। কি যুক্তিবলে গ্রন্থকার সে গুলিকে জ্ঞানদাস কৃত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাহারও কোন আভাস পাই না।

রমণী বাবুর সঙ্কলনের আভাস পাইয়া আমি পত্রিকা বিশেষে জ্ঞানদাসের অপ্রচলিত কয়েকটী পদ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। রমণীবাবুর গ্রন্থে সংগৃহীত হয় নাই, এমন পদ আমার নিকট আছে। তাহার কয়েকটী এখানে প্রকাশিত করিলাম।

(১)

কসিত কনক রুচির গৌর, অখিল ভুবন মরম চৌর,
কবভ শুণ্ড বাহুদণ্ড গমন গীম চালনী,
প্রচুর পুলক শোভিত অঙ্গ, নটন লিল অধিক রঙ্গ,
বদন শরদ পুণিম ইন্দু সরস হাস ভাসনী।
আজু বলী গৌরচন্দ্র, তরুণীলাখ নয়ন ফন্দ,
উরহি দোলত কুসুমদাম ভালে তিলক লাবণী;
গমন মত্ত মাতঙ্গ ছান্দ, নিয়ত মদন হৃদয় ফান্দ,
সহজ ললিত মধুর ভাতি জগত লোক বন্দনী,
তরুণ বয়স গৌর দেহ, অন্তরে উথল গোকুল লেহ,
ভাবে ভগল মরম রতন চৌদিগ সঘন চাহনী,
ধন্য ধরণী ধন্য কাল, ধন্য ধন্য পঁহু দয়াল,
করণ কীর্ত্তন ভাবল জীব জ্ঞানদাস গুণ গাওনী।

(২)

কাচা কাঞ্চন তনু চন্দন ভালে,
আজানুলম্বিত উরে মালতীর মালে।
পুলকের শোভা কিবা নবনীপ ফুলে,
কুন্তলে কুসুম কত শত অলিকুলে।
ভুবনমোহন রূপ মনমথ লীলা,
চান্দের অধিক মুখ শশি ষোলকলা।
হেম করিকর জিনি ভুজ যুগ শোভা,
গমন মাতঙ্গ জিনি জগমন লোভা।
আবেশে অবশ অঙ্গ বোলে হরি হরি,
কি লাগি ঝরয়ে আঁখি বুঝিতে না পারি।
গদাধর আদি যত সহচর সঙ্গে,
নিজ নিজ ভাবে সবে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
যাহাতে ধরণী ধন্যবিশেষ নদিয়া,
জ্ঞানদাস বড় দুঃখী তাহা না দেখিয়া।

(৩)

ভুবন সুন্দর গৌর কলেবর আজানু ভুজ-যুগ লোল,
অরুণ নয়ানে বয়ানে বাহিয়া পড়ই প্রেম হিল্লোল,

গোরা রূপ হেরি জগমন কান্দে,
চাঁদ জিনি মুখ অধিক ঝলমলি
কুমুদ পড়ি গেল ধান্দে।
ভাবে গর গর গৌর গম্ভীর জগত বৈচিত্র চলে,
সজল নয়ানে চৌদিক হেরিয়া রহে গদাধর কোলে।
হাস গদ গদ বচন অমৃত সিঞ্চিত জীব জন্তু লত'
জ্ঞানদাস কহ গড়ল না ওরূপ সে পুন কেমন ধাতা।

(৪)

কিরূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে,
ঘর যাইতে না লয় মন পরাণ কেমন করে।
নয়ানে লাগল রূপ কি আর বলিব,
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব।
নিবারিতে নারি চিত ঝরে রাতি দিনে,
আকুল করিল মোরে কালার বরণে।
কালিয়া বরণ কিরে অমিয়ার সার,
জ্ঞান কহে না জানিয়ে যে পিন্দ একবার।

(৫)

চলিতে না চলে পা, কিবা সে হেলনি গো,
রাজ পথে নিতাযের নাট।
সঙ্গের যতেক সঙ্গী, তা বড় তা বড় রঙ্গী,
অতি অপরূপ রসের হাট।
এ দেশে এমন না ছিল এতদিন, নিতাই চাঁদের হেন লীলা।
দিনে দিনে লোকের চিত, আঁখি উলসিত
কাল কলি রসে ভুলি গেলা।
শুনিয়া ভাই এর কথা, পুরুবে বারুণী পিতা,
সে সব আভাসে হাস মুখে,
না করে কাহারে ভিন, এই যে প্রেমের চিন,
দিগ বিদিগ নাহি সুখে।
রাত্র দিনে আন নাই, কহিতে লোকের ঠাঁই,
আবেশে অবশ হৈয়া পড়ে,
জ্ঞানদাস এই কয়, জগভরি জয় জয়,
ভব ভয় সব গেলা দূরে।

টীকা ও পাঠান্তর সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের সমালোচনার সময় আমি যাহা বলিয়াছিলাম, রমণী বাবুর জ্ঞানদাসের সমালোচনা করিতে তাহা অপেক্ষা নূতন কিছু বলিবার নাই। রমণী বাবু যেরূপ যত্নে পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছেন, প্রকৃত পাঠ নিরূপণে বা অর্থ নির্দ্দেশে তাহার একাংশ ব্যয় করেন নাই।

অমৃতবাজার পত্রিকা যখন বাঙ্গলা ভাষায় লিখা হইত, তখন একজন শিক্ষকের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় পাঠ্য পুস্তকে "বৃষ" পাইলে তাহার অর্থ "ষাঁড়" জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেন এবং কেহ সে অর্থ লিখিয়া না লইলে তাহার দণ্ড দিতেন। কিন্তু মেঘনাদ পড়িতে পড়িতে ছাত্রগণ "নিষ্কোষিলা" শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিত মহাশয় গল্প করিতে বসিতেন এবং পীড়াপীড়ি করিলে, ছাত্রগণ এমন সহজ কথার অর্থ জানেনা বলিয়া তাহাদিগকে তাড়না করিতেন। রমণী বাবুর টীকা সেইরূপ।

জারল অর্থ জর্জ্জরিত করিল, আনলে অর্থ অনলে ইত্যাদি অনেক টীকা আছে। কিন্তু এমন চরণ গুলির কোন টীকা দেখা যায় না।

"বরণ কাঞ্চন এদশ বাণ"
"জড়িত হৃদয়ে করত ভেদ"
"আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে"
"চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদে ধান্দা"
"তার মাঝে হিয়ার পুতলি রহিল বান্ধা"
"আরতি রহল কহব পুন রেরি"
"বিহি উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ"
"হেরইতে হরখে হরল মৃগচারি"
"চান্দ চন্দন মলযজ বাতে"
"অতি রসে বাদর নহে পর ভাতে"

পরথাব অর্থ কি প্রভাব না প্রস্তাব?

"আন দিনে শ্রবণে না দেই পরথাব"
"সজনি দূরে কর ও পরথাব"

পরথাব হইতেই "পরথাপলু" শব্দের উৎপত্তি

তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপলু
সবহু আন কবি মানে

পরথাপলু অর্থে প্রতিষ্ঠা করিলাম লিখা হইয়াছে।

"এ রস লালস সব সম্ভাপনা
এ নাকি নহিলে জী"

সম্ভাপনা শব্দে অর্থ কি "অনুগ্রহ?"

পরসাদে অর্থ প্রসন্ন লিখা হইয়াছে। নিছনি শব্দের অর্থ লইয়া ইতিপূর্ব্বে সাধ-

নায় কিছু তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। অর্থ স্থির হয় নাই। এ জন্য বোধ হয় রমণী বাবু এ শব্দটীর অর্থ নিরূপণে প্রয়াস করেন নাই।

আরতি ও শমতি শব্দের অর্থ কি?

রমণী বাবু লিখিয়াছেন, শমতি অর্থ শমতা এবং আরতি অর্থ আসক্তি।

জ্ঞানদাসের পদাবলী মধ্যে যে যে স্থানে এ দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শমতি না দেই দিন রজনী রোয়"
"ডাকিলে না শমতি দেয় আঁখি মেলি কান্দে
"সজল নয়নে ধনী মঝু মুখ হেরি
আরতি বহল কহব পুন বেরি"
"পিরীতি আরতি দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে।'
"গলে গলে লাগল হিকে হিয়ে এক
বয়ানে রহ আরতি অনেক"
"প্রেম পরশ রস আরতি অমূল"
"মঙ্গল আরতি সখি করয়ে সেবন"
"রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাড়াই"
"আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর"
"আরতি অধিক নাহি কিছু লাভ"
"রাধা রসবতী অতিরসে আরতি"
"রাধা রাতি দিবস রস আরতি"
"রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।"
"নব নাহি ঘোর যেন জাগিয়ে স্বপন হেন
আরতি কহনে না যায়।"
"একে কুলবতী চিতের আরতি"
"একে দেখি অতি চিতের আরতি"
"সে সব পিরীতি আদর আরতি"
"পহিল বয়স একে আরে নব আরতি"
"পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুণি"
"পরশে প্রেম পুরয়ে নাহি আরতি"
"বন্ধুর আরতি হিয়ার মালা"
'হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ"
'একে নব পিরীতি আরতি অতি দুরগম"
"পহি লহি কি কহব আরতি বাণী"
"মঝু এত বচনে তুয়া নাহি আরতি।"

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বিদেশী বাঙ্গালী। [৩]

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। *

রাজনীতি-শাস্ত্র-বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক মেকিয়াভেলি বলেন;—

"গুণবান বা ধনবানের পুত্রের পক্ষে গুণোপার্জ্জন বা ধনোপার্জ্জন করা কঠিন কথা নহে, কেননা, তাহা স্বাভাবিক, কিন্তু গুণহীন বা ধনহীনের সন্তান যদি অতুলনীয় গুণের আধার বা মহাবিভবের অধিপতি অথবা কোনও কীর্ত্তি কলাপের কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে ইহা বড়ই গুণপনা ও প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। বহুযত্নে পালিত, সুচারু রূপে রক্ষিত, উর্ব্বর ক্ষেত্রে উৎপন্ন এবং যথানিয়মে বর্দ্ধিত মহীরুহের সুন্দর সুপক্ক এবং সুস্বাদু ফল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অনুর্ব্বর ভূমিতে অযত্নে পতিত, শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড হইতে হঠাৎ যদি কেহ মনোহর তরু উৎপাদন করিয়া তাহাতে অনুপম ফল ফলাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি জগতে ধন্য এবং স্বনামধন্য পুরুষ মধ্যে গণ্য। বাস্তবিক যে দেশে দরিদ্র সমাজ হইতে নিঃসম্বল লোকেরা নিজের সাহসে ও ক্ষমতায় দেশহিতকর বা সমাজ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, সে দেশের উন্নতি অচিরকালেই সংঘটিত হইয়া থাকে এবং সে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা হীনতর হইলেও ভবিষ্যৎ ভরসা বড়ই প্রবল হইয়া উঠে।"।

পণ্ডিতপ্রবর মেকিয়াভেলির এই অভিমত যদি যুক্তি-সঙ্গত ও বহুদর্শন-সিদ্ধ হয়,

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র অতি সংক্ষেপে চৈত্র মাসের "সঞ্জীবনীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। নব্যভারতে ইহা বিস্তৃত রূপে ও পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত হইল। (লেখক)

তাহা হইলে নানা কারণে আমাদের মাতৃভূমিকে—বঙ্গদেশকে—ধন্য বলিতে হইবে। নিঃসম্বলাবস্থা হইতে অল্পে অল্পে প্রোথিত হইয়া বঙ্গভূমির অনেক গুণবান সন্তান ভারতহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। যে সকল মহাত্মার নাম এই শ্রেণীভুক্ত, কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহাদের অন্যতম। সংসারত্যাগী হইয়া তিনি নিঃসম্বলাবস্থাতেও যে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিপুঞ্জ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য। মহতের জীবনী আলোচনার ফলও মহৎ হয় এবং মহত্ত্বের বীজ মানবের হৃদয়-ক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়া যায়। কবিকুলরবি লংফেলো সত্য সত্যই বলিয়াছেন ;—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time;—
Footprints, that perhaps another,
Sailing o'er life's solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again.
Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate,
Still achieving, still pursuing,
Learn to labour and to wait."
(Longfellow)

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাচীন বঙ্গে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, নবীন বঙ্গে তাহাদের স্থানাধিকার করিতে একটিকেও দেখিতেছি না। প্রাচীন বঙ্গ হইতে যে উন্নতির বীজ লইয়া গিয়া দূর দেশে বাঙ্গালী-মহাত্মারা কীর্ত্তিমহীরুহ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সে বীজ এখন কোথায় গেল? এখন চারিদিকেই নিরাশার ঝড় বহিতেছে, বোধ হয়, বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র আশা-কুটীর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। সমাজের এরূপ অধঃপতন, জাতির অধঃপতনের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। গুণবান বাঙ্গালীর মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত নহি, কেননা মৃত্যু মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। "যাহার জন্ম, তাহার মৃত্যু" এ কথা নিশ্চয়, কিন্তু যে সকল বাঙ্গালীকুল-ধুরন্ধর ইহজগত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্থানে তাঁহাদের তুল্য আর কাহাকেও দেখিতেছি না, ইহাই দুঃখের কথা।

কৃষ্ণানন্দ স্বামী অতি অল্পদিন হইল দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে তাঁহার অতীব বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। তাঁহার গলিত দেহে, পলিত কেশে, জীর্ণমাংসে, দৃষ্টিশূন্যচক্ষে এবং ভগ্নকণ্ঠে যে তেজ, যে সাহস, যে উত্তেজনা, যে স্বজাতিবৎসলতা দেখিয়াছি, তাহা, ত্রিংশবর্ষ বয়স্ক কোনও বাঙ্গালী যুবকে দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। কৃষ্ণানন্দ মরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যশ ও কীর্ত্তি এখনও তাহাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। এই ব্রহ্মব্রতপরায়ণ মহাজন স্বর্গবাসী হইয়াছেন, কিন্তু ভূতলে তাঁহার যশঃরাশি "স্বর্গবাসী দূত"-দিগের অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবান্বিত অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান। সুগন্ধ গোলাপ শুকাইলেও কি তাহার সুগন্ধি যায়?

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী জাতিতে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং নৈকষ্য কুলীন। বোধ হয় "মুখোপাধ্যায়" তাঁহার উপাধি ছিল, তিনি "ফুলের (ফুলিয়া) মুখুটী" ছিলেন। দার পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই অতি তরুণ বয়সে তিনি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মচারী হইয়া কাশ্মীর, নেপাল, মহীসুর, ত্রিবাঙ্কুর, হয়দ্রাবাদ, বরোদা, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্য এবং সমগ্র বৃটিশাধিকৃত ভারত পর্য্যটন করেন। তদ্ভিন্ন সিংহল, বালাদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার দেশত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু একথা ঠিক যে, তিনি বিবাহ

করেন নাই, চিরকুমার ছিলেন। "কৃষ্ণানন্দ" তাঁহার পিতৃদত্ত নাম নহে, ইহা তাঁহার গুরুদত্ত নাম। ভারতের অনেক প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী বা পরমহংসের আদি নাম পাওয়া যায় না, ইঁহারা দীক্ষার পর গুরুদত্ত নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। নির্ভয়ানন্দ, জ্ঞানানন্দ, ত্রিগুণাতীত, বিবেকানন্দ, রামদাস, পুরাণপুরী, গিরিরাজ স্বামী প্রভৃতি নামে ইঁহারা কথিত হয়েন। শাস্ত্রের অনুজ্ঞা এই যে, সংসার ত্যাগ করিলেই সংসারের নিয়ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, সাংসারিক উপবীত, সাংসারিক গায়ত্রী পর্য্যন্ত রাখিতে আদেশ নাই। যাঁহারা "স্বামী" বলিয়া পরিচয় দেন, অথচ সাংসারিক নামটী ব্যবহার করেন, তাঁহাদের প্রকৃত দীক্ষা হয় নাই, ইহাই সাধারণ মত। যাঁহারা দীক্ষার সময় নিজের নাম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়েন না, গুরু তাঁহাদিগকে দীক্ষা দেন না; বলেন "তোমার এখনও সাংসারিক স্বার্থ যায় নাই, সংসারের দিকে এখনও তোমার আকর্ষণ আছে, অতএব তুমি দীক্ষার অনুপযুক্ত।" দুঃখের বিষয়, আজি কালি কলিকাতা, নবদ্বীপ ও কাশীর অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচারক "স্বামী" "ব্রহ্মচারী" এবং "উদাসী" বলিয়া পরিচয় দেন, অথচ হিন্দুশাস্ত্রের অনুজ্ঞা রক্ষা করেন না। নিজের নামটা ব্যবহার করিয়া যশস্বী হইবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। "হিন্দু" বলিলে হিন্দুশাস্ত্রটাকেও মানা চাই, যাঁহারা তাহা না করেন, তাঁহাদের হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের অধিকার আছে কিনা, অথবা "স্বামী" বলিবার অধিকার জন্মিয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। "স্বামী" শব্দে পরমহংস বুঝায়; যাঁহাদের ষড়রিপু দমিত হইয়াছে, যাঁহারা স্বুবর্ণ ও মৃত্তিকাকে সমজ্ঞান করেন, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ ব্রহ্মজ্ঞানই চরম ও একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহারাই পরমহংস। গীতায় লিখিত আছে।

"নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা
বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখ সংজ্ঞৈ র্গচ্ছংন্ত্যমূঢাঃ পদমব্যয়ং
তৎ॥" (১৫ অধ্যায়। ৫ শ্লোক।)

পরমহংসের এই লক্ষণ। এখন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরমহংস!! পাঠক মহাশয় বলুন দেখি, এই ভণ্ডদিগের কয়জন প্রকৃত পরমহংস বা স্বামী। এই জন্যই কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বলিতেন "আজকাল পেটে যাহার অন্ন নাই, অথবা পেশাদারী (ব্যবসা) করা যাহার উদ্দেশ্য, সেই ব্যক্তিই পরমহংস ব্রত ধারণ করে।" বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, কলিকাতার বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রের দুই একটী পেশাদার সম্পাদক, অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশে, "পরমহংস" ভাড়া করিয়া আনে এবং একটা অর্থশূন্য ধর্ম্মান্দোলন করাইয়া পুস্তক ও সম্বাদপত্র বিক্রয়ের উপায় করিয়া লয়।

মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী নিজে আপনার পরিচয় কাহাকেও দেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি হাবড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইংরাজী ১৮৭০ অব্দে তিনি কাশীধামের এক বন্ধুকে পত্র লেখেন, সেই পত্রের পরিশিষ্ট ভাগ পাঠ করিলে, তাঁহাকে হাবড়া জেলা নিবাসী বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়। পত্রের পরিশিষ্ট ভাগ এইরূপ—

"উত্তরা খণ্ডে অর্থাৎ বদরীনারায়ণ ধামে আমার থাকিবার কথা সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা এখন যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার জীবনের প্রথম অবস্থায় আমি তথায় থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যে সকল কারণে তখন এই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলাম, এখনও সেই সকল কারণে ইচ্ছা ত্যাগ

করিতেছি। আমার জন্মস্থান হাবড়া জেলায় এখন আমার যাইবার ইচ্ছা নাই। তথায় কে মরিয়াছে,কে জীবিত আছে, সে কথার এত বৎসর পরে প্রসঙ্গ করা তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচনা করি।"

কৃষ্ণানন্দ ইংরাজী জানিতেন না,বাঙ্গালা ভাষায় বেশ দক্ষ ছিলেন, হিন্দি ও উর্দ্দু এবং কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও শিক্ষা করিয়াছিলেন। নিয়তঃ ভ্রমণ করিতেন বলিয়া তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার ভাল অবসর মিলে নাই, কিন্তু সতত বাঙ্গালা গ্রন্থাদি ও সমাচার পত্র পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় তিনি অনেক দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং নানা দেশের আচার ব্যবহার দশন করিয়া প্রভূতরূপে বহুদর্শী হইয়া উঠেন। মানবচরিত্র অতি সহজেই তিনি বুঝিতে পারিতেন। ইতিহাস ও ভূগোলে তাঁহার বিশেষ পারদর্শীতা ছিল। সময়ে সময়ে নিভৃত গিরিগুহায়, নদতটে, কুঞ্জের মধ্যে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। কামরূপ, নেপাল, জ্বালামুখী, হিংলাজ প্রভৃতি স্থানে অনেক দিন তিনি ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। আরাবল্লী গিরির শিখরস্থ তাঁহার এক কুটীর অল্প দিন হইল প্রবল বায়ুতে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, এই স্থানে তিনি এক বৎসর কাল তপঃ সাধন করিয়াছিলেন। বারাণসী ধামে, গঙ্গাতটে, তাঁহার এক কুটীর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, বিদেশে ভ্রমণ করিতে হইলে বিদেশের ভাষা শিক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক। আরও দেখিলেন যে, বিদেশে বাঙ্গালীদিগের থাকিবার জন্য কোনও আশ্রয় স্থান নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া, তীর্থ স্থান সমূহ পর্য্যটন করিয়া আসিয়া, আমি আমার জীবন স্বজাতির উন্নতি ও শুভকল্পে ব্যয় করিব।" এই ভাবিয়া তিনি ভ্রমণ সমাপ্ত করিবার অব্যবহিত কাল পরে এলাহাবাদে উপনীত হইলেন। স্থির করিলেন যে, "প্রথমতঃ আমাকে তিনটী প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে হইবে। অন্য শুভ কার্য্য করিতে পারি আর না পারি, অন্ততঃ এই তিনটী শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মরিতে পারিলে আমি আমার জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব।" প্রথম কার্য্য, সংস্কৃত চর্চ্চায় উৎসাহ; দ্বিতীয় কার্য্য, বাঙ্গালীদিগের থাকিবার জন্য সাধারণ গৃহ-নির্ম্মাণ; তৃতীয় কার্য্য, বাঙ্গালী জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি। তিনি ভাবিলেন, গৃহ নির্ম্মাণ হইলেই তাহাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে এবং পরিব্রাজকদিগের আশ্রয়ের স্থানও হইবে। তৎসঙ্গে সঙ্গে যে সকল উপায়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে, তাহারও উপায় বিধান করা যাইবে। এই ভাবিয়া প্রথমেই গৃহ নিৰ্ম্মাণের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কি প্রকারের গৃহ নির্ম্মিত হইলে কামনা সিদ্ধ হইতে পারে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলেন যে,যদি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে অন্ততঃ একটী করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ মন্দিরে শাস্ত্রাদিরক্ষা,শাস্ত্রাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতে পারিবে; পরিব্রাজক বাঙ্গালীদিগের জন্য স্থানও হইবে এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্তও হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মচারী মহাশয় "শাক্ত"অর্থাৎ দেবী উপাসক ছিলেন,সুতরাং কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করাই স্থির করিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত কালীমন্দির সমূহ বিদেশে এখনও বাঙ্গালীর কালীবাড়ী বলিয়া বিখ্যাত।

নিঃসম্বলাবস্থায়, কপর্দ্দকশূন্য হস্তে, ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রায় লক্ষাধিক টাকার কর্ম্ম হস্তে গ্রহণ করিলেন ; মূর্খেরা বলিয়া উঠিল, "বামন হইয়া চাঁদকে ধরিতে যাইতেছে"। কিন্তু তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া,বিদেশী বঙ্গসমাজকে সচেতন করিয়া, বহু রাজা ও ধনবানের নিকটে গিয়া ভিক্ষা করিয়া,ঘোরতর আন্দোলন করিতে করিতে, খালিপায়ে, রুক্ষকেশে, পিপাসিত কণ্ঠে ও ক্ষুধিত দেহে, সফলতার বিঘ্ন সকল দেখিতে পাইলেন। বলিলেন "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।" যে কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে করিতে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এই মহৎ কর্ম্মে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাওযা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহার এক সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী বান্ধব তাঁহাকে এই সময় লিখিয়াছিলেন।

"আপনি চাতকের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চক্রবাকের ন্যায় ক্ষিপ্রহস্ত এবং পিপিলীকার ন্যায় পরিশ্রমী। আপনার মত বারজন উৎসাহী লোক পাইলে আমি অলৌকিক কর্ম্ম সাধন করিতে পারি। আপনাতে বোধ হয অমানুষিক তেজ আছে ; এই তেজ আপনার শ্রেণীর লোকের পক্ষেই সম্ভব। বাঙ্গালীতে যাহা কিছু সম্ভব,হিন্দুস্থানীতে তাহা সম্ভব নয় , হিন্দুস্থানী কখনও বাঙ্গালীর গুণপনা অধিকার করিতে পারিবে না। বাঙ্গালী ভিন্ন এত মহৎ গুণ একাধারে আর কোথাও দেখি নাই।"

সেই নিঃসম্বল উদাসীন ব্রহ্মচারী মহাশযের নিঃস্বার্থ স্বজাতি-বৎসলতার ফলে,পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, মধ্য-ভারতে এবং পঞ্জাবে এখনও তাঁহার নামকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত মন্দির গুলির অবস্থা এখনও সুন্দর এবং অতিসুন্দর ভাবে অনেক মন্দিরের কার্য্য এখনও চলিয়া আসিতেছে। নিম্নলিখিত নগরে তাঁহার কালীবাড়ী এখনও বর্ত্তমান। রাজপুতানায়—নশিরাবাদ, নিমচ, বয়েরা এবং ভরোই। মধ্যভারতে—মোরার (গোয়ালিয়র) এবং উজ্জয়িনী। পঞ্জাবে—সিমলা, পেশোয়ার, লাহোর, জলন্ধর, মৈণমীর, অম্বালা, রাউলপিণ্ডি, থানেশ্বর,কর্ণাল,মুলতান,দিল্লী,বুকসা, নশীখাঁ এবং পূর্ণাপুর। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে—ফতেবাদ, মিরট, আগ্রা, আলাহাবাদ, বেনারস,জালগ্রাম এবং চিত্রকোট।* অযোধ্যায়—শ্রীপুর ও গুরগ্রাম। পার্ব্বত্য প্রদেশে—কাল্‌কা এবং ময়না। বেলুচিস্থানে—কোয়েটা। ব্রহ্মচারি মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "যদি জীবিত থাকি,তাহা হইলে অন্ততঃ একশতটি প্রধান প্রধান নগরে মন্দির স্থাপিত করিয়া যাইব। এই সকল মন্দিরে ভ্রমণকারী বাঙ্গালী থাকিতে পারিবে এবং দরিদ্র হইলে কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাদের আহারেরও বন্দোবস্ত করা যাইবে। কিন্তু ৩২টি মন্দির সমাপ্ত না হইতে হইতেই জ্বর ও উদরাময় রোগে এলাহাবাদের কালীবাড়ীতে ইং ১৮৮২অব্দে,৯২বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্থাপিত মন্দির সমূহ "বাঙ্গালীর কালীবাড়ী" বলিয়া দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধ। সরকারী ডাকখানায়,আদালতে, রেলওয়ে ষ্টেশনে,বাজারে, "বাঙ্গালীর কালীবাড়ী" এক পরিচিত স্থান। কোনও সময়ে বাঙ্গালী কালীবাড়ীর নামে সহরের লোক কাঁপিত, ব্রহ্মচারীর প্রতাপে "বাঘে ছাগে এক ঘাটে জল খাইত।"

সুবিখ্যাত উকীল (হাইকোর্টের) বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এক সময়ে হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিয়াছিলেন।

* ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অণুকরণে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়,এটোয়া নগরীতে একটী কালীবাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

"পূজ্যপাদ কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয়ের দুই একটা মন্দির আমি দেখিয়াছি। বিদেশে এই রূপ স্থান না থাকিলে, তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারী বাঙ্গালীর যে কি কষ্ট হইত, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এই সকল মন্দিরে শত শত কাঙ্গালী বাঙ্গালী বিদেশে আহার পাইতেছে এবং নানা রোগ ও বিপদ হইতে পবিত্রাণ পাইতেছে। কৃষ্ণানন্দ মহাত্মা আমাদের সকলেরই নমস্য।"

অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল, অম্বালা ও সিমলা শৈলের কালীবাড়ী দেখিয়া বলিয়াছিলেন।

"এরূপ মহাত্মার নাম স্মরণ করিলেও পাপক্ষয় হয়, এমন পুণ্যাত্মা বাঙ্গালী কুলে অতি কম।"

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গণ্য মান্য নেতা ভারত-বিখ্যাত বাবু নবীন চন্দ্র রায় মহাশয় অতি তরুণ বয়সে দীন হীন অবস্থায় পঞ্জাবে উত্তীর্ণ হয়েন। ইনি শেষে পঞ্জাবের দেশীয় সমাজের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠেন এবং একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। সাধু নবীন বাবু স্বশক্তি বলে পঞ্জাবের অনরেরি মাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস্ অব দি পিশ্, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, পরীক্ষক এবং ডেপুটী রেজিষ্ট্রার, লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং ডেপুটী একাউন্টান্ট জেনেরল পদে বরিত হইয়াছিলেন। অল্প দিন হইল নবীন বাবুর মৃত্যু হইয়াছে; তিনি তাঁহার স্বহস্তে লিখিত এক বাঙ্গালা রোজনামচায় লিখিয়াছেন,—

"চাকুরীর জন্য আমাকে অনেক স্থানে অনাথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, আমি জীবনের অধিকাংশ কাল অতি দীন হীনের ন্যায় কাটাইয়াছি; একটি পয়সার অভাবে সমস্ত দিন অনাহারে গিয়াছে, এমন দিনও দেখিয়াছি। ভ্রমণের সময়ে যেখানে যেখানে মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ স্বামীর কালীবাড়ী পাইয়াছিলাম, সেইখানেই পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছি ও মনের সুখে নিদ্রা গিয়াছি। অনেক কষ্টে লাহোরে পৌছিলাম এবং প্রোক্ত মহাত্মার কালীবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। স্বামী মহোদয়ের কালীবাড়ী না থাকিলে লাহোরে আমার থাকা হইত না; আমি এখন উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত পুরুষ; ইহা কেবল সেই মহাত্মার চরণকৃপায়। তাঁহারই প্রাসাদে প্রসাদ্ পাইয়া আমি মানুষের মত হইতে পারিয়াছি, জীবনেও সেই পুণ্যবান মহাত্মার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। আমার ন্যায় কত শত হতভাগা, কৃষ্ণানন্দের কালীবাড়ীর কৃপায়, শ্রীমন্ত পুরুষ হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হয়, একবার সেই মহাত্মাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া পূজা করি।"

লাহোরস্থ আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু সার্দ্ধ দুই শত টাকা বেতনের চাকুরী করিতেন, সম্প্রতি পেন্সন লইয়াছেন। ইনি স্বামী কৃষ্ণানন্দ সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছেন।

"মহাত্মা কৃষ্ণানন্দের নাম স্মরণ হইলেই আমার সমগ্র শরীর প্রেমে পুলকিত হয় এবং ভক্তিভরে তাঁহার চরণোদ্দেশে শিরনত হইয়া যায়। ইনি মনুষ্য ছিলেন, কি নরাকারে দেবতা ছিলেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আমরা ইঁহারই চরণে পেটের অন্ন সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছি, দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইঁহার অন্ন ও জলে দেহ রক্ষা করিয়াছি, সঙ্গে একটি পয়সা মাত্র ছিল না, ইঁহার কালীবাড়ী না থাকিলে আমাদের কি গতি হইত, তাহা বলিতে পারি না। ইহ জগতে কৃষ্ণানন্দ স্বামী ভিন্ন আর কোনও মনুষ্যকে অধিক ভক্তি বা মান্য করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। ইঁহার কোন্ গ্রামে নিবাস ছিল, জানিনা, কিন্তু যে মহাপবিত্র গ্রামে ইঁহার নিবাস, সেই গ্রামের এক তোলা মৃত্তিকা, এক তোলা সোণা হইতেও আমার নিকট অধিকতর মূল্যবান। সেই অনুপম মহাত্মা মানবকুলের গৌরব, বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।"

কর্ণেল অল্‌কট্ সাহেব থিয়সফিষ্ট পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—

"নশিরাবাদ, অম্বালা, শিমলা ও রাওলপিণ্ডির কালীবাড়ী মহা ধূমধামে পরিচালিত হয়। দুই একটা কালীবাড়ী দেখিলে চক্ষু স্থির হইয়া যায়।"

একজন উদাসীন রিক্তহস্ত ব্রাহ্মণের

চেষ্টায় কতশত বাঙ্গালীর উপকার হইয়াছে, তাঁহাদের সুবিধার জন্য কেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বিশাল উদ্যান এবং সুন্দর কূপ সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখিলে হর্ষে হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। প্রতি কালী-বাড়ীতে পুরোহিত, পাঠক ও ভৃত্য থাকে। তাঁহাদের খরচ কালীবাড়ী হইতেই চলিয়া যায়। স্থানে ২ মন্দিরের কমিটি আছে। এই সকল মন্দির দেখিলে বাঙ্গালা জাতির মহত্ত্ব মনে পড়ে এবং কৃষ্ণানন্দের আত্মাকে দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (৯)

মহারাজ হরিসিংহদেবের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে মল্লবংশীয় মহারাজ প্রতাপ-মল্লের স্বরচিত বংশাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে। ৭৭৮ নেপালী সংবতের (১৬৫৮ খ্রীঃ) মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ও রবিবারে মহারাজ প্রতাপমল্ল মহাসমারোহের সহিত "তুলাপুরুষ"নামে দান ব্যাপার সম্পন্ন করেন। তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ও প্রবালের সহিত মানযন্ত্রে তুলিত হন। তৎপর সেই সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থীদিগের মধ্যে বিতরিত হয়। এই উপলক্ষে সুকবি রাজা প্রতাপ-মল্ল পূর্ব্বোক্ত বংশাবলী রচনা করেন।

"নেপালে সংবতেঽস্মিন্ হয়গিরি মুনিভিঃ সংযুতে, মাঘমাসে,
সপ্তম্যাং শুক্লপক্ষে রবিদিনসহিতে রেবতী ঋক্ষরাজে।
যোগে শ্রীসিদ্ধি-সংজ্ঞে রজতমণি লসৎ স্বর্ণ-মুক্তাপ্রবালে
রেকীকৃত্য প্রদত্তং হয়শতসহিতং যেন দানং তুলাখ্যং॥ ১০॥

এই বংশাবলীতে সূর্য্যবংশীয় হরিসিংহ দেব মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ যক্ষমল্লের পিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, যক্ষমল্ল হরিসিংহদেবের দৌহিত্র বংশে আবির্ভূত হন। প্রতাপমল্লের নামাঙ্কিত ৭৬৯ নেপালী সংবতের (১৬৪৯ খ্রীঃ) অপর একখানি শিলালিপিতে নান্যদেবের বংশধর কর্ণাটক-সূর্য্যবংশীয় হরসিংহদেব যক্ষমল্লের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে উক্ত উভয়বংশের সহিত মল্লবংশের ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক সম্পর্ক সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। প্রাগুক্ত বংশাবলী হইতে রাজা-প্রতাপমল্লের পূর্ব্বতন যক্ষমল্ল, রত্নমল্ল, সূর্য্য-মল্ল, নরেন্দ্রমল্ল, মহীন্দ্রমল্ল, শিবসিংহ, হরিহর সিংহ ও লক্ষ্মীনরসিংহ মল্লের নাম জানা যাইতেছে। কাটমাণ্ডুর অধিপতি লক্ষ্মীনৃসিংহ মল্লই মহারাজ প্রতাপমল্লের পিতা। প্রতাপ মল্ল সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। স্বরচিত বংশাবলীতে তিনি আপনাকে "শ্রীমহারাজা-ধিরাজ শ্রীশ্রীরাজরাজেন্দ্র-কবীন্দ্র জয় প্রতাপ মল্ল দেব" নামে পরিচিত করিয়াছেন। এই শিলালিপির দশম ও একাদশতম শ্লোক ইতি-পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে মহারাজ প্রতাপমল্লের রচিত আরও কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা হইতে "কবীন্দ্র" প্রতাপমল্লের রচনার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"শ্রীলক্ষ্মীনরসিংহ-ভূপতি দিবপ্রস্থানকালোদ্যতে,
দেবৈঃ শঙ্খমৃদঙ্গভেরিপটহ-ধ্বানৈর্দিশঃ পূরিতাঃ।
প্রৌঢাঃ পূবতরাঃ প্রদারিতরিপোর ক্ষাণ্ডচণ্ডোল্লসন্
মাগেশেধবিনির্গতাঃ স্বয়মিতাঃ প্রাণা স্বয়োঽস্তামলাঃ॥ ২৩॥
তৎপুত্রোঽসৌ কবীন্দ্রঃ ক্ষিতিপতিতিলকঃ শ্রীপ্রতাপাভিধানঃ,
সংগ্রামে বৈরিবর্গপ্রবলতবল-সদর্প-দাবানলাভঃ।
তর্কালঙ্কার-কোষাদিক-সকল মহাশাস্ত্রমার্গ প্রবীনো
নানা গদ্যানবদ্যা-সুললিতকবিতা-নর্ত্তকী-রঙ্গভূমিঃ॥ ২৪॥

শম্ভে শাম্ভবরে সদাসুখকরে সঙ্গীতবিদ্যাবরে,
সানন্দং কেলিকর্ম্মকুশলব্যাপার কণ্ঠীরবং।
স্বর্গে ভূমিতলে তথাদশদিশাং প্রান্তে গিরৌ কাননে,
কোপ্যস্তীতি নিগদ্যতে মম সমো রাজেন্দ্র-চূড়ামণিঃ॥২৯॥
মাধুর্য্যাদিবিচিত্রভাখিলপদন্যাসৈ র্মোহাবিণী,
সংক্ষিপ্তেন কবীন্দ্রভূমিপতিনা বংশাবলী নির্ম্মিতা।
প্রত্যেকং কিল কীর্ত্তিশৌর্য্যনিখিলপ্রৌঢ়প্রতাপাদিকং
ভূপালাং রচিতুং বিমৃশ্য নিপুণং শক্তো নবা বাক্‌পতিঃ॥৩০॥

প্রতাপমল্ল মল্লবংশের সর্ব্বপ্রধান নরপতি ছিলেন। তাঁহার আধিপত্য নেপালের সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। তিনি বর্ত্তমান গোরখারাজ বংশের আদিপুরুষ ডম্বর সাহকে সসৈন্যে যুদ্ধে পরাজিত করেন। পণ্ডিত ভগবান ইন্দ্রাজীর মতে ডম্বরসাহ ১৬৩৩ খ্রীঃ গোরখা জাতির আধিপত্য নেপালের প্রান্তভাগে বিস্তারিত করেন। সম্ভবত ১৬৪২ খ্রীঃ ডম্বর-সাহ মহারাজ প্রতাপমল্লের দ্বারা পরাজিত হন। প্রতাপমল্ল ভাটগাঁর রাজা নরেশমল্ল (নরেন্দ্রমল্ল) হইতে কররূপে একটী হস্তী গ্রহণ করেন এবং ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধি নৃসিংহমল্লের অধিকৃত দুর্গাবলী বাহুবীর্য্যে গ্রহণ করেন। নরেশমল্ল ও সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল উভয়েই প্রতাপমল্লের পিতৃব্য ছিলেন। তিব্বত ও ভোটান পর্য্যন্ত মহারাজ প্রতাপমল্লের অধিকার বিস্তারিত হয়। তিনি তিব্বতের অধিপতি এবাবদীকে রণে পরাজিত করিয়া, কুতিখাসাকির নামক প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষী রূপমতী কোঁচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রাজমতী কর্ণাটরাজের দুহিতা ছিলেন।

মহারাজ প্রতাপমল্লের নামাঙ্কিত এক শিলালিপি হইতে প্রাগুক্ত বিবরণ সংগৃহীত হইল। ৭৬৯ নেপালী সংবতের (১৬৪৯ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ও বৃহস্পতি-বারে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়। পূর্ব্বোক্ত উভয় মহিষীর আবাসের জন্য এক অষ্টভুজ ত্রিতল প্রাসাদ সেই দিনে বিহিতবিধানে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাটমাণ্ডুর বর্ত্তমান রাজ-প্রাসাদের অনতিদূরে এই প্রাসাদ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত প্রাসাদ এক্ষণে বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। এই মন্দিরের দক্ষিণস্থ দ্বারের সমীপে উক্ত খোদিত প্রস্তর-লিপি বিদ্যমান থাকিয়া, অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্নের পরিচয় দিতেছে। মল্লবংশের পরিচয় সংক্ষেপে এই শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে। অতএব এই স্থলে সেই শিলা-লিপির শ্লোকগুলি স্থানে স্থানে সংশোধন পূর্ব্বক উদ্ধৃত হইল। ইহা নেওয়ারী অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে।

"আসীৎ শ্রীসূর্য্যবংশে রঘুনৃপকুলজো রামচন্দ্রো নৃপেশঃ
তদ্বংশে নান্যদেবোঽবনিপতিরভবৎ,তৎসুতো গঙ্গদেবঃ।
তৎপুত্রোঽভূন্‌ সিংহো নরপতি-রর্জ্জুন, স্তৎসুতো রাম-সিংহ,
স্তজ্জঃ শ্রীশক্তিসিংহো ধরণিপতি রতো ভূপ ভূপাল-সিংহ॥ ১॥
তস্মাৎ কর্ণাটচূড়ামণিরিব হরযুৎসিংহদেবোঽস্যবংশে
ভূপঃ শ্রীযক্ষমল্লো নরপতিরতুলো, রত্নমল্লোঽপ্যমুষ্মাৎ।
তস্মাৎ শ্রীসূর্য্যমল্লো হ্যবনিপতিরভূৎ, তত্তনুজোঽম রাখ্যে
মল্লোঽভূৎ, তস্য পুত্রো রিপুগণবিজয়ী শ্রীমহেন্দ্রাখ্য মল্লঃ॥ ২॥
তস্মাৎ শিবাসিংহেঽভূৎ, হবিহরসিংহ-সুত স্তস্মাৎ,
তস্মাৎ লক্ষ্মিন্‌ সিংহো ভূপতি র্নরসিংহপরাক্রমঃ॥ ৩॥
তস্মাৎ শ্রীপ্রতাপো নরপতি-রভবৎ ভূপমালাবলীষু
স্ফুর্জ্জৎ পাদারবিন্দদ্বয়-রসবিলসদ্‌ রেণুভি র্ভূষণানি।
যোঽকার্ষীৎকুতিখাসাকিরমিতি স্ববশেভোট্টভূপস্যদেশাৎ
জগ্রাহৈবাবদীনং প্রতি দিনমপরং যংভজন্তে নরেশাঃ॥৪॥
ভক্তগ্রাম নরেশমল্ল-ভূপতি র্দন্তেভমেনং ভিয়া
ভেজেঽসৌ বসুধাং জহারসুদৃঢ়ং সংধার্য্য দুর্গং পুনঃ।
শ্রীমদ্‌ ডম্বরসাহভূপতিবলং বিধ্বস্য হত্বা বলং
শ্রীমৎ-সিদ্ধিন্‌ সিংহমল্লনৃপতে র্জগ্রাহ দুর্গাবলীং॥ ৫॥
আস্তে কাপ্যমরাবতীব বিলসদ্দন্তীন্দ্র-দিব্যাঙ্গনা-
যুক্তা স্বর্ণময়ী বিহারনগরী সা রাজধানী পরা।

শ্রীমৎ শ্রীকমলাধিকা মধুপতে রিন্দ্রেণতুল্যস্য চ,
প্রত্যর্থি ব্রজনির্জ্জিতস্য নরযুন্নারায়ণ স্যাপি চ ॥ ৬ ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ স্তস্মাদ, ধীরনারায়ণ সুতঃ।
পুত্রী রূপমতী তস্য, প্রাণনারায়ণঃ সুতঃ ॥ ৭ ॥
সেয়ং রূপমতী সতী গুণবতী স্বর্ণদ্যুতিঃ সম্মতি
মাদ্যৎকুঞ্জরগামিনী প্রণয়িনী সাক্ষাৎ পরা বল্লি ী।
আসীৎ সর্ব্বগুণা পিতুর্নরপতেঃ শ্রীমৎপ্রতাপস্য সা,
পত্নী প্রাণসমা যথা জলনিধেঃ পুত্রী জগৎপায়িনং ॥ ৮ ॥
কর্ণাটী রঙ্গযাটী কুচকনকঘটী কামলীলৈকবাটী,
স্বর্ণালঙ্কারকোটী হরিসদৃশকটী চারুদেহানুপাটী।
নাম্না রাজমতী মহারসবতী ভূপপ্রতাপস্য সা,
ভূত্বা ভোগাবধূটিকা কিল হরে ভীমের জীবাধিকা ॥৯॥
স্বর্গার্থ কৃতবান্ প্রতাপনৃপতিঃ সদার্যাম্বিতো—রেতযেঃ
প্রাসাদং রত্নপত্রপদ্মসদৃশং শৃঙ্গাগ্রৈঃ শোভিতং।
নানাচিত্রবিরাজিতং সমমিদং সদ্বৈজয়ন্তেন বৈ,
হোমদ্যৈ রকরোৎশতিস্মৃতিমতৈ রস্য প্রতিষ্ঠাবিধিম্ ॥১০॥
সংবৎ ৩৭৯, ফাল্গুনশুক্লষষ্ঠ্যাং তিথৌ, অনুরাধানক্ষত্রে,
হর্ষণযোগে, বৃহস্পতিবাসরে।

মল্লবংশের পরিচয় ও সময় নিরূপণের জন্য এই শিলালিপি অতি অমূল্য পদার্থ। ইহাতে মহারাজ প্রতাপমল্লের সমসাময়িক রাজাদিগের নামমালা প্রদত্ত হইয়াছে। ডম্বরসাহ, ভোটের অধিপতি এবাবদী, ভাটগাঁর অধিপতি নরেন্দ্রমল্ল ও ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল-প্রতাপমল্লের রাজত্বের আরম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। সিংহাসন আরোহণের কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রতাপমল্ল তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া, আপনার আধিপত্য বিস্তারিত করেন। প্রতাপমল্ল কোঁচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন। এই প্রাণনারায়ণের ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের নামও এই শাসনলিপি হইতে জানা যাইতেছে। ইহা হইতে কোঁচবিহারের নরপতিদিগের আদিপুরুষ মহারাজ নরনারায়ণের আবির্ভাব কাল ১৫৮০ খ্রীঃ হইতে ১৬০০ খ্রীঃ বলিয়া নিরূপিত হইতেছে।

এই শাসনলিপি হইতে কর্ণাটকসূর্য্যবংশীয় নান্যদেব ও তাঁহার বংশধরদিগের নামমালা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে। কেহ কেহ এই নেপালেশ্বর নান্যদেবকে বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উক্তি একান্ত অমূলক বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন আমাদের মতে ১০৩৬ ৫৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বঙ্গ ও গৌড়দেশে রাজত্ব করেন। ১০৯৭ খ্রীঃ নান্যদেব নেপালে সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে বিজয়সেনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল সেন রামপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "ঢাকার পুরাতন-কাহিনী" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা আমরা বিস্তারিতভাবে নব্যভারতের পাঠকবর্গকে প্রদর্শন করিয়াছি। ১৮৩৫ খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় সুপণ্ডিত হগ্‌সন্ সাহেব সিমরাউনগড়ের যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি নান্য দেব দ্বারা ১০৯৭ খ্রীঃ সিমরাউনগড় প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মতে নান্যদেবের পর তাঁহার বংশধর গঙ্গদেব, নরসিংহদেব, রামসিংহদেব, শক্তি সিংহদেব ও হরসিংহদেব সিমরাউনগড় হইতে মিথিলায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ১৩২৩ খ্রীঃ দিল্লীশ্বর টোগলক সাহের দ্বারা সিমরাউনগড় বিধ্বস্ত হইলে, নান্যদেবের পঞ্চম বংশধর হরসিংহ দেব নেপালে পলায়ন পূর্ব্বক ভাটগাঁয় আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ১০৯৭—১৩২৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ২২৭ বৎসর কাল নান্যদেব ও তাঁহার পর-বংশধরেরা মিথিলায় রাজত্ব করেন। সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব স্বরচিত "useful tables" নামক পুস্তকে এই অমূলক ও ভ্রান্ত মত নিরা-

পত্তিতে গ্রহণ করেন। আমাদের অভিমত ইতিপূর্ব্বেই বিস্তারিত রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। হরসিংহদেব হইতে হরিসিংহ দেব সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। নান্যদেব নেপালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন বলিয়া বংশাবলীতেও বর্ণিত হইয়াছে। ছয় পুরুষে ২২৭ বৎসর কাল রাজত্ব করা কোনও রাজবংশের ভাগ্যে ঘটে নাই। জয়দেব মল্লকে রাজ্যচ্যুত করিয়া হরসিংহ দেব ১৩২৩ খ্রীঃ নেপালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং ৮৮০ খ্রীঃ রাঘবদেব দ্বারা নেপালী সংবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত শিরোমণি প্রিন্সেপ সাহেবের এই উভয় মতই ভ্রান্ত ও অমূলক। প্রিন্সেপ সাহেবের মতে ১৬০০ খ্রীঃ জয় এক্ষ (যক্ষঃ) মল্ল নেপালে রাজত্ব করেন। আমাদের মতে যক্ষমল্ল ১০৭০—৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নেপালে রাজ্য শাসন করেন। প্রিন্সেপ সাহেবের প্রকাশিত মল্লবংশাবলী ও সময় নির্দ্দেশ একান্ত ভ্রান্ত বলিয়া শাসনলিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে। ৭৫৭ নেপালী সংবতে(১৬৩৭ খ্রীঃ) খোদিত ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের নামাঙ্কিত এক শিলালিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ললিতপট্টনের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত রাধাকৃষ্ণের মন্দির মধ্যে এই শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। সিদ্ধিনৃসিংহ ও তাঁহার বংশধরেরা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রতাপমল্লের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, ভগ্নহৃদয়ে সিদ্ধিনৃসিংহ গঙ্গাতীরে বাস করিতে থাকেন। ললিতপট্টন রাজ্যের শাসনভার তাঁহার পুত্র শ্রীনিবাস মল্লের হস্তে অর্পণ করিয়া, তিনি বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। শ্রীনিবাস মল্লের পুত্র যোগনরেন্দ্র মল্ল রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। দোলপর্ব্বতের শিখরস্থ বিষ্ণুমন্দিরে যোগনরেন্দ্র মল্লের মৃত্যু হয়। তাঁহার চিতায় যোগনরেন্দ্র মল্লের একবিংশতি পত্নী প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার তনয়া যোগমতী দেবী পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরূঢ়া হন। যোগমতীর জ্যেষ্ঠপুত্র লোকপ্রকাশের মৃত্যুর পর, পুত্রের স্বর্গকামনায় রাজ্ঞী রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। ৮৪৩ নেপালী সংবতের (১৭২৩ খ্রীঃ) ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপ্ত হয়। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরস্থ রাজ্ঞী যোগমতীর নামাঙ্কিত অপর শিলালিপি হইতে ললিতপট্টনের রাজবংশের পূর্ব্বোক্ত বিবরণ জানা যাইতেছে।

রাজা যক্ষমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয় বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ জয়ন্তরাজ ভাটগাঁর ও কনিষ্ঠ রত্নমল্ল কাটমাণ্ডুর শাসনভার প্রাপ্ত হন। বংশাবলীর মতে রত্নমল্ল কান্তিপুর ও নবাকোট আপনার অধিকার ভুক্ত করেন। তিনি তিব্বতের রাজাকে রণে পরাজিত করেন, তাঁহার সময়ে মুসলমানেরা নেপাল সর্ব্ব প্রথম আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। সোমশেখরানন্দ নামে জনৈক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ পশুপতিনাথের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত হয়। তুলজা দেবীর মন্দির সংস্কৃত হয়। রাজ্যমধ্যে যে নূতন তাম্রমুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহার পৃষ্ঠভাগে সিংহমূর্ত্তি অঙ্কিত হয়। বংশাবলীতে সূর্য্যমল্লের পুত্র অমরমল্ল তাঁহার পিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহেন্দ্রমল্লের সময়ে নেপালে রৌপ্যমুদ্রা প্রথমতঃ প্রচলিত হয়। মহেন্দ্রমল্ল ভাটগাঁর রাজা ত্রৈলোক্যমল্লের পরম সুহৃৎ ছিলেন। ৬৬৯ নেপালী সংবতে (১৫৪৯ খ্রীঃ) কাটমাণ্ডুনগরে তুলজা দেবীর এক মন্দির রাজা মহেন্দ্রমল্লের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের অনুমিত

সময়ের সহিত বংশাবলীর নির্দ্দিষ্ট এই সময়ের ঐক্য হইতেছে। সদাশিব মল্লের অত্যাচারে তাঁহার ভৃত্য ও প্রজাগণ বিদ্রোহী হয়। সদাশিব ভাটগাঁয় পলায়ন পূর্ব্বক তথায় কারারুদ্ধ হন। শিবসিংহমল্লের মহিষী গঙ্গা দেবী ৭০৫ নেপালী সংবতে (১৫৮৫ খ্রীঃ) চঙ্গুনারায়ণের মন্দির সংস্কৃত করেন। ৭১৪ নেপালী সংবতে (১৫৯৪ খ্রীঃ) রাজা শিবসিংহের আদেশে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরের জীর্ণসংস্কার সাধিত হয়। ১৫৯৫ খ্রীঃ গোরখনাথের কাষ্ঠ মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের নাম কাটমাণ্ডু রাখা হয়। তদনুসারে কান্তিপুর নগরের নাম কাটমাণ্ডু হয়।

শিবসিংহমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হরিহরসিংহ মল্ল রাজাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শাসিত রাজ্য তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মীনৃসিংহ কাটমাণ্ডু নগরে ও কনিষ্ঠ সিদ্ধিনৃসিংহ ললিতপট্টনে রাজত্ব করিতে থাকেন। বংশাবলী লক্ষ্মীনৃসিংহ মল্লকে হরিহরসিংহ মল্লের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে!!! লক্ষ্মীনৃসিংহ কালক্রমে উন্নত হইয়া উঠিলে, তাঁহার পুত্র প্রতাপমল্ল পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বংশাবলীর মতে ৭৫৯ নেপালী সংবতে (১৬৩৯ খ্রীঃ) প্রতাপমল্লের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং ১৬৮৯ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৬৪০ খ্রীঃ স্বম্ভুয়নাথের এবং ১৬৫৭ খ্রীঃ বিশ্বরূপের মন্দির প্রতাপমল্লের দ্বারা সংস্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ৭৭০ নেপালী সংবতে স্বয়ম্ভুস্তোত্র এবং ৭৭৪ সংবতে কালিকাস্তোত্র ও গুহ্যেশ্বরস্তোত্র স্বয়ং রচনা করেন। প্রতাপ সুকবি ছিলেন। প্রতাপমল্লের রাজত্ব কাল সম্বন্ধে বংশাবলীর উক্তি সত্য বলিয়া শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে। বংশাবলীর মতে ৭৫৭ নেপালী সংবতে ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ৭৪০ নেপালী সংবতে (১৬২০ খ্রীঃ) তুলজা ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ৭৭৭ নেপালী সংবতে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। সিদ্ধিনৃসিংহের পুত্র শ্রীনিবাস মল্ল ৭৭৭-৮২১ নেপালী সংবৎ (১৬৫৭-১৭০১ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বংশাবলীর এই সকল উক্তি হইতে আমাদের অনুমিত সময় সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইতেছে। বংশাবলীতে সিদ্ধিনৃসিংহমল্লের যুদ্ধবিগ্রহের কোনও উল্লেখ নাই, কিন্তু শ্রীনিবাসমল্লের সহিত প্রতাপের সংগ্রাম উপস্থিত হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীনিবাসমল্লের পুত্র যোগনরেন্দ্র মল্ল পুত্র শোকে অধীর হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজ্যত্যাগের পর প্রতাপমল্লের তৃতীয় পুত্র মহীন্দ্রমল্ল ললিতপট্টনের রাজাসনে উপবেশন করেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, সিদ্ধিনৃসিংহমল্লের সময় হইতে ললিতপট্টন অল্লাধিক পরিমাণে কাটমাণ্ডুর অধীনতাপাশে আবদ্ধ থাকে। মল্লবংশের অবশিষ্ট ইতিহাস ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভারত, মিসর ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। [৩]

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ভারতসংশ্রবে মিসর, আরব এবং গ্রীশদেশে পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। গ্রীশ ও মিসরের পণ্ডিতগণ সেই পৌরাণিক ধর্ম্মনিবিষ্ট নানাবিধ

ধর্ম্মতত্ত্বের বিলক্ষণ পর্য্যালোচনা করেন। এই পর্য্যালোচন কালে গ্রীশ এবং মিসরে নানা দার্শনিক সম্প্রদায় সমুত্থিত হয়। কারণ, ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্মে অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রবেশ করিলে, তাহাতে সমস্ত বৈদিক সূক্ষ্ম তত্ত্বই নিহিত দেখা যায়। পৌরাণিক ধর্ম্ম সেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকলের স্থূল আবরণ মাত্র। যাহারা অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ নিম্নাধিকারী, তাহাদের শিক্ষার্থই পৌরাণিক ধর্ম্ম; তাহারা সে আবরণ ভেদ করিতে চাহে না; কারণ, তাহারা পুরাণের সমুদায় বিশ্বাস করিয়া তাহা হইতে উপদেশ গ্রহণে বিলক্ষণ সমর্থ। সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শিগণ এই আবরণ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে বেদার্থ দেখিতে পান। মহাভারতের সংকল্প দেখিলেই এ কথা সপ্রমাণ হয়। ব্যাস বলিয়াছিলেন, আমি বেদ বেদাঙ্গ উপনিষৎ এই সকলেরসার সঙ্কলন পূর্ব্বক মহাভারত কাব্য রচনা করিয়াছি। সে যাহা হউক, মিসর এবং গ্রীশে যে সকল দার্শনিক সম্প্রদায় সমুত্থিত হয়, তাহাদের মতামত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ভারতীয় দর্শনের সহিত তাহাদের অনেকাংশে ঐক্য দেখা যায়। কারণ, তাহাদের মূল এক। একই বৈদিক ধর্ম্ম শতধা হইয়া শতরূপে শতস্থানে উদয় হইয়াছে।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ সিরিয়া ও ব্যাবিলনে যেরূপ প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র পাইয়াছিলেন, গ্রীশ এবং মিসরে তদ্রূপ পান নাই। মিসর এবং গ্রীশ অনেক দার্শনিক পণ্ডিতগণে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু সিরিয়া এবং ব্যাবিলন সেরূপ ছিল না। এজন্য, সিরিয়া এবং ব্যাবিলনে তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং সেই সুবিধা হেতু অনেকে তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করিয়া এসিনিস নামে যে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে দলবদ্ধ হইয়াছিল, সেই এসিনিস সম্প্রদায় ক্রমে মিসরেও গিয়াছিল; কারণ, সিরিয়ার সহিত তখন পশ্চিমাঞ্চলীয় সর্ব্বদেশেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সিরিয়ায় তখন সর্ব্বদেশীয় লোক যাতায়াত করিত। সুতরাং মিসরের যশে আকৃষ্ট হইয়া এসিনিসগণ সে দেশেও গিয়াছিল। মিসরে গিয়া তাহারা থারাপিউট (Therapeuts) নামে প্রসিদ্ধ হয়। থারাপিউট এবং এসিনিসের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ একই; কেবল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় তাহাদের নামকরণ বিভিন্ন হইয়াছিল।* মিসরে থারাপিউটগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মিসর এবং গ্রীশের দার্শনিক বিদ্যায় আমরা যে ভারতীয় দর্শনের নানাবিধ মতামত দেখিতে পাই, তাহার একটী কারণ এই থারাপিউটগণ। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকেরা ভারতীয় ধন সর্ব্বত্র মুক্ত হস্তে দান করিয়াছিলেন। মিসর এবং গ্রীশের ধর্ম্ম ও দার্শনিক বিদ্যা নানারূপে পরিপুষ্ট হইয়া জুড়িয়া মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

ওসিরিস মিসরে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাই উচ্চ এবং নিম্ন প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে উচ্চ মিসরের ধর্ম্মই প্রাধান্য লাভ করে। প্রাচীন থিবস মিসর ধর্ম্ম ও রাজ্যের একদা স্তম্ভ স্বরূপ হইয়াছিল। থিবসের প্রধান পুরোহিত রাজছত্র ধারণ করিয়া এক স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই থিবসের ধর্ম্মতন্ত্র মধ্যে ঐশ্বরিক ত্রিবৃৎ তত্ত্বই প্রধান ধর্ম্মতত্ত্ব রূপে মিসরে প্রচারিত হয়।

একদা মিসর জ্ঞান, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যে এত পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, সেই লোভে আকৃষ্ট

* "The Therapeutœ of Philo are a branch of the Essenes. Their name appears to be but a Greek translation of the Essenes."—Renan.

হইয়া অনেক বিদেশীয় নৃপতিবর্গ মিসরে আসিয়া পড়েন। মিসরে আরবেরা আসিয়া প্রাচীন কালে রাখালরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন। তৎপরে তথায় এসিরীয় এবং পারস্তরাজের জয়পতাকা উড্ডীন হয়। তদনন্তর ইজিপ্ট গ্রীকজাতির রাজ্যভুক্ত হয়। মিসরের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এত প্রবলা ছিল যে, বিদেশীয় রাজগণও তাহার বিরুদ্ধে যাইতে সাহসী হইতেন না। ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হইলেই রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইত। এই ধর্ম্মবিরোধ হেতুই মিসর হইতে পারস্থ প্রভুত্ব তিরোহিত হয়। কিন্তু রাজ্য যাইলে কি হইবে, পূর্ব্ব কালে আরবীয় ধর্ম্মের যেমন অনেক নিদর্শন মিসর ধর্ম্মে ছিল, পার্সীধর্ম্মের তেমনি অনেক মত ও তত্ব মিসর ধর্ম্ম-তন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হই য়াছিল। পার্সী-ধর্ম্মের সাগ্নিক উপাসনা মন্ত্র মিসরে দেখা দিয়াছিল। পার্সী ধর্ম্মের সহিত ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। প্রাচীন পারস্তদেশের সহিত যে ভারতের চিরদিন আলাপ পরিচয় ছিল, আর্য্যশাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পারস্ত অভ্যুদয়ের অনেককাল পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় গৌরব-রবি প্রদীপ্ত হইয়াছিল; সেই গৌরবে যে পারস্থ দেশ আলোকিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? সেই পারস্থ দেশীয়, ধর্ম্মতন্ত্রের অনেক মতামত মিসর ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে। সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে মিসর আবার আর্য্যসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

মিসরে পরে গ্রীশের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। প্রাচীন গ্রীশে যে ধর্ম্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে ধর্ম্মতন্ত্র ভারতীয় সংশ্রবে সমুন্নত হয়, সেই ধর্ম্মের অনেক মতামত পরে মিসর ধর্ম্মের শরীর পরিপুষ্ট করে। সত্য বটে, একদা মিসর স্বদেশীয় দ্বারবদ্ধ করিয়া বহিঃসম্পর্ক রহিত করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু বহির্দ্দেশীয় রাজ্যস্রোত আসিয়া সে অর্গল ভাসাইয়া দিয়াছিল। মিসরবাসিগণ অন্যদেশে না যাইলে কি হইবে, অন্যদেশীয় লোক যে মিসরের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় চালাইত। সুতরাং স্বদেশ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও মিসরবাসিগণ একেবারে বহির্দ্দেশীয় সম্পর্ক-রহিত হইতে পারে নাই। তাহার ফল এই, মিসব শুধু যে ধনসম্পত্তিতে পরিপূরিত হইয়াছিল, এমত নহে, তাহার জ্ঞানক্ষেত্রও ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়াছিল। চিরদিন ঐ জ্ঞানক্ষেত্রে আর্য্যধর্ম্মের বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। অবশেষে থিয়োডোসিয়াস (Theodosius) ভূপতির আজ্ঞায় ৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে মিসব ধর্ম্ম একেবারে সমূলে নিপতিত হয়। নব বলে বলীয়ান খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত মিসর ধর্ম্মের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, পুরাতন মিসর ধর্ম্মের নিপাত সাধন হয়। দার্শনিক তত্বে পরাভূত হইয়া মিসর ধর্ম্ম পতিত হয় নাই, খ্রীষ্টীয় রাজবল সেই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া অবশেষে তাহাকে নিহত করিয়া ফেলিল। নিহত করিয়া তাহার আর চিহ্ন মাত্র রাখিল না। তাহার সর্ব্বসম্পত্তি লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাঙ্গকে ভূষিত করিল। সেই ভূষণে ভূষিত হইয়া অভিনব খ্রীষ্টধর্ম্ম যেন নিজ সম্পত্তিতে ধনবান হইয়া দেখা দিল। কিন্তু সেরূপ নবীনবেশে দেখা দিলে কি হইবে? আজিও মিসর ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইতিহাস পৃথিবী হইতে তিরোহিত হয় নাই। এই দেখুন, লিডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ধর্ম্মের ইতিহাসবেত্তা মহোদয় টীল (C. P. Tiele) কি বলিতেছেন;—

"Conversely, however, the Egyptian religion exerts a preponderating influence on

the Canaanite races, though less upon the Hebrews than on the Phœnicians. First by their means, and then directly, it reached the Greeks, made its way finally through the whole Roman Empire, and even furnished to Roman Catholic Christendom the germs of the worship of the Virgin, the doctrine of Immaculate Conception, and the type of its theocracy".

"সে যাহা হউক, অন্যদিকে, সমস্ত ক্যানানবাসী জাতির উপর ইজিপ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রভূত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়—ফিনিসীয়গণের উপর যতোধিক, হিব্রুগণের উপর তত নহে। সেই ধর্ম্ম গ্রীকদিগের অন্তরে প্রথমে সাক্ষাৎভাবে প্রবেশ লাভ করে, পরে, সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে তাহা প্রচারিত হয়, এমত কি, রোমীয় ক্যাথলিক ধর্ম্মজগতের কুমারী মেরীর মাতৃপূজা, নিষ্পাপ কৌমার গর্ভ, বা খ্রীষ্টের সশরীরে অবতরণবাদ এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মরাজ্যতন্ত্রের মূলে সেই ইজিপ্টীয় ধর্ম্ম বীজ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।"

গ্রীক রাজত্বকালে মিসর নাম একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল; তৎকালে ইজিপ্ট নামই আরও প্রবল হইয়া উঠিল। গ্রীকেরা মিসর অধিকার করিয়া স্বদেশীয় অনেক দেবদেবী এবং ধর্ম্মীয় মতামত মিসর ধর্ম্মান্তর্গত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই হেতু, পরম্পরা ক্রমে, অনেক আর্য্য ভাব ও মতামত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেই জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনায় ইজিপ্ট অবশেষে সর্ব্বদেশকে পরাজিত করিয়াছিল। তাহার বিদ্যালয় ক্রমে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিতমণ্ডলীর গৌরবে ইজিপ্ট পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্লেটো সেই গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া তথায় বৎসরাধিক কাল শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশে গুরু সক্রেটিসের প্রধান শিষ্যরূপে গণ্য হইলেন এবং আপন ধর্ম্মীয় মতামত সকলকে এক নূতন পন্থার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিলেন। সক্রেটিস যে আন্তরিক ঐশ্বরিক নিষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছিলেন, প্লেটো সেই নিষ্ঠাকে ভগবৎ প্রেমরসে সিক্ত করিলেন। সক্রেটিসের ঐশ্বরিক শরণাসক্তি আরও বলবতী হইয়া উঠিল। যে পবিত্র ঐশ্বরিক Platonic Love প্রেম প্লেটো শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা প্লেটোর নামেই প্রচারিত হইল। সক্রেটিস কুতর্কজাল হইতে ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া মানবান্তরে তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্লেটো পবিত্র প্রেমে সেই ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পূজা করিয়াছিলেন। গ্রীশের মানব মন এখন ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিষ্কৃত পথ দেখিতে পাইল। কুতর্কের কুজ্ঝটিকা তিরোহিত হইয়া ধর্ম্মের জ্যোতিঃ দ্বিগুণ প্রভাবে বিকীর্ণ হইল। সক্রেটিস সর্ব্বমঙ্গলময়কে মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, প্লেটো প্রেমবারি দিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। এই দেখুন প্লেটো যে ভগবৎ প্রেমের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কিরূপ :—

"The bond which unites the human to the Divine is Love, and Love is the longing of the soul for Beauty, the inextinguishable desire which like feels for like, which the Divinity within us feels for the Divinity revealed to us in Beauty".—Lewes.

"প্রেমবন্ধনই মানবকে ভগবানের সহিত আবদ্ধ করে। সেই প্রেম কি? না, সুন্দরের জন্য আত্মার ঐকান্তিক অনুরাগ, সমানের সহিত সমান মিলিবার জন্য যে অদম্য অনুরাগে উত্তেজিত হয়, সেই প্রবলানুরাগের নাম প্রেম এবং সুন্দরে যে ভগবানের মূর্ত্তি প্রকাশিত, সেই ভগবানের প্রতি অন্তরাত্মাধিষ্ঠিত ভগবৎ সত্বার ঐকান্তিক অনুরাগের নামই প্রকৃত প্রেম।"

প্লেটো এই পবিত্র ভগবৎ প্রেম খৃষ্ট জন্মিবার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্লেটো গ্রীকদর্শনে এক নবযুগ আনিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যুদয় কাল হইতে গ্রীক দর্শনে এক নূতন জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। তদুপরবর্ত্তী কালের সুধীগণ অনেকেই প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারই মতামত প্রচার

করিয়াছিলেন। জুডিয়ায় গ্রীক দর্শনের প্রাদুর্ভাব কালে প্লেটোর পবিত্র ভগবৎ প্রেমের উপদেশ অবশ্য প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহুদী ফাইলো এই প্লেটোর শিষ্য। গ্রীক দর্শনে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি ইজিপ্টের দার্শনিক বিদ্যালোচনায় বিলক্ষণ পণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি যে মতামত প্রচার করেন, ইউরোপীয় দার্শনিক ইতিবৃত্তে তাহার নাম নবপ্লেটোবাদ Neo-Platonism এই নবপ্লেটোবাদ খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে সমুদ্ভুত হইয়া তৎপরেও প্রায় তিনশত বৎসর বিদ্যমান ছিল। এই নবপ্লেটোবাদে ইজিপ্টীয় দর্শনের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই দার্শনিকবাদের অপরাপর পণ্ডিতগণ খ্রীষ্টশতাব্দীর পরে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু কালের অগ্রপশ্চাতে কিছু আসিয়া যায় না; খ্রীষ্ট না জন্মিলে এবং তাহার মত প্রচার না হইলেও, এই নবপ্লেটোবাদের মতামত এক রূপই থাকিত। কারণ, তাঁহার বিকাশ পূর্ব্ব দার্শনিক বিদ্যালোচনার ফল। যে ইজিপ্টীয় দর্শন ফাইলোর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, ফাইলো এবং তদ্‌পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাহারই বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন; তাহারা পুষ্পকে বিকসিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন মাত্র। ফাইলোর উপদেশে যে যে ইজিপ্টীয় দার্শনিক তত্ত্ব খ্রীষ্ট ধর্ম্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এই নবপ্লেটোবাদের পণ্ডিতগণের কথায় তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে। Proclus দর্শনের অধিকার সম্বন্ধে যাহা বলেন, Lewes তাহা এই রূপ প্রকাশ করিয়াছেন:—

"Proclus placed Faith above Science. It was the only faculty by which The One could be apprehended. The Philosopher, said he, is not the priest of one Religion but of all Religions, that is to say, he is to reconcile all modes of belief by his interpretations. Reason is the Expositor of Faith."—*Lewes.*

"প্রোক্লস ভক্তিকে জড়বিজ্ঞানের উপরে স্থান দিয়াছেন। এই ভক্তি দ্বারাই কেবল ভগবান গ্রাহ্য। দার্শনিক পণ্ডিত একমাত্র ধর্ম্মের ব্যাখ্যাকার নহেন, তিনি তাহার ব্যাখ্যা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক মতামতের সমন্বয় সাধন করেন। বুদ্ধি ধর্ম্মের কেবল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।"

ভারতেও দর্শনের অধিকার এই রূপ নিরূপিত হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শন বলিয়াছেন, যাহা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, তাহা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের গ্রাহ্য নহে। যিনি অচিন্ত্য, চিন্তা তাঁহাকে কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? অচিন্ত্য বিষয়কে ধারণা করিতে হইলে তদুপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন হওয়া যাই। সে শক্তি ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তির বহির্ভূত। সে শক্তি কি, নবপ্লেটোবাদের অন্য একজন দার্শনিক এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—

"If, said Plotinus, knowledge is the same as the thing known, the Finite, as Finite, never can know the Infinite; because, it can not be the Infinite. To attempt, therefore, to know the Infinite by reason is futile, it can only be known in immediate presence. The faculty by which the mind divests itself of its personality is ecstasy. In this ecstasy the soul becomes loosened from its material prison, separated from individual consciousness, and becomes absorbed in the Infinite Intelligence from which it emanated. In this ecstasy, it contemptates Real Existence; it identifies itself with that which it contemplates".

"প্লোটাইনস বলেন, যদি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও সেই জ্ঞানের বিষয় এক হয়, যদি যৌটক জ্ঞান ও যৌটক এক হয়, তবে যাহা পরিচ্ছিন্ন ও পরিমিত, তাহা সেই পরিচ্ছিন্ন ও পরিমিত রূপে কখন অপরিচ্ছিন্ন অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না। অতএব, পরিমিত বুদ্ধি দ্বারা অনন্তকে জানিতে যাওয়া নিশ্চয় ব্যর্থপ্রয়াস, তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহার সাক্ষাৎকার আবশ্যক। যে শক্তি দ্বারা চিত্তের মোহাবরণ ঘুচিয়া যায়, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তি দ্বারা আত্মা শরীর রূপ ভৌতিক বন্ধন এবং স্বীয় জীবধর্ম্মাক্রান্ত অহংজ্ঞান হইতে বিমুক্ত হইয়া যে অনন্ত চিদ্রূপই তাহার প্রকৃত স্বরূপ এবং যাহা হইতে তাহার উৎপত্তি, সেই অনন্ত চেতনায় তাহা মিশিয়া যায়। এই

অবস্থায় তাহার প্রকৃত সত্তের অনুভব হয়, তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়।"

তবেই দেখা যাইতেছে, জীবের নিস্ত্রৈগুণ্য সাধিত না হইলে, জীব কখন নির্গুণকে জানিতে পারে না। সামান্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বা বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব লব্ধ নহেন। ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে আত্মার জীবত্ব ঘুচিয়া যাওয়া চাই। যে মায়িক জ্ঞান দ্বারা আত্মা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই মায়িক জ্ঞান অপসারিত হইলে, যখন চিত্তবৃত্তি বহির্বিষয় একবারে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখীন হইয়া ধ্যানস্থ হইবে, তখন তাহার দীপালোক প্রজ্বলিত হইবে, সেই দীপালোক ও পরমজ্ঞানে আত্মা পরমাত্মাকে দেখিতে ও লাভ করিতে পারিবেন। ফাইলো কি বলিতেছেন, দেখুন,—

"The senses may deceive Reason may be *powerless, but there is still a faculty in* man—there is Faith Real Science is the gift of God its name is Faith; its origin is the Goodness of God; its cause is Piety."

—*Lewes.*

"ইন্দ্রিয়জ্ঞান মোহময় হইতে পারে, বুদ্ধি অতি দীন ও সামর্থ্যহীন হইতে পারে তথাপি মানবের ভক্তিবৃত্তি অতি প্রবলা। যাহা প্রকৃত জ্ঞানের পন্থা ও বিজ্ঞান, তাহা ভগবৎ কৃপা মাত্র; তাহারই অন্যতর নাম ভক্তি। কৃপাসিন্ধুর কৃপাকণাই ভক্তি, তাহা শিবময়ের মঙ্গলকণা মাত্র, তাহাই প্রকৃত সাধনা পথ ও নিষ্ঠা।"

হিন্দুও বলেন—"ভক্তিতে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" এই ভক্তিপথে গিয়া লোকে আনন্দধামে ও বৈকুণ্ঠে যায়। ভক্তিপথে সাধক যে অমৃত লাভ করে, তাহাই Ecstasy.

ফাইলো আরও বলেন;—

"God being incomprehensible, inaccessible, an intermediate existence was necessary as an Interpeter between God and Man, *and this Immediate Existence* is called the Word. The Word is God's Thought, Thought is twofold—Thought as thought and Thought as realized: Thought become the World".—*Lewes.*

"ঈশ্বরতত্ত্ব সামান্য মানবের নিকট অজ্ঞেয় এবং বাক্যমনের অতীত। এজন্য, দেব মানবের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তিতার আবশ্যক। সেই মধ্যবর্ত্তিতাই শব্দ; শব্দই ভগবৎ জ্ঞান। সেই জ্ঞান দ্বিবিধ—জ্ঞান, জ্ঞান অব্যক্ত (কারণ ব্রহ্ম), জ্ঞান কার্য্যরূপে ব্যক্ত (কার্য্য-ব্রহ্ম)—জ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডরূপে মূর্ত্তিমান।"

বেদেও উক্ত হইয়াছে;—

'বাচা বিরূপনিত্যয়া।"—ঋগ্বেদ ৮মং ৬৪সূ ৬ ঋক।

ফাইলো এস্থলে "শব্দ" ও বেদকে কেমন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, দেখুন। সনাতন ধর্ম্মের সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মও এস্থলে আভাসিত হইয়াছে। তিনি আরও বলিতেছেন, এজগৎ ঈশ্বরের রূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এজগৎ সগুণ জ্ঞানস্বরূপেরই ব্যক্ত রূপ। সেই অব্যক্তের বিরাটমূর্ত্তি বা ব্যক্ত ভাবই জগৎ।

যে অমৃত (Ecstasy) লাভ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায়, সেই অমৃতলাভের উপায় কি? সেই উপায় ব্রহ্মসাধনা; ব্রহ্মসাধনা সম্বন্ধে নবপ্লেটোবাদ কি বলেন? প্লোটাইনস বলিতেছেন:—

"Every thing which purifies the soul and makes it resemble its primal simplicity is capable of conducting it to ecstasy."—*Lewes.*

"চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্মা যদ্দ্বারা তাহার স্বাভাবিক নির্ম্মলতা ও সরলতায় আইসে, তদ্দ্বারাই তাহা অমৃত তত্ত্ব লাভ করে।"

সকলের পক্ষেই কি এক রূপ সাধনাই বিধি? লোক সকল ত বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতি সম্পন্ন। তবে সকলের একরূপ সাধনায় প্রবৃত্তি হইবে কেন? বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত বিভিন্ন সাধনপথের একান্ত প্রয়োজন। বেদে এই অধিকার-তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। এজন্য, বিভিন্ন বেদাধিকারের সৃষ্টি। বেদে নিম্নস্তরের ভক্তিপথ হইতে উচ্চ জ্ঞান পথে যাইবার প্রশস্ত পন্থা নিরূপিত হইয়াছে। এই অধিকার-তত্ত্ব না বুঝিলে বিভিন্ন বেদবিধি বুঝা দুষ্কর। যখন অধিকারানুসারে সকল জ্ঞানই লব্ধ হয়, তখন বেদজ্ঞান বাকী থাকে

কেন? নিম্নাধিকারী ব্যক্তি উচ্চ বিষয় দিলে গ্রহণ করিবে কেন? যাহার তেরিজ জমা খরচ বোধ হয় নাই, সে কি হটাৎ বীজগণিত বুঝিতে পারে? আবার যাহার দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি হৃৎ প্রবৃত্তি সকল প্রবলা, বিচার শক্তি অতি ক্ষীণ, তাহার জন্য যে সাধনপথ আবশ্যক, এক জন বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকের কি সে সাধনপথ উপযোগী হইতে পারে? বুদ্ধিমান সূক্ষ্মদর্শী বিভিন্ন পন্থা ধরিয়া তবে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবেন। প্লোটাইনস এই অধিকার তত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"There are radical differences in men's natures. Some souls are ravished with Beauty: and these belong to the muses. Others are ravished with Unity and Proportion; and these are Philosophers. Others are more struck with moral perpections; and these are the pious and ardent souls who live only in religion. Thus then, the passage from simple sensation to ecstasy may be accomplished in three ways; by Music, by Dialectics and by Love or Prayer. The result is always the same—the victory of the Universal over the Individual".

—*Lewes.*

"বিভিন্ন প্রকৃতি লইয়া বিভিন্ন লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কতকগুলি লোক সৌন্দর্য্য দেখিলে মোহিত হয়; কাব্যদেবী তাহাদের অবলম্বন। অপর লোকে বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও একতা এবং বিশৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিলে মোহিত হয়, তাঁহারাই দার্শনিক। আর এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্মনৈতিক উৎকর্ষ দেখিলে বড়ই প্রীতিলাভ করেন; তাঁহারাই অতি উৎসাহের সহিত ধর্ম্মের পুণ্যপথ আশ্রয় করেন। তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, সামান্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান হইতে অমৃতে যাইবার পন্থা ত্রিবিধ। এক পন্থা কাব্যরসাত্মক প্রবৃত্তি পথ, (পৌরাণিক অনুষ্ঠান রীতি), অন্য পন্থা চিন্তাশীল জ্ঞানপথ (দার্শনিক পথ) এবং তৃতীয় সাধন-পথ, প্রেম বা উপাসনা (বৈষ্ণবী ভক্তি পথ)। ফল সকল পথেই সমান, সকলই একস্থানে উপনীত হয়। সকল পথেই জীব। বিশিষ্ট জীবত্ব হইতে মুক্ত হইয়া অবিশেষ পরমাত্মভাবে অধিষ্ঠিত হয়; বিশেষ জীবের উপর অবিশেষ পরমাত্মার জয়লাভ এই।"

প্রথমে প্লোটাইনস চিত্তশুদ্ধির কথা বলিলেন। কারণ, চিত্তশুদ্ধি নহিলে কোন ধর্ম্মপথেই অগ্রসর হইবার যো নাই। পাপ হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে পুণ্যপথে বিচরণ করা অসম্ভব। তৎপরে অধিকার অনুসারে বিভিন্ন সাধন পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের উদ্ধৃতাংশে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্লোটাইনস যাহাকে কাব্যরসাত্মক প্রেমপথ বলিয়াছেন, তাহা আমাদের ভক্তিমার্গ এবং যে পথে তিনি Dialectics দেখিয়াছেন, তাহা আমাদের জ্ঞানমার্গ। প্লেটো Dialectics শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করিতেন, দেখুনঃ—

"How are we to escape from evil? Not by suicide, but by leading the life of Gods or in the eternal contemplation of truth or Idea. This is done by Dialectics.

"Plato uses the word Dialectics; because with him Thinking was a Silent discourse of the soul and differed from Speech only in being silent".

"তবে পাপের নিষ্কৃতি কিসে হয়? আত্মহত্যা করিয়া নয়, কিন্তু দেবোপম কার্য্য করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারিলে, অথবা চিরদিন ধ্যানপরায়ণ হইয়া কেবল সত্য স্বরূপ এবং জ্ঞান স্বরূপের ভাবনা করিতে পারিলে, তবে পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে।"

প্লেটো ভিন্নার্থে Dialectics শব্দ ব্যবহার করিতেন, যে অর্থে সক্রেটিস তাহা ব্যবহার করিতেন, সে অর্থে নয়। প্লেটোর Dialectics শব্দের অর্থ, এক প্রকার ধ্যান বিশেষ কারণ, তাহার ধ্যানের অর্থ আত্মার নীরব চিন্তা, বাক্‌কথন হইতে সেই ধ্যানের এই মাত্র প্রভেদ যে, তাহা নীরব আত্মচিন্তা।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, দেবত্বলাভকেই প্লেটো মুক্তি বলিয়াছেন; জ্ঞানপথে আত্ম চিন্তায় নিমগ্ন হইলে সেই দেবত্ব লব্ধ হয়। এই ধ্যান পথই আমাদের জ্ঞানমার্গ।

প্লোটাইনস প্রেমভক্তিপূর্ণ ভক্তিমার্গ

এবং ধ্যান-সম্পন্ন জ্ঞানপথের কথা সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, সকলকেই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। বিশুদ্ধ ও পাপ-মলিনতাহীন না হইতে পারিলে, কি ভক্তি, কি ধ্যান, কোন পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না। এতদ্দ্বারা কি আমাদের কর্ম্মযোগ পথ ইঙ্গিত হয় নাই?

প্লোটাইনস একজন নবপ্লেটোবাদী পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং প্লেটো-নির্দ্দিষ্ট মুক্তিও তাঁহার গ্রাহ্য হইয়াছিল। প্লেটোর ধ্যান ও জ্ঞান পথের পরিণাম কি, দেখুনঃ—

"This region (Heaven) is the Seat of Existence itself—Real Existence, colourless figureless and intangible Existence which is visible to the mind only, the Charioteer of the Soul (horses being two) and which forms the subject of Real Knowledge. The minds of the Gods are fed by pure knowledge and all other thoroughly well-ordered minds, contemplate for a time, this Universe of Being *per see* and are delighted and nourished by the contemplation. They contemplate knowledge—not that knowledge which has a beginning not that which exists in a subject which is any of that which we term beings, but that *knowledge* which exists in Being in general ; in which Being really Is".—*Lewes*

"সৎ ও চিদাবস্থার নামই স্বর্গ—সেই সৎ অবর্ণ, অমূর্ত্ত, এবং অস্পর্শ্য সত্তা। এই সৎ কেবল মানসগোচর—তাহা সেই চিত্তগ্রাহ্য যাহা আত্মরথের রথী—যে রথে সামান্য ও পরম জ্ঞান নামে দুই অশ্ব যোজিত আছে। যে পরমজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান; সেই জ্ঞানের বিষয় এই সৎস্বরূপ পরমাত্মা। যাঁহারা দেবত্বলাভ করেন, অথবা যাঁহাদের চিত্ত সমাহিত, তাঁহাদের চিত্ত এই নির্ম্মল জ্ঞান সুধা ধ্যানযোগে পান করিতেছে, তাঁহারাই ধ্যানে সেই সৎস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে বিচরণ করেন এবং সেই আনন্দ ধামে ধ্যানস্থ হইয়া বিমলানন্দ সম্ভোগ করেন। এই ধ্যানে তাঁহারা চৈতন্যময়কে দেখিতে পান—এ চৈতন্যময় সে জ্ঞান নহে, যাহার উৎপত্তি ও লয় আছে, যে জ্ঞান, আমরা যাহাকে জীব বলি, সেই জীবে সচরাচর বিদ্যমান দেখি, কিন্তু সেই জ্ঞান, যাহা অনন্ত সৎস্বরূপে চিদ্রূপে বর্ত্তমান এবং যাহা চিদ্রূপ সতেরই সত্তা।"

প্লেটোর স্বর্গ ও মুক্তাবস্থা এইরূপ। তাহা আনন্দময় পরমাত্ম-সম্ভোগাবস্থা। এই মুক্তি প্লেটোর শিষ্যগণও অবশ্য স্বীকার করিতেন। সুতরাং আত্ম-সাক্ষাৎকারই নবপ্লেটোবাদে মানবের সাধন-পথের চরম সীমা রূপেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাধনার প্রারম্ভে চিত্তশুদ্ধি এবং পরিণামে ব্রহ্ম-দর্শন।

গ্রীক দর্শনের আলোচনার সহিত এই মত অবশ্য জুডিয়ায় প্রচারিত হইয়াছিল। প্লেটোর শিষ্যগণ ফাইলোর স্কুলে তাহাই শিক্ষা দিতেন। বৈদিক ধর্ম্মেও পরমেশ্বর সাক্ষাৎ জ্ঞান-লব্ধ বস্তু। যীশু এই মত গ্রহণ করিয়া উপদেশ ছলে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন ঃ—

"Blessed are the pure in heart ; for they shall *see* God".

যীশু যদিও এই ব্রহ্মদর্শনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই মত তিনি সমান্য লোকমণ্ডলীর নিকট সর্ব্বদা প্রচার করেন নাই। অন্তর বিশুদ্ধ হইলে তবে ত ব্রহ্মদর্শন ঘটিবে, তিনি সচরাচর লোককে সেই শুদ্ধিপথেরই কথা বলিতেন। কিরূপে পাপ-মলিনতা ক্ষালন করিয়া হৃদয় বিশুদ্ধ হইতে পারে, তিনি অন্তরের সেই সরলতালাভের কথাই সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। জেলে মালা এবং অশিক্ষিত লোক লইয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার ছিল, মেরী এবং মার্থারের মত স্ত্রীলোকও তাঁহার প্রধান শিষ্য মধ্যে গণ্য ছিল, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে উচ্চবিষয়ে শিক্ষা কিরূপে দিবেন? দিলেই বা তাহারা গ্রহণ করিবে কেন? যাহা তাহাদের গ্রহণীয়, সেই ভগবৎ প্রেম ও ভগবৎ ভক্তিই তিনি শিক্ষা দিতেন। এই জন্য আমি বলিয়াছি, তিনি ব্রহ্মদর্শনের কথা একদা কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই কথা একদিন বলিয়া ফেলাতেই প্রমাণ হইতেছে, তিনি ফাইলো এবং নবপ্লে-

টোবাদের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মদর্শনের কথা অনুমান হয়, বৌদ্ধমতাবলম্বী এসিনিসগণও শিক্ষা দিতেন। ইজিপ্টে Therapeut নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায় কর্তৃকও তাহা প্রচারিত হইয়া থাকিবে। তাহা বোধ হয়, জন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণেরও বিদিত ছিল। কোন প্রকারে তাহা যীশুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। যীশু কতদূর ব্রহ্মদর্শনের সাধনতত্ত্ব অবগত ছিলেন, তাহা বলা যায় না। কারণ, সে সাধনতত্ত্ব তিনি শিক্ষা দেন নাই। তবে চিত্তশুদ্ধির উপকারিতা ও ফল কত দূর যাইতে পারে, এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত, তিনি বোধ হয় "ব্রহ্মদর্শনের" কথা পর্য্যন্তও উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। তিনি যে সকল নিম্নাধিকারী জনগণের সমক্ষে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তাহাদের উপযোগী শিক্ষাই দিতেন। সুতরাং অন্য অধিকারের কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হয় নাই। নিম্নাধিকারী জনগণ অধিকতর সরল-চিত্ত, তাহাদের হৃদয় অত্যন্ত প্রশস্ত, তাহাদের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা, দয়াদাক্ষিণ্য, প্রেম ভক্তি প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয়ই প্রবলা। তাহাদের বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত নহে। তাহাদের জ্ঞানাধিকার অতি অল্পই। সেস্থলে যে সকল কথায় প্রেম ও ভক্তি আছে, তাহাই তাহাদের চিত্তহরণ করিতে সমর্থ। ভগবৎ মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি তাহাদের যতদূর মনোজ্ঞ হইবে, চৈতন্যশক্তি ততদূর হইবে না। যীশুর জীবনচরিত পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি নিজেও কিছু সুশিক্ষিত লোক ছিলেন না, তাঁহার জ্ঞানবিকার তত প্রশস্ত ছিল না। সুতরাং সরল প্রেম ও ভক্তিপথই তাঁহার অধিকতর চিত্তহরণ করিয়াছিল। সেই ভগবৎ প্রেমই তিনি লোককে উপদেশ দিয়াছিলেন।

কিন্তু ভগবৎ প্রেমে তিনি যে একান্ত প্রমত্ত ছিলেন, এমত অনুমিত হয় না। তিনি ভক্তি পথের কেবল প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। মুখে তাহার যতদূর ভগবৎ প্রেমের কথা প্রকাশ হইত, হৃদয়ে ততদূর ছিল কি না সন্দেহ। কারণ, ঈশ্বরানুরাগে ভোর হইয়া তিনি ত তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হন নাই। এণ্টিপসের বিপক্ষতাচরণে জনের যতদূর ঈশ্বরানুরাগ ও শরণাসক্তির পরিচয় হইয়াছিল এবং সেই জন্য জন নিজ প্রাণদান করিতেও কাতর হয়েন নাই; যীশুর ঈশ্বরানুরাগ ও শরণাসক্তি ততদূর কই? জনের ভগবৎ শরণাসক্তি যীশু দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু যীশু এণ্টিপসের ভয়ে ভীত হইয়া প্রায় চৌদ্দ বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। ভগবানে ততদূর অনুরাগ, আত্ম-নিবেদন ও শরণাসক্তি থাকিলে, তিনি কখন চৌদ্দ বৎসর বনবাস স্বীকার করিতেন না। কিন্তু আমরা একথার আর অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। আমাদের প্রসঙ্গ মধ্যে যাহা আসিতে পারে, আমরা সেই পর্য্যন্তই বলিয়াছি। যীশু নিজে ভক্তিপথের পথিক হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র এবং যে ঈশ্বরানুরাগের অমৃতময় উপদেশ তিনি জন প্রভৃতি সাধকের নিকট লাভ করিয়াছিলেন, যাহা গ্রীকদার্শনিকেরা শিক্ষা দিতেন, যাহা ফাইলোর স্কুলে উপদিষ্ট হইত, তিনিও তাহা শিষ্যগণের নিকট প্রচার করিতেন এবং নিজ জীবনে তাহার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া তাঁহাতেই একান্ত আত্মোৎসর্গ করা অনেক অভ্যাস ও সাধনার ফল; ততদূর সাধনায় সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই যীশুর প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল।

পরবারে আমরা ফাইলোর ত্রিবাদের সহিত যীশুর ত্রিবাদ তুলনা করিয়া দেখিব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

নীতিশিক্ষা। (৪)

গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা বিফল হইবার কারণ কি?

যাঁহারা মিসর, গ্রীস ও রোমের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির সাক্ষাৎ ফল-ভোক্তা এবং যাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকার নবাভ্যুদিত সভ্যতার আমূল-তত্ত্বদর্শী, এমন জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্ন সদ্‌গুণশালী মহিমান্বিত কৃতী পুরুষেরা ভারতে একত্রিত হইয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে তৎপর হইয়াছেন। আর [illegible] আমরাও তিব্বত, ব্র[illegible] নেপোল [illegible] পারি[illegible], সিংহল ও পারসিকদিগের দেশ-সম্বলিত বিশাল ভারতের সর্ব্ব-প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষ লইয়া বসিয়াছি। সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন শক্তিমান্ মহাপুরুষেরা আমাদের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। * আর আমরা—অর্থাৎ প্রাচীন সভ্যতার রস-গ্রাহী অথচ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আমরা—শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি। আমাদের যে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা, তাহা কৃত্রিম বা মৌখিক নহে। উহার অভাবে আমাদের জাতিত্ব ধ্বংস হইতেছে,—আমরা প্রাণে মারা যাইতে বসিয়াছি। অতএব শুষ্কতালু মৃগ যেমন জল অন্বেষণ করে, সেইরূপ আমরা নীতি ও ধর্ম্মের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছি। শিক্ষার্থীত্ব বা শিষ্যত্বপক্ষে আরও একটী দ্রষ্টব্য এই যে, আমাদের উক্ত আগ্রহও কেবল নাম-মাত্র অথবা একান্ত চেষ্টাশূন্য নহে। আমরা এখনো অন্ন, বস্ত্র, তৈজস, গো, হিরণ্য প্রভৃতি লোকের সাক্ষাৎ হিতকর দ্রব্য দান পূর্ব্বক সজ্ঞানে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে করিতে মরিতে চাই; এবং সন্তানদিগকে সেইরূপে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত গর্ভাষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিয়া থাকি। এমন গুণান্বিত গুরু ও এমন লক্ষণযুক্ত শিষ্যের সংযোগেও ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা হইল না। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট এমন অনুকূল শিষ্যগণের গভীর অভাব বা ঐকান্তিক প্রার্থনা পূরণ করিতে কেন অক্ষম হইলেন? কেন তাঁহাদের সর্ব্ববিষয়িণী অমোঘ চেষ্টা এই বিষয়ে বিফল হইল? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বের আলোচনাতেই যাহা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে উক্ত কারণ সংক্ষিপ্তরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা বলিয়াছি—(১) গবর্ণমেণ্ট অযোগ্য উপায় সকল অবলম্বন করিয়াছিলেন; (২) গবর্ণমেণ্ট ও রাজকর্ম্মচারীগণ সর্ব্বান্তঃকরণে কিছু করিতে পারেন নাই; (৩) তাঁহারা প্রতিভু দ্বারা প্রকৃতার্থ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিফলতার এই কারণগুলি বিবৃত করিয়া দেখাইতেছি।

গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনগণের অভিপ্রায়ের সহিত আত্ম অভিপ্রায় সম্মিলিত করিয়া যে সকল উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা এই:—

* ইংরাজ রাজপুরুষেরা যখন আমাদের সংস্কৃত ভাষাকে অকৃত করিয়া ইংরাজী দ্বারা আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন সেই ইংরাজী ভাষার গঠনকারী ইংরাজেরা আমাদের সর্ব্ব শিক্ষার নিয়ন্তা হইবেন বৈ কি? গবর্ণমেণ্টও বলিয়াছেন,—

"Western education, if persevered in, must in time bring with it, Western principles of discipline and self-control'.'

—*Sup. Gazette India, January 7, 1888.*

(১) সকল স্কুল ও কলেজের মধ্যে নিয়মের সমতা রক্ষা।

(২) শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা।

(৩) নীতি ও চরিত্র যুক্ত উত্তম শিক্ষক প্রস্তুত করা।

(৪) নীতির বিরুদ্ধাচরণের দণ্ডবিধান।

(৫) ছাত্রগণের চরিত্রের দোষগুণ লিপিবদ্ধ করা।

(৬) হোষ্টেল ও বোর্ডিং স্থাপন।

(৭) মনিটর (monitor) নিয়োগ।

(৮) এক এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার উর্দ্ধতম বয়স নির্দ্ধারণ।

(৯) সাধারণ ধর্ম্মমূলে নীতিগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচলন করা।

(১০) স্কুলের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ দান।

এই দশ উপায়-ব্যবস্থার তাৎপর্য্য ও ফলাফল আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম ব্যবস্থার অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যালয়ে শাসনের স্থিরতা থাকে। ছাত্রগণ নানা ছলে এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে যাইতে না পারে। এবং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দিতা না করিয়া সর্ব্ব স্কুলের ছাত্রদিগের সুশিক্ষা ও সুনীতিপালনের দিকে দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু ফলে এই মাত্র হইয়াছে যে, এক স্কুলের ছাত্রকে অন্য স্কুলে যাইতে হইলে পূর্ব্ব স্কুলের অধ্যক্ষের নিকট অনুমতি পত্র লইতে হয়। তাহাতে সেই স্কুলের প্রাপ্য বেতন আদায় হইয়া যায় এবং ছাত্রকে দ্বিতীয় স্কুলেও পূর্ব্ব স্কুলের সমান শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে হয়।

দ্বিতীয় ব্যবস্থায় ছাত্রগণ মুদ্গর বা অন্য ব্যায়াম-কাণ্ডে আপনাদের শারীরিক বল নিয়োগ করে; কিন্তু আত্মরক্ষা বা সাংসারিক কর্ম্মের পক্ষে তাহাদের কোন নৈপুণ্য বা অভ্যাস জন্মিতেছে, এমন চিহ্ন দেখাইতে পারে না। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" এই তত্ত্বের প্রতি তাহাদের দৃক্‌পাতও হয় না।

তৃতীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ উত্তম শিক্ষক নিয়োগ করার কথা নানা প্রকারে পরিব্যক্ত হইয়াছে। নীতিশিক্ষা পক্ষে মুখের উপদেশ অপেক্ষা চরিত্রের উদাহরণই অধিক কার্য্যকারী। অতএব উত্তম শিক্ষকের নিয়োগ নিমিত্ত বিবিধ প্ররোচনা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও বিবেচিত হইয়াছে যে, এদেশে উপযুক্ত শিক্ষক যদি না মিলে, তবে ইংলণ্ড হইতে শিক্ষক আনাইয়া তাহার আদর্শে এ দেশে শিক্ষক প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কারণ, English standard of discipline অর্থাৎ ইংরাজ আদর্শেই নীতি-চরিত্র শিক্ষা দেওয়া অভিপ্রেত।

চতুর্থ ব্যবস্থায় দণ্ডের বিধান এই হইয়াছে যে, এক এক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তত্রত্য অপরাপর শিক্ষকগণের সহিত প্রতি সপ্তাহে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া দণ্ডের নিয়ম অবধারণ করিবেন। অধ্যাপক (প্রোফেসর) দিগের হস্তে অল্পদণ্ড অর্থাৎ সদ্‌পেণ্ড করার ক্ষমতা থাকিবে। প্রিন্সিপাল বা হেড মাষ্টার কোন ছাত্রকে অত্যধিক দোষী বা শাসনের বহির্ভূত বিবেচনা করিলে, তাহাকে একবারে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট এদেশের প্রাচীন কালের ছাত্র-শাসন প্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন; অথচ বেত্রাঘাতাদি-বিরহিত কোন নূতন কার্য্যকারী বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই। অর্থদণ্ড করিলেও, ছাত্রের পরিবর্ত্তে তাহার পিতার দণ্ড করা হয়। এই সকল সঙ্কট দেখিয়া শেষে, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত, স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত হইয়াছেন।

পঞ্চম ব্যবস্থার অভিপ্রায় এই যে, ছাত্রগণের চেষ্টা হইবে, যেন দাগী দুষ্ট না হইতে হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে এক্ষণে অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রের পড়ার নম্বরের ন্যায় চরিত্রেরও নম্বর রাখা হইতেছে। তাহাতে দেখা যায়, ছাত্র ও শিক্ষকে ন্যায়ান্যায়ের বিচার ও নম্বর টানাটানি চলিয়া থাকে। বিদ্যালয় হইতে এই নম্বর বা উত্তম-মধ্যমাদির মার্ক্যা না পাইলেও ছাত্রের পিতা তাঁহার পুত্রের অপর সপ্ত প্রহরের ব্যবহার দেখিয়া চরিত্র জানিতে না পারেন, এমন নহে।

ষষ্ঠ ব্যবস্থা মতে হোষ্টেল বা বোর্ডিং প্রকরণে পল্লী গ্রামের ছাত্রদিগকে আশ্রয় দিলে তাহারা নগরের সঙ্কট বা সংসর্গ-দোষ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আর, তেমন স্থলে সুশাসন প্রচলিত রাখার সুবিধা হইবার সম্ভাবনা অনেক থাকে। কিন্তু সাধারণ লোক তজ্জন্য অর্থানুকূল্য না করিলে তাহা সংসাধিত হইতে পারে না। অতএব তাহার কোন অনুষ্ঠান হইতে পারিল না।

সপ্তম ব্যবস্থাটী বোধ হয় ইংলণ্ডীয় বা আয়র্লণ্ডীয়। আমরা ইহার ঠিক ভাব পাই না। অতএব এ ব্যবস্থার বিশেষ উপকারিতাও বুঝিতে পারি না। পরন্তু সহপাঠীগণের এক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে কেহ সর্দ্দার হইয়া শাসন প্রয়োগ করিবে, অথবা শিক্ষকের নিকট চর অর্থাৎ গোয়েন্দা হইয়া অপরের গুপ্ত দোষ প্রকাশ করিয়া দিবে, এই ব্যবস্থা থাকিলে ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃ ভাবের বিষম ব্যাঘাত হয়। ইহার উদাহরণ আমরা ছাত্রাবস্থায় কতক কতক দেখিয়াছি। ১৮১৮ অব্দে প্রাতঃস্মরণীয় হেয়ার সাহেব যখন নানা প্রকারের কতকগুলি বিদ্যালয়ের পত্তন করেন, তখন সেই সেই প্রকারের শিক্ষক প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু মনিটর নিয়োগের চেষ্টা হয় নাই। মিশনরিদিগের প্রতিষ্ঠিত বোর্ডিং সমন্বিত নানা প্রকারের বিদ্যালয়ের মধ্যে মনিটর নিয়োগ প্রথা কতক পরিমাণে ছিল। কিন্তু তাহা সুফলপ্রদ হয় নাই। *

অষ্টম ব্যবস্থার তাৎপর্য্য এই যে, উন্নতিশীল অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের সহিত উন্নতিহীন অধিক বয়স্ক ছাত্র একত্রে না থাকে; অর্থাৎ জড়বুদ্ধি বা দুষ্টমতি বয়স্থ ছাত্রেরা এক শ্রেণীতে অধিক দিন থাকিয়া সেই শ্রেণীর নব-প্রবিষ্ট সুকুমারমতি উন্নতিশীল ছাত্রদিগকে সংসর্গ-দোষে নষ্ট না করে। এই অভিপ্রায়ে এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিবার অযোগ্য হইয়া এক ছাত্র এক শ্রেণীতে অধিক কাল থাকিতে পাইবে না।

নবম ব্যবস্থা অর্থাৎ নীতি-গ্রন্থ প্রণয়নের কথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে সবিস্তারে সমালোচনা করিয়াছি। অতএব এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি করিলাম না।

দশম ব্যবস্থার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকার নিয়ম, দৃঢ় রূপে পালন করা হয়; অথচ ভিতরে ভিতরে ধর্ম্ম শিক্ষা চলিতে থাকে। স্কুলের কার্য্যে কঠিন পরিশ্রম করিয়া শিক্ষক স্কুলের পরে আবার ধর্ম্মোপদেশ দিবেন, এবং ক্লান্ত ছাত্রগণ তাহা নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করিবে,—ইহা কর্ত্তৃপক্ষের নিতান্ত গরজের কথা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কোন শিক্ষক একান্ত ধর্ম্মানুরাগী হইলে তিনি রবিবারে বা অন্য ছুটীর দিনে স্কুলে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু ছাত্রগণ আবার

* The Pupil Teacher system.—I. Missionary Manual p. 434.

তেমনি ধর্ম্মানুরাগী না হইলে সে উপদেশ শুনিতে আসিবে না।

এই সকল ব্যবস্থার মর্ম্ম প্রণিধান করিয়া দেখিলে কি ইহা প্রতীতি হয় না যে, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যেরূপ গুরুতর কার্য্য, উক্ত ব্যবস্থাগুলি তাহার পক্ষে উপযুক্ত উপায় নহে? কোন কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, অমুক অমুক দেশে উহা প্রবর্ত্তিত আছে। পরন্তু তাহা সম্যক্ ফলপ্রদ নয় বলিয়াই বঙ্গদেশে, কি শিক্ষক, কি ছাত্র, কেহই তৎপ্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয় নাই এবং এখনও হইল না।

উক্ত উপায়গুলির অযোগ্যতা বা অকিঞ্চিৎকরত্ব হেতু গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও কলেজের হেড মাষ্টার, প্রিন্সিপাল ও ইন্স্পেক্টরদিগের যত্নের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের উক্তি এইঃ—

"The provision of good teachers is of the greatest importance to the well-being of the country, and the signal successes which in India have attended the instruction and training imparted by many devoted and accomplished teachers, whose names it is unnecessary to mention, prove that the school can be made a no less effectual nursery of morality than of mere literary knowledge."

অর্থাৎ উত্তম শিক্ষকের নিয়োগ দ্বারাই এ দেশের মঙ্গলোন্নতি হইবে। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মনিষ্ঠ সুদক্ষ শিক্ষকগণ যে শিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা ফলিতার্থে এ দেশে জ্ঞানোন্নতির সহিত নীতিরও উন্নতি অল্প হয় নাই।

ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রতি আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট আরো বলিয়াছেনঃ—

"In the truest interests of education the cost of providing thoroughly good training Schools and Colleges for teachers of English as well as of vernacular schools should be regarded as a first charge in the educational grant; and that any province, which is now unprovided with institutions suitable for the effectual training of the various classes of teachers required, should take measures by retrenchment, if necessary, to establish the requisite training institutions."

অর্থাৎ স্কুল ও কলেজে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিত নীতিমান্ সুনিপুণ শিক্ষক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে অর্থ প্রয়োজন হয়, তৎপক্ষেই গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ-নির্দ্দিষ্ট টাকা অগ্রে ব্যয় হওয়া উচিত। কারণ, শিক্ষা-বিভাগের কার্য্যের উহাই উৎকৃষ্ট ফল। আর, যে প্রদেশে তাদৃশ (ট্রেনিং) বিদ্যালয় নাই, তথাকার অন্যান্য ব্যয় কমাইয়া এই বিষয়ে সেই অর্থ নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বাপেক্ষা ইন্স্পেক্টর মহাশয়দিগের উপর গবর্ণমেণ্টের দাবী অধিক। অভিপ্রায় এই যে, স্কুলের শিক্ষক বা কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ প্রস্তাবিত বিষয়ে কিছু না করিলে ইন্স্পেক্টরদিগের দ্বারা সর্ব্বার্থ সাধন করিয়া লইবেন। শিক্ষা কমিশনগণের উক্তি ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেনঃ—

"I am to observe that no duty should be performed by Inspecting officers with greater care and thoroughness than the duty of seeing that the teaching and discipline in the school is "calculated to exert a right influence on the manners, the conduct, and the character of the children."

ইহার তাৎপর্য্য এইঃ—যে শিক্ষা ও অভ্যাস ছাত্রগণের রীতি, নীতি ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন পক্ষে সাহায্যকারী হয়, বিদ্যালয়ে সেইরূপ শিক্ষা ও অভ্যাস হইতেছে কি না, ইন্স্পেক্টর এই বিষয় যেমন সর্ব্ব প্রযত্নে ও সর্ব্বাংশে মনোযোগ দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তদপেক্ষা তাঁহার অধিক যত্ন ও মনোযোগের কার্য্য আর নাই।

কিন্তু ইন্স্পেক্টরগণই বা কি করিবেন? তাঁহারা ছাত্রদিগের ধর্ম্ম সম্পর্কে একটী কথা

বলিতে পারিবেন না, এমনি ব্যবস্থা। অথচ ধর্ম্মের নাম না করিয়া, ঈশ্বরের নিকট দায়ীত্ব না দেখাইয়া, কে মনুষ্যকে কর্ত্তব্য-পথে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে? তৎ-পক্ষে গবর্ণমেণ্ট আবার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর প্রতি দৃষ্টি করিলেন। শিক্ষা কমিশনের সহিত একবাক্যে গবর্ণ-মেণ্টও বলিলেন,—ধর্ম্ম শিক্ষা এবং এইরূপ আর যাহা যাহা স্থানীয় প্রয়োজন হয়, তাহার উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্যই তো ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর হস্তে বিদ্যালয় সকল পৃথক্ রূপে স্থাপন করা হইয়াছে। অতএব ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সুসাধনার নিমিত্ত ঐ দুই সভার যত্ন ও চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক।

"This is, I am to add, a phase of the educational question to which the attention of Local Boards and Municipal Committees, who are now entrusted with responsible functions in educational matters should be specially invited.

এইরূপে গবর্ণমেণ্ট নিজের ব্যবস্থায় এ দেশীয় ছাত্রবর্গের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার উপায় ও তদনুযায়ী বিধি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, শেষে হেডমাষ্টার, প্রিন্সিপাল, ইন্স্পেক্টর ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি রাজকীয় মর্য্যাদাধারী কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিলেন। পরিশেষে তাহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির অসম্ভাবনা দেখিয়া দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে ধরিয়া বলিলেনঃ—

"আমরা কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি না, কেবল কতকগুলি উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করি-তেছি। যাহাতে এ দেশের বিদ্যালয় সমূহের কার্য্য প্রণালী ফলোপধায়ী হয়, সকলে বিবেচনা করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করুন।"

"In any event we may hope that, by merely bringing this great educational difficulty to notice, the leaders of native society will realize how closely the interests of all that is best in that society are bound up with its younger representatives. They will, doubtless, bear in mind the saying that the future of a nation depends upon its young men, and will bring all their influence to bear to support the Government in the attempt to render school education a fitter and fuller training for public duties."

—*Sup. to the Gazette of India, Jay. 7, 1888.*

অর্থাৎ—"যেমনই হউক, আমাদের পরিব্যক্ত শিক্ষা সংক্রান্ত এই কঠিন সমস্যা গোচর করিলাম। দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিবেন, তাঁহাদের সমাজের সর্ব্ব শ্রেয়ঃ তাঁহাদের যুবা প্রতিনিধিগণের সহিত কেমন সংবদ্ধ রহিয়াছে। একএক জাতির ভাবী মঙ্গল সেই জাতির নব যুবকদিগের উপর নির্ভর করে। আমরা আশা করি, উপরোক্ত কারণে তাহারা তাহাদের সকল শক্তি-সমর্থ্যের সহিত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার এমন সাহায্য করিবেন, যেন স্কুলের ছাত্রগণ সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্মে অধিকতর ও উৎকৃষ্টতর যোগ্যতা লাভ করিতে পারে।"

আমরা গবর্ণমেণ্টের বিফলপ্রযত্ন হইবার আর এক কারণ এই অনুধাবন করিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট ও রাজকর্ম্মচারীগণ এ বিষয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করেন নাই।

গবর্ণমেণ্টের যে সকল কথা আমরা উপরে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে প্রতীতি হইবে যে, এদেশে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষা প্রচার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের যৎপরোনাস্তি আগ্রহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তন্মধ্যে অনিশ্চিত প্রত্যয় ও নিরাশার লক্ষণও উপলব্ধ হয়।

ইতিপূর্ব্বে শিক্ষা কমিশনগণ কিঞ্চিদূন দ্বিশত সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য বা তাঁহাদের কৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের উক্তি ধরিয়া আপনাদের যে বিভিন্ন মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্টের তাহা বিশিষ্ট রূপ গোচর ছিল। আর স্কুল সকলের প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কগণের অভিপ্রায়ও তাঁহাদের সম্যক্ বিদিত ছিল।

উক্ত কর্ম্মচারীগণের সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় এদেশে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষা দুর্ঘট। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের চেষ্টাও "যথাসম্ভব" লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছিল।

শিক্ষা-কমিশন সভায় যখন সাধারণ-ধর্ম্মমূলক নীতি গ্রন্থ প্রণয়নের আলোচনা হয়, তখন তাঁহারা বলিয়া রাখিয়াছিলেন ঃ—

"The argument in opposition were to the effect that moral teaching is out of place, and likely to fail in its purpose, at a time of life when the obligation of duty is thoroughly known, and when the chief requirement is not to inform the conscience but train the will."

অর্থাৎ—"পুস্তক ধরিয়া নীতিশিক্ষা দিবার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, এই চেষ্টা এদেশের যোগ্য নয়, ইহা প্রায় বিফল হইবে। কারণ ভবিষ্যতে লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সময়ে কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাব হইবে না, তখন বিবেক বুদ্ধি জাগরিত থাকিবে, কিন্তু ইচ্ছার বেগ ফিরাইবে কে?'

উক্ত শিক্ষাকমিশন সভায় প্রস্তাব হয় যে, কলেজের প্রিন্সিপাল অথবা অন্য কোন অধ্যাপক প্রতিবৎসর কলেজের প্রত্যেক শ্রেণীতে "মনুষ্য সাধারণের এবং নগরবাসীর কর্ত্তব্য" এই বিষয়ে এক প্রস্থ উপদেশ (লেকচর) দিবেন। এই প্রস্তাবে উক্ত সভার সকল সভ্যের সম্মতি হইল। কিন্তু—

"The fear was expressed that there would be a danger of such lectures being delivered in a perfunctory manner in case of those Professors who felt that they had no aptitude for the work." *

অর্থাৎ আশঙ্কা রহিল যে, যে অধ্যাপকের এই বিষয়ে স্বাভাবিক তৎপরতা নাই, তিনি ইহা অনিচ্ছাপূর্ব্বক কেবল দায়-উদ্ধার-বৎ নির্ব্বাহ করিবেন।

মিশনরি বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল বা কর্ত্তৃপক্ষীয় মিশনরিগণ উক্তরূপ উপদেশ দানে তৎপর ও নিপুণ বটেন। কিন্তু তাঁহাদের কিম্বা অপর খ্রীষ্টান রাজ-কর্ম্মচারীদিগের এবম্বিধ নীতি-উপদেশ যে সর্ব্বান্তঃকরণ-প্রসূত হইবে, তাহা কদাপি সম্ভব নহে। কারণ, তাঁহারা জানিতেছেন যে, খ্রীষ্ট-বিহীন ধর্ম্মকথা ধর্ম্ম-কথাই নহে; আর এই অখ্রীষ্টানগণ অনন্ত নরকের দ্বারে বসিয়া আছে, কেবল নীতি পালন দ্বারা ইহাদের কি রক্ষা হইবে?

বস্তুতঃ এই সকল কারণেই গবর্ণমেণ্টের এমন জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্যে ও বিবিধ প্ররোচনাতেও কেহ প্রস্তাবিত গ্রন্থ প্রণয়ন বা বার্ষিক উপদেশ দান পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন না।

গবর্ণমেণ্ট শেষে বলিয়াছিলেন ঃ—বিদ্যালয়ে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা কঠিন বটে। কিন্তু সেই কাঠিন্য পরিহারের জন্য সমুচিত চেষ্টা হয় নাই।

"And until failure follows an earnest effort at imparting moral instruction in colleges, the Government of India is unwilling to admit that success may not be secured.'

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত এ বিষয়ে ঐকান্তিক রূপে কৃপা যত্ন বিফল না হয়, সে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন যে, এ দেশের বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার প্রচলন হইতে পারে না।

এই সকল উৎসাহ-প্রোজ্জ্বল উক্তির পরে গবর্ণমেণ্ট স্বীয় আন্তরিক সংশয় প্রযুক্ত নিজেই নিরস্ত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং earnest effort এর পত্তনই হইল না।

আর একটী কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার বিফলতার তৃতীয় কারণ আমরা এই অনুধাবন করিয়াছি যে, প্রতিভূ দ্বারা প্রকৃতার্থের সাধন হয় না। ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষাবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের

---

* Report of the Education Commission. —page 307.

প্রস্তাবিত যে দশ প্রকার উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক উপায়, এক পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন। দ্বিতীয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ দ্বারা উক্ত গ্রন্থের অধ্যাপনা বা উপদেশ। এই দুইটী উপায় প্রধান। অপরগুলি অবান্তর মাত্র। এই দুইটী উপায়ের সাধক কে? পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দুইজন খ্রীষ্টীয় পাদরি (বিশপ) গ্রন্থ প্রণয়নের ভার লইয়াছিলেন। আর, বিলাতের আদর্শ-শিক্ষক, বা সেই আদর্শে প্রস্তুত এখানকার দেশীয় শিক্ষক তাহার অধ্যাপনা করিবেন, এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাকেই আমরা প্রতিভূ দ্বারা প্রকৃতার্থ সাধনের চেষ্টা বলি।

মূল প্রস্তাব এই যে, সার্ব্বভৌমিক ও স্বাভাবিক ধর্ম্মের মূলে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া হইবে। এস্থলে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, এ ধর্ম্মের শিক্ষক বা গ্রন্থ-প্রণেতা কে হইতে পারেন? যাঁহারা revealed religion অর্থাৎ দেবাদিষ্ট ধর্ম্মের ভক্ত, তাঁহারা কেমন করিয়া natural and universal religion অর্থাৎ স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিবেন, তাহা বুঝা দুষ্কর।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা ঈশ্বর-প্রদত্ত একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সে ধর্ম্মগ্রন্থকে পশ্চাতে রাখিয়া কাহার কথা ধরিয়া নূতন গ্রন্থ সঙ্কলন করিবেন? সে গ্রন্থের মর্য্যাদা কি হইবে? সে গ্রন্থ ধর্ম্ম বিবেক (conscience) জাগরিত রাখিতে পরে, কিন্তু প্রবৃত্তিকে (will) নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে কি? নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা পক্ষে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্যকারী, ইহা নানা প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যে গ্রন্থে ঈশ্বর ও ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুদিগের দৃষ্টান্ত সর্ব্বোপরি জাজ্জ্বল্যমান, সেই গ্রন্থ এই বিষয়ে যথার্থ উপযোগী। তদনুযায়ী শিক্ষাই মনুষ্যকে সকল পার্থিব সঙ্কটের মধ্যে আজীবন কর্ত্তব্য পথে অটল রাখিতে পারে।

আমাদের প্রত্যয় এই যে, যাঁহারা যোগী ও তপস্বী, যাঁহারা ধ্যানচিন্তাপরায়ণ, যাঁহারা সংসারের দুর্গতি জানিয়া ঈশ্বরের নিকট দিনে নিশীথে একান্তমনে প্রার্থনা করিয়া লোকহিত জানিতে পারিয়াছেন, এবং নিঃস্বার্থে তদনুযায়ী উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত সেই যোগী ও তপস্বীদিগের বাক্য আবশ্যক; যে হেতু, সেই উপদেশের সঙ্গে উক্ত মহাপুরুষদিগের চরিতাদর্শ আমাদের সম্মুখে বিধৃত হইয়া থাকে। আর, যাঁহারা উক্ত ধর্ম্মবক্তাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করেন, এবং আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সেই ধর্ম্মবক্তাদিগের কথাই কহিয়া থাকেন, তাঁহারাই উক্ত উপদেশ বাক্যের বক্তা, পাঠক, বা ব্যাখ্যাতা হইতে পারেন।

এস্থলে কেহ বলিবেন, তবে কি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও বশিষ্ঠাদি ঋষির বাক্য ভিন্ন আর কিছুতে নীতি শিক্ষা হইতে পারে না? আমরা বলি, তাহা কেন? যীশুখ্রীষ্ট ও পৌল প্রভৃতির বাক্যও উত্তম নীতি-পথ-প্রদর্শক। আমরা শুনিতেছি, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডফ্ যখন বাইবেলোক্ত প্রথম করিন্থীয় পত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ করেন, তাহা শুনিয়াই এক দল হিন্দু যুবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আস্থাবান্ হয়েন।

"প্রেম চিরসহিষ্ণু ও মধুর; প্রেম ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব্বিত হয় না, অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, আশু ক্রোধ করে না, অপকার গণনা করে না, অধার্ম্মিকতাতে আনন্দিত না হইয়া সত্যের সহিত আনন্দ করে; সকলই বহন,

করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্য্য পূর্ব্বক সহ্য করে।"

আহা! এই যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম হয়, তবে প্রার্থনা করি, অচিরাৎ সমস্ত ভারতবাসী খ্রীষ্টান হউন।

খ্রীষ্টীয় পাদরিগণ আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ঐ উৎকৃষ্ট নীতি আদর্শ এবং তাহার বক্তা সাধু পৌলের চরিত্র আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করুন, আমাদের হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ভেদ করিয়া উক্ত ধর্ম্মাদর্শ তাহাতে প্রবিষ্ট হইবে।

হিন্দুদিগের মধ্যেও যাঁহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ, জ্ঞানবান এবং আচার-পূত, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান জন্য নিয়োগ করা হউক। তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত যোগী ও তপস্বীগণের সেবিত নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ দিলে মনুষ্যের অন্তঃকরণ তন্ময় হইয়া যাইবে।

ইতি পূর্ব্বে বঙ্গদেশের জ্ঞানবান স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুগণ উক্ত প্রকারে, ফারসী ও সংস্কৃত, উভয় ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থ দ্বারা পুণ্যশীল মহাত্মাগণের সাধু চরিত্রের অনুধ্যান করিতেন। এক এক প্রকৃত হিন্দু বিদ্বান্ ব্যক্তির গৃহে ঐরূপ শত শত গ্রন্থ এখনো তাঁহার উদার ধর্ম্মভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই সকল মূল গ্রন্থের অনুবাদিত, লোক পরম্পরায় প্রচলিত ও ব্যাখ্যাত এবং অনেক অংশে বিতথাভূত ভাব লইয়া যাঁহারা নূতন গ্রন্থ রচনা করিবেন,—আপনারা ক্ষুদ্র ও মলিন হইয়াও ধর্ম্মবক্তার পদারূঢ় হইবেন;—এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া এক এক দেশের বা জাতির উদ্ধার সাধনের গৌরব করিবেন; তাঁহাদের প্রভাব-মুখরিত কথায় সদ্য মন পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু তদ্দারা যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ধ্রুবা নীতি ও নিত্য ধর্ম্ম সঞ্চিত হইবে না।

উক্তরূপ গ্রন্থ ও তাহার উক্তরূপ বৈষয়িক (secular) অধ্যাপককে প্রকৃত ধর্ম্ম গ্রন্থের ও ধর্ম্মোপদেষ্টার 'প্রতিভূ' বলি। তাঁহাদের দ্বারা নীতি ও ধর্ম্মোপদেশের সর্ব্বাঙ্গীন ফল লাভ হইতে পারে না।

শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনগণও প্রস্তাবিত গ্রন্থ ও তাহার উপদেষ্টার সম্বন্ধে নানা সংশয়াবিষ্ট হইয়া ভগ্ন মনে কয়েকটী আপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। সেই 'প্রতিভূর' অবলম্বনে প্রকৃত কার্য্য সাধন না হওয়াতে, গবর্ণমেণ্টের জ্বলন্ত উৎসাহ এবং ঐকান্তিক আগ্রহ কাজেই ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িল।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

"বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে ?"

তোমরা কি কেহ বল্‌তে পার—ম'লে কি হয়? মনে করি কথাটা মনে আনিব না। এ বিভীষিকাময় কথাটা মনে এনে আর জ্বালার উপর বিষম জ্বালা দিয়া প্রাণটাকে জ্বালাইব না। একেত সারাটা জীবন কেবল দুঃখের ভরাই বহিতেছি। সংসার-পথে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই কেবল যন্ত্রণার শিকল বাড়িয়াই যাইতেছে। তাহার উপর আবার ভবিষ্যতের দুঃখের বোঝা চাপাই কেন? যে ক দিন বেঁচে থাকা যায়, হেঁসে খেলে একরূপে কাটাইয়া দেওয়াই ভাল।

কিন্তু তা পারি কই? সময় নাই, অসময় নাই, কথাটা দুপ্ করিয়া অজ্ঞাতসারে কোথা হইতে আসিয়া মনের উপর আঘাত করে।

এই ত আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলাম। দু পাঁচ জন বন্ধুতে মিলিয়া—দুঃখের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া, হেসে খেলে সময় কাটাইতে-ছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃদু-সঞ্চারী পবন, পেচকের অমঙ্গল ধ্বনির ন্যায়, কি এক বিকট শব্দ বহিয়া আনিল—'হরি-বোল'! এ ত সে হরিবোল নহে -যাহাতে ভক্তের তাপিত প্রাণ শীতল হয়, আর্ত্তের প্রাণে অমিয়া ঢালিয়া দেয়। ইহা ত ভাব-ময় নহে। এ যে দারুণ অভাবব্যঞ্জক। কে যেন ছিল, সে যেন নাই—কে যেন যাই-তেছে, সে যেন আর আসিবে না—কে যেন যাইতে যাইতে আমায় অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া ডাকিতেছে। এ 'হরিবোল' বুঝি সেই ডাকের—সেই মহাকালের মহা আহ্বানের 'অনুস্মচনা মাত্র। ইহা যেন বর্ত্তমানকে একে-বারে মুছিয়া ফেলিয়া—অতীতের অনন্ত সাগরে ডুবাইয়া দিয়া—তাহার উপর ভবি-ষ্যতের দুর্ভেদ্য কুহেলিকা আবরণ বিছাইয়া দিতেছে। এ হরিবোল মহাকালের মহাতূর্য্য নিনাদ—কালের ভৈরব বিজয় হুঙ্কার।

তখন প্রাণের মধ্যে একরূপ বিকট নৈরাশ্যের বাতাস বহিয়া গেল। প্রেতিনীর বিষম হাঁসির তরঙ্গ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া, কাণের মধ্যদিয়া আমার মরমে পশিল। বুকটা দুড়্‌ দুড়্‌ করিয়া উঠিল। তখন আমার হাসির হিল্লোল কোথায় মিশিয়া গেল। আন-ন্দের উৎস শুকাইয়া গেল। মনটা সেই হরি-ধ্বনির পিছু পিছু উধাও হইয়া চলিল। তখন অজ্ঞাতসারে ভাবনা আসিল, যাহারা মরে—তাহারা কোথায় যায়? আমিও মরিব। কিন্তু মরিয়া কোথায় যাব? ঐরূপ হরি-বোলের সহিত আমায় কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে পাঠাইবে! একটু সামান্য অন্ধকারে ভয় পাই, আঁধার নিশিতে চারিদিকে বিভীষিকা বোধ হয়, বাহির হইতে ভয় হয়। আমি সে অনন্ত অন্ধকারে কোথায় যাব? কেমন করিয়া যাব? তাই ত মরণে এত ভয়! যদি মরিলে কি হয়, জানিতাম, তবে কি ভয় থাকিত? কতকক্ষণ পরে, জানিনা—আমার সংজ্ঞা হইল। মনে করিলাম, কেন মিছে আর ভাবি। যাহার ভাবিয়া একটা মীমাংসা হয় না—এ পর্য্যন্ত যাহার কোন মীমাংসা করিতে পারিলাম না, তাহার জন্য আবার ভাবনা আসে কেন? আমি কতবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এ মরণের কথা—এ অমঙ্গলের কথা, আর ভাবিব না। তবু আবার এ ভাবনা আসে কেন? তখন "দূর হউক" বলিয়া, মনটার লাগাম বড় জোর করিয়া টানিয়া ফিরাইয়া আবার বন্ধু-গণের আনন্দ উৎসবে যোগ দিলাম।

কিন্তু হায় সব বৃথা হইল। আবার এ কি শুনিলাম! এযে হৃদয়-বিদারক দারুণ ক্রন্দনের রোল। আহা, অভাগিনী জননী তাহার প্রাণের প্রাণ, জীবনের অবলম্বন, নয়-নের আলোক, অন্তরের স্মৃতি, সংসার-সাগ-রের সুখ-তারা, তাহার সর্ব্বস্ব-ধন একমাত্র পুত্রকে অতি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় সর্ব্বগ্রাসী ভয়ানক কালের দ্রংষ্ট্রাকরাল কালানলসন্নিভ বিশাল বদনে বিচূর্ণিত হইতে দেখিয়া, মহা আর্ত্তনাদে দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে; মহাশোকের গগনভেদী স্বরে আমাদের অন্তরের করুণায় উৎস ছুটাইয়া দিতেছে—ঐ হৃদয়-বিদীর্ণকারী রব শুনিয়া কি স্থির থাকা যায় গা! উহাতে প্রাণ স্তম্ভিত হয়, আনন্দের কোলাহল নীরব হয়, সুখের ক্ষীণালোক নিবিয়া যায়, অন্তরে চিন্তার উৎস ফুটিয়া উঠে। তখন কল্পনা মনকে টানিয়া পরকালের দিকে, সুদৃঢ় ভবি-

ষ্যতের অজ্ঞাত রাজ্যের দিকে নিয়া যায়। মনের মধ্যে আবার ঐ চির নূতন প্রশ্ন উঠে—"বল দেখি ভাই কি হয় মলে ?"

ক্রমে আমার পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এমন এক দিন গিয়াছে, যখন আমি এমনি শোক-সাগরে ডুবিয়াছিলাম। যখন প্রতি শিরায় শিরায় বৃশ্চিক দংশন করিযাছিল, ধমনিতে শোণিত বুঝি জমিয়া গিয়াছিল। তথন জীবন ঘোর বিভীষিকাময় বোধ হইয়াছিল, বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যাইবাব জন্য,অনন্ত শূন্যে আমার আমিত্বকে একেবারে মিশাইয়া দিবার জন্য নিরন্তর মৃত্যু কামনা করিয়াছিলাম। সে দিনের—সেত দিন নহে,যেন একটা মহা যুগের—কথা মনে পড়িল। যখন আমার মূর্ত্তিমতী স্নেহেব পুতলি, প্রীতির আশ্রয়ভূমি, প্রাণেব জুড়াইবার স্থান, আমার জীবন-মরুর ওয়েসিস্, আমাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাকালের মহা ঊর্মির কঠোব আঘাতে কোথায ভাসিয়া গেল—সে দিনের কথা মনে পড়িল। যথন প্রতি দীর্ঘশ্বাসে প্রাণটা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল, হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল—যখন আকুল প্রাণে শোকে অন্ধ হইয়া,আমার সেই হারাণ ধনের অনুসন্ধানে সারা সংসারটা ঘুরিয়া বেড়াইব মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহাকে পাইবার আশা জীবনের অবলম্বন করিয়াছিলাম, সে দিনের কথা মনে পড়িল। আবাব যখন সে আশার বাসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,—যখন নবীন শোকের মোহ,কুহেলিকা ভেদ করিতে পারিলাম—যখন এ সংসারে আর তাহাকে পাইব না বুঝিলাম, তখন পরকালে তাহাকে পাইবার আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম, সে দিনের কথা মনে পড়িল। তখন ভাবিয়াছিলাম, বিধাতা কি এমনই নির্দ্দয় যে, তিনি আমার সর্ব্বস্ব-ধন কাড়িয়া নিয়া, আমার জীবন মরুভূমি করিয়া দিয়া, হিংস্রক রাক্ষসের ন্যায—শোকের রাবণের চিতায় শোয়াইয়া আমাকে চিরকাল পোড়াইয়া মারিবেন? তাই তখন পরকালে বিশ্বাস হইয়াছিল। বুঝি আশাই আমাদের বিশ্বাসের মূল। তাই তখন পরকালে আমার সে হারাণ ধন পাইবার জন্য বুক বাঁধিযা সংসার-মরুভূমের বাকী পথটুকু কোন রূপে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। সে দিনেব কথা মনে পড়িল।

কিন্তু হায! সে আশাও যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন আমার আঁধারময় জীবন-সাগরে পরকালেব আশাই যে একমাত্র ধ্রুবতারা ছিল! সেই আলো লক্ষ্য করিয়াই ত আমি এই অপার ভব-সাগবে আমাব ক্ষুদ্র জীবন-ভেলা ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। সেই-আশা রজ্জুতে আমার লক্ষ্যহীন,কক্ষভ্রষ্ট,দিশাহারা মনটাকে কোন রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। হায়,সে আলো যে নিবিয়া গিযাছে! সে আশার বন্ধন যে ছিঁড়িয়া গিযাছে! এমন এক দিন ছিল, যখন পরকালে বিশ্বাস বড জলন্ত ছিল। এ ধ্রুবতারার আলোক বড উজ্জল ছিল, সে বিশ্বাস বড় পরিষ্কার, বড় ফুটন্ত ছিল। হায! সে আলো যে এখন আর দেখিতে পাই না। অবিশ্বাসের ঘোর কুহেলিকায, সন্দেহের দারুণ কালমেঘে সে আলো যে নিবিয়া গিয়াছে। সে ধ্রুবতারা যে অদৃশ্য হইয়াছে! আমি দিশাহারা হইয়াছি। আমার এ ক্ষুদ্র জীবন-ভেলা কালের উত্তাল তরঙ্গে ডুবু ডুবু হইয়াছে। যে আশাকে কাণ্ডারী করিয়া আমার জীবনতরি সংসার-সাগরের তরঙ্গ ভঙ্গে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম,সে আশাও আর 'দিল না পদ তরণির অঙ্গে'! আমার ভক্তি-পাল ছিঁড়িয়াছে,শ্রদ্ধা-হাল ভাঙ্গিয়াছে—

বুঝি আমার এ জীর্ণ তনুর তরি ভবসাগরে বানচাল হইয়া ডুবিতেছে। প্রাণ আকুল হইয়াছে, আমার জীবনের সকল উদ্যম, সকল চেষ্টা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। প্রাণ নিরাশার ক্রোড়ে শুইয়া পড়িয়াছে, আর কেবলই বিকট বিভীষিকাময়ী স্বপ্ন দেখিয়া ডরাইয়া উঠিতেছে। কত দিন ধরিয়া বড় ব্যাকুল মনে আবার সেই আশা-ধ্রুবতারার অনুসন্ধান করিলাম। তখন মনে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছিল—"বল দেখি ভাই কি হয় মলে?" সে জিজ্ঞাসার আজিও উত্তর পাই নাই।

হায় হায় কেন বিশ্বাস হারাইলাম, কেন তর্ক যুক্তির উপর নির্ভর করিলাম। কেন শুক্তিতে মুক্তা ভ্রম করিলাম, কেন সোণা ফেলিয়া গিল্টীতে ভুলিলাম, আসল ফেলিয়া নকল লইলাম, মাণিকের পরিবর্ত্তে স্ফটিক লইলাম, মেকি ঝুঁটার আদর করিলাম। হায় বিধাতা! কেন আমাদের বুদ্ধি দিয়াছ। কেন বিশ্বাস ভিত্তিকাড়িয়া লইতেছ। কেন আমাদের চিন্তাস্রোতকে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছ। আমাদের দিশাহারা করিয়া দিয়াছ। তাই ত আমার বিশ্বাসের স্থানে অবিশ্বাস আসিয়াছে, শ্রদ্ধার স্থানে অশ্রদ্ধা আসিয়াছে, নিশ্চয় ধারণার স্থানে সন্দেহ আসিয়াছে, আপ্ত নির্ভর স্থানে জিজ্ঞাসা আসিয়াছে। তাই ত প্রশ্ন উঠিয়াছে—"বল দেখি ভাই কি হয় মলে।"

তা প্রশ্ন ত উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহার একটা মীমাংসা হইল না কেন? আমার সে সন্দেহ-মেঘ উড়িয়া যাইল না কেন? আমি কি আর সে পরকালে বিশ্বাসরূপ ধ্রুবতারা দেখিতে পাইব না? যে দিন প্রাণের প্রাণ আলোড়িত করিয়া, হৃদয়-গ্রন্থী ছিন্ন করিয়া দিয়া, অন্তর-সাগর মথিত হইয়া এই প্রশ্ন-বিষ প্রথম উঠিয়াছিল, সে দিন—অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছে। যে দিন হৃদয়ে বিশ্বাসের আসন প্রথম টলিয়াছিল, যে দিন প্রাণের ভিতর মহা ঝড় উঠিয়াছিল—মনটা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, যে দিন সকলই শূন্যময় বোধ হইয়াছিল, সে দিন—অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতে—সময় নাই, অসময় নাই—মধ্যে মধ্যে আসিয়া এই প্রশ্ন আমার প্রাণের দ্বারে আঘাত করিয়া যায়। কখন বা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া এক একবার ছায়াময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া যায়। কখন বা অন্তরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রাণটাকে ওলট্ পালট্ করিয়া দেয়। প্রশ্ন উঠে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত তাহার কোন মীমাংসা খুঁজিয়া পাইলাম না। মীমাংসার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি, কত দিগবিদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কই তবু ত জিজ্ঞাসার শেষ হইল না। কত কাব্য ইতিহাস, সাহিত্য দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়াছি, মনের মত উত্তর ত খুঁজিয়া কোথাও পাইলাম না। এখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। এখন মনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। মনে করিয়াছি, আর এ কথা মনে আনিব না। কিন্তু তবু সময় নাই, অসময় নাই—কেন অন্তর-সাগর মথিত করিয়া, কথাটা মনে আসে? কেন ভাই এ প্রশ্ন উপস্থিত হয়—"বল দেখি ভাই কি হয় মলে?"

কি নিরর্থক প্রশ্ন! মানব জ্ঞানের এমন সাধ্য নাই যে ইহার মীমাংসা করে। ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, প্রত্যক্ষের অধীন মানব জ্ঞান, কেমন করিয়া সে অসীম অনন্তের দ্বার উদ্ঘাটন করিবে। কেমন করিয়া সে অভেদ্য ভবিষ্যত কালের মহা আবরণ ভেদ করিবে? মানুষ ত এই অনন্ত সংসার-

সাগর-বেলায় বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রতম বালুকণা মাত্র। সে ত জ্ঞানকাণা। তার কি সাধ্য যে, সে অনন্ত জ্ঞান-সাগরের মধ্যে ডুব দিয়া সত্য-রত্ন উদ্ধার করিবে! তবু ত অবোধ মন বুঝে না। এ কথার উত্তর পাইবার জন্য কত খুঁজিয়াছি, কত ঘুরিয়াছি, কত দেখিয়াছি মনে পড়ে। এক দিন শুনিলাম, পৃথিবীর নাকি সকল ধর্ম্মযাজক মিলিয়া একটা মহা পার্লামেণ্ট না মহাকঙ্গ্রেস্ খুলিয়াছে। ভাবিলাম, দেখি একবার যদি ইহাদেরই কাছে একটা মীমাংসা পাই। হরি হরি! চেষ্টা সকলই বৃথা হইল। নানা ধর্ম্মের নানা মত। কেহ বলিল "তুমি মরিয়া অনন্ত নরকে যাইবে।' কেহ বলিল, 'আমার এই জল একটু মাথায় দাও,' তোমায় অনন্ত স্বর্গে লইয়া যাইব।' কেহ বলিল, 'আমার কাছে আইস, আমি তোমায় অনন্ত কালের জন্য অপূর্ব্ব পরীস্থানে পাঠাইয়া দিব।' কেহ বলিল—'কর্ম্ম ফল—কর্ম্ম ফল—কেবলই কর্ম্ম-ফল। যেমন বীজটী বুনিবে, তেমনি ফলটী পাইবে। যদি অন্তর জমী খানা ভাল করিয়া চাষ করিয়া ধর্ম্মবীজ রোপিয়া থাক,তবে স্বর্গে যাইবে। নতুবা তোমার জন্য মহারৌরবের পথ পরিষ্কার হইতেছে।' আরও কত লোকে কত কি বলিল, সকল কথা এখন মনে হয় না।

সে দিন একজন প্রশান্তমূর্ত্তি দীর্ঘকায় ঋষি সদৃশ পুরুষ আমায় বলিয়াছিলেন—

"তুমি ধর্ম্মের আশ্রয় জন্য কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মের মূল যে বিশ্বাস! সে বিশ্বাস—সে শ্রদ্ধা যখন হারাইয়াছ, তখন ধর্ম্মের আশ্রয় পাইবে কিরূপে? তর্ক যুক্তি শাস্ত্র লইয়া, ন্যায় শাস্ত্রের ফাঁকির ব্যূহ রচিয়া, বাদ বিতণ্ডা জল্পনা বলে কি ধর্ম্ম রাজ্য জয় করা যায়! আরশোলা কি তোমায় বিশ্বাস আনিয়া দিতে পারে? তর্ক যুক্তির কড়ি দিয়া কি বিশ্বাস কিনিতে পারা যায়?"

আমি বুঝিলাম,কথাটা ঠিক বটে! ছেলেবেলা যে শুনিয়াছিলাম "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর!" সে কথাটা যে ঠিক, তাহা আমি তখন বুঝিতে পারিলাম। হায়! সত্য গুলি এইরূপ মনের মধ্যে যতক্ষণ আপনা আপনি না ফুটিয়া উঠে, ততক্ষণ তাহাদের ধরিতে পারা যায় না—ততক্ষণ তাহারা 'আপনার' হয় না। সেই যে ছেলেবেলা শুনিয়াছিলাম, "পরকে কটু কথা কহিও না"—কই সে কথাটা কখন ত মনে স্থান পায় নাই। প্রাণের কাছে কথাটা সেই হইতে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। কই কখন ত তাহাকে মনের ভিতর প্রবেশ করিতে দিই নাই। কত লোককে কত কটু বলিয়াছি—কত লোকের অন্তরে কটু বাক্যের বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছি; কই কখন ত ভাবি নাই—পরকে কটু কথা কহা দোষ। কিন্তু আহা সে দিন—আমার পক্ষে সেই এক মহাদিন—সে দিন ঐ কথাটার মর্ম্ম বুঝিয়াছিলাম। সে দিন অন্নাভাবে শীর্ণ, বসন অভাবে নগ্নপ্রায়, দীনহীন ভিখারীকে আমার দ্বার হইতে দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাড়াইয়া দিতে গিয়াছিলাম—তখন তাহার আকুল করুণাপূর্ণ নয়ন নিস্তব্ধ ভাষায় কি যে কহিয়া গেল—সে কথাটা দড়াস্ করিয়া আমার প্রাণে আঘাত করিল। জীবনে বুঝি আমি তেমন আঘাত পাই নাই। সেই দিন—সে মহা দিনে আমি অমূল্য সত্য লাভ করিলাম—পরকে কটু কহিও না। তখন অন্তরের অন্ধকারময় গৃহ হঠাৎ আলোকিত হইয়া উঠিল। শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ স্রোত বহিয়া গেল। তখন বুঝিয়াছিলাম,প্রত্যেক সত্যকে এইরূপে লাভ করিতে হয়। তখন ভাবি-

য়াছিলাম, বুঝি এইরূপে আর্য্য ঋষিগণ সত্য লাভ করিতেন—তত্ত্বদর্শী হইতেন। তখন বুঝিয়াছিলাম—এইরূপে শাক্যমুনি মহা বোধীমূলে সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন সত্য লাভ করিয়া 'বুদ্ধ' হইয়াছিলেন। কিন্তু কি কথা বলিতে কি কথা বলিতেছিলাম!

সে দিন সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি পুরুষের কথার বৈদ্যুতিক শক্তিবলে প্রাণের সাগর মথিত হইয়া, মহা সত্য লাভ করিয়াছিলাম—বিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম্মের অন্য মূল নাই। তখন ধর্ম্মের বাজারে বিশ্বাস কিনিতে বাহির হইলাম। কিন্তু মূল ধন লইলাম—সেই তর্ক যুক্তি, সেই ন্যায়শাস্ত্রের কচ্‌কচি, আবার সারা জগতের ধর্ম্মবাজার ঘুরিয়া আসিলাম। আবার সেই ধর্ম্মের মহা পার্লামেন্টে বেড়াইলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার বুদ্ধির পায়ের শিরা ছিঁড়িয়া গেল; কত ধর্ম্মযাজকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ডাকিলাম—"ওগো তোমরা কেহ আমায় বিশ্বাস মিলাইয়া দিবে গো।" তা কই কেহ ত আমার বিশ্বাস দিতে পারিল না। অনেকে খদ্দের ডাকিল বটে। অনেক ধর্ম্মের দোকানদার ধর্ম্মের পশরা লইয়া ধর্ম্ম-হাটে ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে। অনেকে ডাকিতেছে, তাহার মাল সরেস। তখন আশার একটু ক্ষীণ আলোক হৃদয়ের নিভৃত কোণে দেখা দিল। তাহাদের বলিলাম—তবে কি তোমরা কেহ আমার ধর্ম্ম বিক্রয় করিবে গো! আমি বাছা বাছা যুক্তিমোহর আনিয়াছি। তাহারা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল "পাগল, যুক্তি কড়িতে কি ধর্ম্মের বিনিময় হয়। ইহার একমাত্র মূল্য বিশ্বাস।" আমি বলিলাম, আমি ত তাই জানিয়াছি। আমি ত ঐ 'বিশ্বাস' 'শ্রদ্ধা' কিনিতেই আসিয়াছি। তাহারা বলিল, তাহাদের ধর্ম্মের বজরা মধ্যে 'বিশ্বাস' বিক্রয়ের জন্য থাকে না।

বড় নিরাশ হইয়া, ক্লান্ত মনে, শ্রান্ত দেহে ফিরিতেছিলাম। এমন সময় পশ্চাতে দেখিলাম, এক জটাজুটধারী গৈরিক-পরিহিত সন্যাসী। যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি দাঁড়াইয়া আছেন। সন্যাসী ঠাকুর আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন—বুঝি ব্যঙ্গ করিলেন। তাহার পর আমায় বলিলেন—এ ধর্ম্মের বাজারে তুমি কি কেনা বেচা করিতে আসিয়াছিলে? আমি বলিলাম, "ঠাকুর সে কথায় আর কাজ কি? আমি ধর্ম্ম কিনিতে আসিয়াছিলাম, পরকাল কি—বুঝিব বলিয়া। তা জানিলাম, বিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম্ম মিলে না। তখন বিশ্বাস কিনিতে গেলাম। কিন্তু বিশ্বাস ত কোথাও কিনিতে মিলিল না।" সন্যাসী ঠাকুর আবার হাসিলেন, বলিলেন—

"পাগল, বিশ্বাস কি বাজারে মিলে? বিশ্বাস যে আমাদের নিজের সম্পত্তি। আপন মনের মধ্যে অনুসন্ধান কর—দেখ দেখি, তোমার হৃদয়ে বিশ্বাস আছে কি না? মা জগন্ময়ী জগদম্বা বিশ্বের আদ্যাশক্তি মহামায়া—তিনিই বিশ্বাসরূপে, শ্রদ্ধারূপে জীবের অন্তরে অবস্থিত। একবার আপন হৃদয় মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ,—দেখ দেখি, মা তোমার হৃদয়ে বিশ্বাসরূপে আবির্ভূতা কি না? যদি না থাকেন, তবে তাঁহার আরাধনা কর—তাঁহাকে প্রসন্ন কর—তাঁহার সেবা কর। তিনিই তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া—শ্রদ্ধারূপে তোমার অন্তরে তাঁহার আসন স্থাপিত করিবেন, তুমি পবিত্র হইবে"।

এই বলিয়া সন্যাসী ঠাকুর গাহিতে গাহিতে চলিলেনঃ—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেন সংস্থিতা।
নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ—নমোনমঃ॥"

আজিও বুঝিলাম—বিশ্বাস বাহিরের জিনিস নহে, উহা বাজারে খরিদ বিক্রয় হয় না, উহা

তর্ক যুক্তি দ্বারা পাওয়া যায় না। আমাদের আপন প্রকৃতিতে—নিজ স্বভাবে যদি বিশ্বাস বীজ না থাকে—তবে বৃথা চেষ্টা! সন্ন্যাসী ঠাকুর ত বলিলেন—মা জগদম্বার সাধনা কর, বিশ্বাস মিলিবে। কিন্তু বিশ্বাস না থাকিলে সাধনায় প্রবৃত্তি আসিবে কোথা হইতে? বীজের মূল বৃক্ষ—আর বৃক্ষের মূল বীজ। বিশ্বাস হইতে সাধনা, আর সাধনা হইতে বিশ্বাস! কথা বড় মন্দ নহে। আমার সন্ন্যাসী ঠাকুরের উপর বড় শ্রদ্ধা রহিল না।

কিন্তু বড় দুঃখ হইল। হায়, সেকালে যে বিশ্বাস আমার ছিল, তাহা কোথায় গেল! কি পাপ করিয়াছিলাম যে বিশ্বাস আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! কেন আমি অবিশ্বাসের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমার স্বভাবে ত বিশ্বাস-বীজ অঙ্কুরিত ছিল। এক দিন ত এমন ছিল, যে দিন আমাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতাম, পরকালে বিশ্বাস করিতাম, এখন সে দিন কোথায় গেল! কেন আমি এ কালের লেখা পড়া শিখিলাম। কেন সভ্যতার অভিমানে বৃথা মত্ত হইলাম। কেন তর্ক যুক্তিকে সার করিলাম! তাইত আমার বিশ্বাস হারাইয়াছি। হায় যদি বিশ্বাস হারাইলাম—তবে মরিলাম না কেন! যদি বিশ্বাসরূপিনী জগন্মাতা অশুচী বলিয়া আমার এ দীন হৃদয়মন্দির ত্যাগ করিয়া গেলেন, তবে এ শূন্য মন্দির চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিই না কেন?

সাধে কি দুঃখ করিতেছি। বলিয়াছি ত—আমি মাণিক ফেলিয়া কাচ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। আমি ত নিজেই বিশ্বাসকে আমার হৃদয়মন্দির হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলাম। আপনাকে বড় বুদ্ধিমান ভাবিয়া তর্ক ন্যায় যুক্তির শরণ লইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম—তাহাদের সহায়ে জ্ঞানোপার্জ্জন করিব—বড় একটা পণ্ডিত হইব। সেই দম্ভই ত আমার এই পতনের মূল। এখন আমার কি দুর্দশা হইয়াছে দেখ। যে কথাটা প্রথম সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়, সেই কথাটারই কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না। মরিয়া আমি কি হব—আগে এ কথাটার একটা মীমাংসা করিয়া না লইয়া ত আমাদের এক পদও যাইবার উপায় নাই। অনন্ত অজ্ঞেয় রাজ্যের এইটীই প্রথম ঘাঁটি। এ ঘাঁটি পার না হইলে, যাইব কোথায় বল? তা সারা জীবন অনুসন্ধান করিয়াও ত এ প্রশ্নের একটা মীমাংসা করিতে পারিলাম না। এক কাল গিয়াছে,যখন দর্শনশাস্ত্রের বাজারে গিয়া একটা মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে দুঃখের কথা আর বলিব কি। ধর্ম্মের বাজারে গিয়া যেমন হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি—এখানেও ততোধিক বিড়ম্বনা সহিয়াছি।

যখন প্রথম গিয়া দর্শনের বাজারে প্রবেশ করিলাম—তখন একজন পাণ্ডা আসিয়া বলিল 'এখানে প্রমাণ-কড়ি দিয়া সত্য কিনিতে হয়—তুমি কি প্রমাণ আনিয়াছ?' আমি বলিলাম, ভাই রাগ করিও না। আমি প্রমাণ সংগ্রহ করিতেই আসিয়াছি।" আগে প্রমাণ সংগ্রহ করি, তাহার পর দেখিব, তাহাতে কোন সত্য কিনিতে পারি কি না। সে বলিল "আইস আমি তোমায় এ বড়বাজারের প্রমাণপটিতে নিয়া যাইতেছি।" প্রমাণপটিতে গিয়া দেখি এক জন দোকানদার ডাকিতেছে—"আমার কাছে আইস। যদি খাঁটী মাল সস্তায় পাইতে চাও ত আর

কোথাও যাইও না"। আমি তাহার ডাক শুনিয়া গেলাম। তাহাকে বলিলাম "কই তোমার কি প্রমাণ আছে দেখাও।" সে বলিল "আমি বাজে জিনিস রাখি না। আমার কাছে খাঁটী মাল আছে। আমার এক প্রমাণ। আমি কেবল 'প্রত্যক্ষ' প্রমাণ বিক্রয় করিয়া থাকি"। সে আমায় আরও বলিল 'সাবধান, যেন বাজে দোকানদারের বাজে কথায় ভুলিও না। এই এক প্রমাণই আসল—আর সব মেকি—সব ঝুটা।"

আমি বলিলাম, "তাই হউক, তুমি এক্ষণ মরিলে কি হয়, তাহার প্রমাণগুলি বাছিয়া দাও ত, আমি দেখিয়া লই।" দোকানদার তখন একটা বিকট রকম হাসি হাসিয়া উনপঞ্চাশ রকমের মুখ ভঙ্গী করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিল যে, পরকালের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। আমি বুঝিলাম, কথাটা ঠিক বটে। পরকাল হইতে কেহ ত কখন ফিরিয়া আসে নাই। কেহ ত সেই অজ্ঞাত দেশ হইতে আসিয়া আমাদের দেখা দেয় নাই। দোকানদার তখন বলিতে লাগিল"বাপুহে ম'লে আর কি হয়! ম'লে পরে মাটীর মানুষ মাটী হইয়া যায়। এ শরীরটা পাঁচ ভূতের সংসার—উহারাই দেহটা ভাগ যোগ করিয়া লয়।" আমি বলিলাম "ভাল, তাহাই হইল। আমার দেহটাই যেন মাটী হইল, আমিও কি তাহার সঙ্গে মাটী হইব! দেহছাড়া কি আমি কিছুই নই।" এবার দোকানদার বড় মর্ম্মভেদী বিকট হাসি হাসিল। তাহার পর কিছু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল"কে বুলিল, দেহ ছাড়া তুমি কিছু? দেখ নাই কি যে, মিষ্টকে গাঁজাইয়া চোঁয়াইয়া মদ্ প্রস্তুত করে। আর সেই মদ তোমাকে কিরূপ মাতাল করিয়া তুলে?" আমি বলিলাম, 'আমি ও রসে বঞ্চিত—তোমার এ উপমাত বুঝিলাম না।' দোকানদার বলিল, তা হউক—আমার কথাটা বুঝিয়া রাখ, পঞ্চভূতের সমবায় বিশেষের ফলেই তোমার চৈতন্ত, ঐ আমিত্বের উৎপত্তি।

আমি বলিলাম "তোমার কথায় বড় অশ্রদ্ধা হইল। তুমি পরকালের প্রমাণ দিতে প্যার না, তাহা বুঝিয়াছি।" কিন্তু পরকাল যে নাই, বৃথা তাহার প্রমাণ দিতে আস কেন? তোমার এ অনধিকার চর্চ্চা কেন বাপু। তুমি আদার বেপারী, জাহাজের খবরে তোমার দরকার কি বাপু! আমি আর তোমার সঙ্গে তর্ক করিতে চাই না।' ওই তর্কইত আমার কাল হইয়াছিল। দেখি একবার 'অনুমান' প্রমাণের দোকনে গিয়া। দেখি সেখানে আমার আশা পুরে কি না।

দোকানদার তখন নরম হইল। এবার আর তাহার সে বিকট উচ্চ রকমের গুরু গম্ভীর হাসির ছটা দেখিলাম না।

বেচারা একটু হতাশ হইল। দেখিল, খদ্দেরটা হাতছাড়া হইয়া যায়। বলিল "তা যাও, এখানে তোমার যে দশা, সেখানেও সেই দশা। অনুমান প্রমাণের গোড়া কি জান! সেও তোমার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তুমি আজ দেখ্‌লে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, কাল তুমি আগুন দেখিয়া অনুমান করিবে যে, ইহাতে হাত দিলেও পুড়িবে। ইহার উপর অনুমানে আর কিছু বেশী আছে কি?"

আমি।—বাপুহে তোমার সহিত তর্ক করিব না ত বলিয়াছি। তবে কেন জ্বালাতন কর। যাউক, তোমায় বলিয়া যাই—ঐ যে একবার আগুনে হাত পোড়ে দেখিয়া, পোড়ানই আগুনের ধর্ম্ম ঠিক করিলে, ওটা কি তোমার প্রত্যক্ষের ফল, না আমার মনের ধর্ম্ম? তুমি একটী প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের প্রদীপ

জ্বালাইয়া দিয়া, কেবল আমার অন্ধকারময় জ্ঞানের গৃহ আলোকিত করিলে—আর কি করিলে বল ত।

তাহার পর অনুমান প্রমাণের দোকানদারের কাছে গেলাম। তাহার নূতন বিলাতী ধরণের দোকান, উপরে চাকচিক্য বড় বেশী। যেন ভীম ময়রার দোকান ছাড়িয়া 'পেলিটীর' বাড়ী আসিলাম। অনুমানের দেশী দোকানে আর গেলাম না। আশৈশব সেই "পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ" শুনে শুনে আমার মাথা ধরিয়া গিয়াছিল। দোকানদারকে পূর্ব্ব মত জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই হে, মরিলে কি হয়, তাহার প্রমাণ বাছিয়া দিতে পার ?"

দোকানদার।—অনেক প্রমাণছিল বটে, তা সে সব পুরাণ হইয়া পচিয়া গিয়াছিল। হেল্‌থ আফিসরের ভয়ে সে সব ফেলে দিতে হইয়াছে। এখন তাহার বড় বেশী প্রমাণ রাখি না। দুই একটা যা আছে, তাহা পছন্দ হয় লইতে পার। এই ধর খ্রীষ্টান দার্শনিকগণ প্রায় সকলেই বুঝাইতেছেন যে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কথাটা ঠিক। জন্মের সহিত আত্মার জন্ম হয়, কিন্তু দেহ নাশে আত্মা মরে না। নিজকৃত সুকৃত বা দুষ্কৃতের পরিমাণ অনুসারে হয় অনন্ত স্বর্গ, না হয় অনন্ত নরক ভোগ করে।

আমি।—তোমার ও অনুমানের মূলে খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন আছে। উহাতে খাঁটী অনুমান প্রমাণ নাই। কোন খাঁটী জিনিষ দিতে পার কি ?

দোকানদার।—এ কালে কি আর কোন খাঁটী জিনিষ আছে! আজ এক শত বৎসর হইল এক কান্ত-বপু জর্ম্মান দার্শনিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, পরকাল সম্বন্ধে * ঈশ্বর সম্বন্ধে, অনুমান প্রমাণের মূলোৎপাটন করিয়া দিয়াছেন। তোমাদের কপিল মুনির কথা আবার উঠিয়াছে—প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না। পরকালের কথাও ঠিক হয় না। মানুষ কি কখন প্রত্যক্ষ বা অনুমান বলে পরকালের ব্যাপার জানিতে পারে ? তাহা হইলে ভাবনা কি ?

আমি বুঝিলাম, আমি "যে তিমিরে আমি সেই তিমিরেই" রহিলাম। তথাপি দোকানদারকে বলিলাম, 'ভাল আর কোন দোকানে কিছু পাওয়া যায় কি ?'' দোকানদার তখন একটু ব্যঙ্গ করিয়া—এক রকম ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল, যাও, ঐ টিকিওয়ালা ঠাকুরের দোকানে যাও। দেখ যদি ওখানে কিছু মিলে ? আমি ভাল মাল ছাড়া কিছু রাখি না। আর কোন প্রমাণ আমরা গ্রাহ্যই করি না।

দোকানদারের বৃথা গর্ব্বে এটুক হাঁসি আসিল। সে স্থান ছাড়িয়া সেই টিকিওয়ালা ঠাকুরের দোকানে গিয়া তাহার পরকালের প্রমাণ দেখিতে চাহিলাম।

ঠাকুর বলিলেন "কেন পরকালে কি হয়—তুমি তা জান না কি! হিন্দুর ছেলে, তুমি কেন এর জন্ম ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। শ্রীভগবানের সেই মহাবাক্য শুন নাই কি ?

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥"

শুন নাই কি?—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

মানুষের জন্মান্তর আছে। সে এক জন্মে যেমন কর্ম্ম করে, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ হয়, সেই কর্ম্মানুযায়ী তাহার দেহ লাভ হয়। মানব জন্ম লাভ করিয়া যে সারা জীবন পশু

* জর্ম্মান পণ্ডিত ক্যান্ট।

প্রকৃতি রহিল—সে জন্মান্তরে পাশব যোনি লাভ করিবে। পুণ্য কর্ম্মে উৎকৃষ্ট যোনি লাভ হয়। আর কর্ম্মক্ষয়ে মুক্তি হয়। এসব কথা জান না কি ?

আমি বলিলাম, ঠাকুর আমার দুর্দ্দশার কথা আর বলিব কি! আমি বিশ্বাস হারাইয়াছি। তাই দর্শনের বাজারে আসিয়া পর জন্মের প্রমাণ সন্ধান করিতেছি। যদি ভগবদ্‌বাক্যে আমার শ্রদ্ধা থাকিত—তাহা হইলে কি আর আমার কি এদুর্দ্দশা হইত ? হায়! যাহা গিয়াছে, তাহা বুঝি আর ফিরাইয়া পাইব না। এখন তাহার পরিবর্ত্তে যে কিছু একটা পাইলে বাঁচি। আর যে সন্দেহের আঁধারে ঘুরিতে পারি না ঠাকুর!

তখন দোকানদার ঠাকুর বলিলেন, "পাগল, বিশ্বাস ছাড়া কি আর কিছু প্রমাণ আছে! দেখ প্রমাণের প্রধান প্রমাণ আপ্ত প্রমাণ। যে আপ্ত প্রমাণ মানিল না—যে ঋষিবাক্যে, ভগবদ্‌বাক্যে, শ্রুতিবাক্যে বিশ্বাস করিল না—তাহার ঈশ্বর নাই, পরকাল নাই, তাহার ইহকালও নাই। এই আপ্ত প্রমাণই দর্শনের মূলভিত্তি, এই আপ্ত-প্রমাণ চাবি দিয়াই প্রকৃত দার্শনিক অনন্ত অজ্ঞের রাজ্যের দার উদ্‌ঘাটন করেন। দার্শনিক যে জ্ঞান প্রমাণের উপর নির্ভর করেন, জ্ঞানার্থীর কাছে সেই জ্ঞানই আপ্ত প্রমাণ।

আমি।—ঠাকুর যদি বিশ্বাসই দর্শনের মূলভিত্তি হইল, তবে পৃথক্ দর্শনশাস্ত্রের আর প্রয়োজন কি ? ধর্ম্ম শাস্ত্রের বাহিরে যাইবার আবশ্যক কি ?

ঠাকুর।—প্রকৃত দর্শন কি কখন ধর্ম্ম ভিত্তি ছাড়া দাঁড়াইতে পারে ?

আমি।—আমি ত তাহাকে প্রকৃত দর্শন বলিতে পারি না। প্রত্যক্ষ অনুমান প্রমাণের মসাল জালিয়া, মানুষবুদ্ধি স্বাধীন ভাবে নিজে আবিষ্কার করিয়া যে পথে অগ্রসর হয়, সেই ত প্রকৃত দর্শনের পথ।

ঠাকুর।—সে পথে অজ্ঞেয় অনন্তের রাজ্যে যাওয়া যায় না। সে পথে কেবল কচ্‌কচি, কেবল বাদ বিতণ্ডা। কেবল মতের সংঘর্ষণ। কেবল সন্দেহ, অবিশ্বাস, আর নাস্তিকতা। সে অন্ধকার পথে অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায় সকলই প্রমাদপূর্ণ। প্রকৃত দর্শন ধর্ম্মকে সহায় করে আশ্রয় করে, ধর্ম্মকে ধর্ম্মকে অতিক্রম করে না।

আমি।—ঠাকুর এ তোমার উনবিংশ শতাব্দীর মত কথা হইল না। এ যুক্তি তর্কের রাজ্যে, এই প্রত্যক্ষের বাজারে আপ্ত প্রমাণের স্থান কোথায় ? এ বিজ্ঞানের যুগে কি বিশ্বাসের স্থান আছে ? সকল কথাই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-কষ্টিতে কষিয়া লইতে হইবে।

ঠাকুর।—বাপুহে বিজ্ঞানও মূল কথা গুলি বিশ্বাস করিয়া লয়—তাহার প্রমাণ দিতে পারে না। যাহা জ্ঞেয় রাজ্যের ব্যাপার, যাহা প্রত্যক্ষগম্য, তাহার প্রমাণ দেওয়া চলে। আর প্রমাণের দ্বারা সত্য আবিষ্কার হয় না। তোমাদের বৈজ্ঞানিকের অন্তরেও সত্যগুলি আপনি ফুটিয়া উঠে। পরে বৈজ্ঞানিক তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, সেই সত্যের ভিত্তি দৃঢ় করেন। যাহার হৃদয়ে যতটুকু জ্ঞান বিকাশিত হয়—সে ততটুকু সত্য লাভ করে। ঐ ক্ষুদ্র আতা ফলটী মাটীতে পড়িল দেখিয়া—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহা আকর্ষণ শক্তিতত্ত্ব যে মহাপুরুষের জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়াছিল—হঠাৎ যেন জ্ঞানের অন্ধকার গৃহে সূর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—উহা, কি তোমার বাহ্য প্রমাণের ফল!

আমি।—ঠাকুর, তুমি যাহা বলিলে, তাহা

কতকটা বুঝিলাম। কিন্তু উহা ত বিশ্বাসের কথা নহে।

ঠাকুর।—স্থির হইয়া কথাটা শুনিলে ভাল হয় না! আমি বলিতেছিলাম যে, সংসারে সেরূপ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের সংখ্যা বড় অল্প—যাঁহাদের নির্ম্মল অন্তরে জ্ঞান-সূর্য্য এইরূপে আপনিই উদয় হয়। এই যে তুমি পরকাল তত্ত্ব জানিবার জন্য লালাইত হইয়া বেড়াইতেছ, কই তুমি ত তাহার তত্ত্ব নিজে পাইলে না! সুতরাং নিজ জ্ঞানের উপর তোমার নির্ভর করিলে চলে কৈ ? পরকালের তত্ত্ব বুঝিবার জন্য তোমাকে দর্শন শাস্ত্র,ধর্ম্ম শাস্ত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে হইতেছে। সেই দর্শন বা ধর্ম্ম শাস্ত্রে, ঋষি বা মহাপুরুষগণ—নির্ম্মল হৃদয়ে অনন্ত জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, তত্ত্ব দর্শন করিয়া যে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন—সেখানে তোমার যাইবার অধিকার নাই। কাজেই তোমার তাহাতে বিশ্বাস ব্যতীত আর গতি নাই। তাই বলিতেছিলাম, আপ্ত প্রমাণ অবলম্বন কর—বিশ্বাস কর,শ্রদ্ধা কর, নহিলে আর উপায় নাই। তাই বলিতেছি যে,মহাজন-প্রদর্শিত পথে চলিয়া যাও। তাঁহাদের প্রদর্শিত আলোক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। দেখিতেছ না বড় দুর্দ্দিন আসিয়াছে। আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। বিদ্যুৎ আর চমকে না। অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। এ দারুণ সময়ে তুমি একা। এই অপার দুর্গম প্রান্তরে পড়িয়া তুমি দিশাহারা হইয়াছ। ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। কিন্তু পথ পাইতেছ না। তোমার শরীর মন অবসন্ন হইয়াছে। তখন দেখিলে সহসা দূরে আলোক ফুটিয়া উঠিল। তুমি সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিয়া যাও,আশ্রয় পাইবে। এই অন্ধকারময় মায়াচ্ছন্ন অজ্ঞানের প্রান্তরেও কেবল বিশ্বাসের আলোক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। পথ পাইবে—দুর্দ্দিন ঘুচিবে—আশ্রয় পাইবে। কেন বৃথা দিশাহারা হইয়া অন্ধকারে ঘুরিতেছ!

আমি।—ঠাকুর, বড় মুরুব্বিয়ানা করিতেছ। তর্ক উঠাইলে ত আমিও পেছপা নহি। আমিও কিছু কিছু ও বিদ্যা জানি। কিন্তু জানিয়াছি, যে তর্ক নিরর্থক। তর্কে অজ্ঞেয় রাজ্যের কথা পাওয়া যায় না, তাই তর্ক ছাড়িয়া দিয়াছি। তবু যদি তর্ক উঠাইলে, তবে বলি। বিশ্বাস ত জ্ঞানের মূল নহে। উহা কর্ম্মের মূল হইতে পারে। ধর্ম্মের মূল হইতে পারে। কিন্তু উহা ত জ্ঞানের মূল নহে। সন্দেহই দর্শন রাজ্যে প্রবেশ করিবার সিংহদ্বার। যে সন্দেহ করিল না—কেবল বিশ্বাসই সম্বল করিল, সে ধার্ম্মিক হইতে পারে। কিন্তু সে অন্ধ—জ্ঞানকাণা।

ঠাকুর।—কি ভ্রম! এটা ঠিক মনে রেখ যে, জ্ঞান বিশ্বাস-ভিত্তির উপর স্থাপিত। বিশ্বাস আগে, শেষে জ্ঞান। বিশ্বাসবীজ ভাল পাট করা অন্তর-জমীতে অঙ্কুরিত হইলে প্রমাণ-বারিতে তাহা বাড়িতে থাকে। তাহা হইতেই পরিণামে জ্ঞান ফল লাভ হয়। সন্দেহকে যে দর্শনের ভিত্তি বলে,সে ভ্রান্ত। সন্দেহের পরিণাম সন্দেহ। তাহার পরিণাম জড়বাদ—অজ্ঞেয়তাবাদ। যদি বিশ্বাস আসিয়া উদ্ধার না করে—তবে সন্দেহের পরিণাম বড় বিষময়।

আমি।—ঠাকুর তাহাও যেন কিছু কিছু স্বীকার করিলাম। কিন্তু কোন্‌টা বিশ্বাস করিব বলত ? নানা লোকে যে নানা কথা কয়। তা ছাড়া দেখিতে পাই, সকলে আপন প্রবৃত্তির অনুরূপ বিশ্বাস করে। যে পাপিষ্ঠ

জীবন ভরিয়া কেবল পাপ কর্ম্মই করিয়াছে, সে বিশ্বাস করে পরকাল নাই—কর্ম্মফল নাই। কোন তর্ক যুক্তিতে তাহার সে বিশ্বাস নড়াইতে পার কি? যে সুখের কাঙ্গাল—এ সংসারে কেবল দুঃখের বোঝা বহিয়াই সারা হইল, সে যে পরকালে—স্বর্গে তাহার সুখের ঘরকন্না কল্পনা করে, তাহার বিশ্বাস কি কেহ তর্ক যুক্তিতে ভাঙ্গিতে পারে? আর যদি ভাঙ্গে, তবে সে আমার মত ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া মরে।

ঠাকুর।—কথা ঠিক বটে। সকলে আপন প্রবৃত্তি মত বিশ্বাস করে। কিন্তু আমি তোমার সে অন্ধ বিশ্বাসের কথা বলিতেছি না। যে বিশ্বাসের কথা বলিতেছি, ইহা জ্ঞানমূলক, শ্রদ্ধামূলক। তবে অন্ধ-বিশ্বাসও পরিত্যজ্য নহে। যে জ্ঞান পথে যাইতে পারিবে না—যাহার সে শক্তি নাই, সে যদি সুপ্রবৃত্তি যুক্ত হয়—সৎপথে যদি তাহার মতি থাকে—তবে সে তাহার সেই প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিশ্বাসের ডোর ধরিয়া অগ্রসর হউক। তাহাকে বাধা দিও না। তাহার স্বধর্ম্ম পালনের পথ রোধ করিয়া দিও না। আর তুমি জ্ঞানার্থী—তুমি দেখিতেছ ত যে তোমার অন্তরে এখনও জ্ঞান-সূর্য্য আপনিই প্রকাশিত হইতেছে না। তোমার অন্তর এখনও নির্ম্মল নহে। কাজেই যে আপ্ত ঋষি তত্ত্বদর্শী—যিনি নিজে সত্য দেখিয়াছেন, বলিয়াছি ত তাঁহাকেই বিশ্বাস কর। ভগবদ্‌বাক্য বিশ্বাস কর। প্রথমে তাহাতে শ্রদ্ধা করিতে শিখ। তাহার পর বিশ্বাস আসিবে। সেই বিশ্বাস-অগ্নি জ্বলিলে তোমার অন্তরের মলা ক্রমে দূর হইতে থাকিবে। তখন আপনিই সেই সত্যের আলোক দেখিতে পাইবে। তখন বুঝিতে পারিবে যে, যে তত্ত্ব আমাদের ক্ষুদ্র মলিন, সসীম মায়াবদ্ধ জ্ঞানে অজ্ঞেয়, তাহা মায়ামুক্ত অসীম জ্ঞানের কাছে পূর্ণ প্রকাশিত। যদি মায়ামুক্ত হইয়া অজ্ঞান দূর করিয়া সেই অনন্ত জ্ঞান রাজ্যে যাইতে পার, তবে আর কিছুই অজ্ঞেয় থাকিবে না।

আমি।—ঠাকুর, যাহা অজ্ঞেয় বলিয়া তর্ক যুক্তিতে আমার ধারণা হইয়াছে—তাহা যে কেহ সত্য সত্য জানিয়াছে, তাহা আমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? ভগবান যে অনুগ্রহ করিয়া সে রাজ্যের কথা নিজে আমাদের বলিয়া দিয়াছেন, তাহাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? ঋষিগণ যে যোগ-বলে, বা সাধনা বলে সে রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, সেখানকার সমাচার অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বলিয়া দিয়াছেন, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? এ বিশ্বাস না থাকিলে শ্রদ্ধা আসিবে কোথা হইতে?

ঠাকুর।—সন্দেহের রাজ্য হইতে—অবিশ্বাসের রাজ্য হইতে, বিশ্বাসের রাজ্যে ফিরিয়া আসিবার পথ আছে। সে পথ না থাকিলে মানুষের আর উপায় ছিল না। এক্ষণকার বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতগণও এইরূপ সন্দেহের রাজ্য হইতে বিশ্বাসের রাজ্যে ফিরিয়াছেন—তাহা বলিয়াছি। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, বিশ্বাস ছাড়া গতি নাই।* আমি গোঁড়ামী করিতেছি না। তুমি নিজে কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিও। কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর দোহাই দিও না। যাহা ঊনবিংশ শতাব্দী বুঝে নাই, তাহা বিংশ কি একবিংশ শতাব্দী বুঝিবে, এমন আশা আছে। যাহা সত্যের আলোক, তাহা চিরকাল আঁধার

* এস্থলে প্রধানতঃ জর্ম্মান দার্শনিক ফিক্‌টে সেলিং প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

চাপা থাকে না। এ কথা ঠিক জানিও, বিশ্বাস ছাড়া পথ নাই।

আমি।—ঠাকুর অবিশ্বাসের রাজ্য হইতে বিশ্বাসের রাজ্যে যাইতে পারিলে পথ পাব, তাহা না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু অবিশ্বাসের রাজ্য হইতে বিশ্বাসের রাজ্যে যাইব কিরূপে ?

ঠাকুর।—অবিশ্বাসের রাজ্য হইতে বাছা বাছা প্রমাণ লইয়া আইস। তোমার প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পার, সব লইয়া আইস। সেই প্রমাণ-কষ্টিতে ভাল করিয়া কষিয়া দেখ—যে আপ্ত বচন যে ভগবদ্‌বাক্য তোমায় বিশ্বাস করিতে বলিতেছি—তাহাই বিশ্বাস-যোগ্য কি না। দেখিয়া লও—তাহা অপেক্ষা বিশ্বাস-যোগ্য সম্ভবপর আর কিছু থাকিতে পারে কি না। দেখিয়া লও—সে গুলি মূল সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, আর সকল জিজ্ঞাসার, সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাও কি না ? যদি পাও, তবে সে মহাবাক্য বিশ্বাস করিতে তোমার আপত্তি কি বল দেখি ? এই যে হিন্দুর আকাশতত্ত্ব, পরমাণুতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, বিবর্ত্তনতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ধরিয়া লইয়া, তাহা দ্বারা বিজ্ঞানের অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেছে, সেই মহাতত্ত্ব যাঁহারা প্রথমে লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিবে না কেন ? তুমি যে এই পরকালতত্ত্ব জানিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ,—একবার হিন্দুর জন্মান্তরবাদটা ধরিয়া লইয়া দেখ দেখি—তোমার সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় কি না ? দেখ দেখি প্রমাণের কষ্টি-পাথরে তাহা খাঁটী সোণা বলিয়া ঠিক হয় কি না ?

আমি।—ঠাকুর এখন পথে এস। তুমি যে প্রমাণের কথা বলিতেছিলে, সে গুলি একবার বাছিয়া বাহির কর দেখি। সে গুলা একবার নিজে বুঝিয়া লই। দেখি সে একবার গুলা একবার খাঁটী কষ্টি-পাথর কি না ? কেবল আপ্ত প্রমাণের দোহাই দিও না, দোহাই তোমার।

ঠাকুর।—আমি কেবল আপ্ত প্রমাণের দোহাই দিই নাই। কথাটা আরও একবার বলিতেছি, বুঝ। ঋষিবাক্যে, ভগবদ্‌বাক্যে তোমার বিশ্বাস নাই। ভাল তাই হোক, তাহাতে একেবারে অবিশ্বাস করিও না। সেই বাক্য সম্মুখে রাখিয়া, তাহার অনুকূল প্রতিকূল যুক্তিগুলি সংগ্রহ কর। বাহ্য ও আন্তর জগৎ হইতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ লইয়া দেখ—ঐ আপ্ত বাক্যে যে তত্ত্ব পাইয়াছ, তাহা ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব সম্ভব কি না। যদি না হয়, তবে সেই আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস করিতে তোমার আপত্তি থাকিবে কি ?

আমি।—ঠাকুর আর তর্ক যুক্তিতে কাজ নাই। আমি যে বিশ্বাস হারাইয়াছি, তাহা যদি তোমার দুটা কথায় মিলাইতে পারিতাম, তবে আর ভাবনা ছিল না। এখন তোমার কাছে যদি পরকাল সম্বন্ধে কোন প্রমাণ থাকে, তবে তাহা বাহির কর। আমি দেখিয়া চলিয়া যাই।

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, তা প্রমাণ আছে বৈ কি। যদি তর্ক যুক্তিতে কেহ পরকালের তত্ত্ব পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া থাকেন, তবে সে হিন্দু ঋষিগণ। হিন্দুর জন্মান্তরবাদ বড় পাকা ভিত্তির উপর স্থাপিত। হিন্দুর কর্ম্মতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সম্মত। জন্মান্তর না মানিলে কৃতনাশ, অকৃতঅভ্যাগম প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে। আরও দেখ—

আমি।—অত কথায় কাজ কি ! আমি

তোমার বিদ্যা বুঝিয়াছি। যাহা অজ্ঞেয়,তাহা তোমাদের ঋষির কাছে জ্ঞেয় হইল! মানুষ অমানুষ হইল। আর ভগবান মানুষ হইলেন! সে কথা ছাড়িয়া এখন কাজের কথা কও।

ঠাকুর।—তোমার রোগ বড় কঠিন দেখিতেছি। তোমায় এখনও বলিতেছি—অবিশ্বাস প্রবৃত্তি সংযত করিতে শিখ। নহিলে তোমার উপায় নাই। হিন্দুদর্শনের, হিন্দু ধর্ম্মের পরকাল সম্বন্ধে প্রমাণের কথা বলিতেছ। সে মহা সমুদ্রে ডুব দিয়া তোমায় রত্ন উদ্ধার করিয়া দিই—আমার সে সামর্থ্য নাই। তোমার প্রবৃত্তি হয়,নিজে সে রত্ন উদ্ধার করিও। যত্ন নহিলে রত্ন মিলে না। তবে তোমায় পথ দেখাইয়া দিতেছি। এই "জন্মান্তর-রহস্য পুস্তক * পাঠ করিয়া দেখিও।

কথা বার্ত্তা শুনিয়া সেই টিকিওয়ালা ঠাকুরের উপর আমার কিঞ্চিৎ ভক্তি হইয়াছিল। আমি প্রণাম করিয়া সে পুস্তকখানি চলিয়া গেলাম। দর্শনের বাজারে আর বৃথা ঘুরিয়া বেড়ান নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম।

সেই দিন হইতে বুঝিয়াছি যে, বিশ্বাস ভিন্ন গতি নাই। ধর্ম্মে বিশ্বাস চাই। দর্শনেও বিশ্বাস প্রমাণ,শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অপ্রত্যক্ষ, অজ্ঞেয় রাজ্যের কথা বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুতেই আমার পাইবার উপায় নাই। যাহার যেমন বিশ্বাস,সে তেমনি বুঝে বটে। কিন্তু বিশ্বাসীর তাহাতে বড় ক্ষতি নাই। তাহার লক্ষ্য, তাহার গতি স্থির থাকে। সে ত আমার মত দিশাহারা হইয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ঐ ধূমকেতুর ন্যায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় না। তাহার ত একটা বন্ধন থাকে। তাহার ত কর্ম্মপথ উন্মুক্ত, প্রশস্ত থাকে। সেই যথেষ্ট।

কিন্তু হায়, আমার সেই হারাণ বিশ্বাস কোথায় পাইব! কোন্ চোর আমার সে সর্ব্বস্বধন হরিয়া নিয়াছে রে! * * আমি এইরূপ ভাবনায় বিভোর হইয়া আছি, এমন সময় শুনিলাম, ভিখারী আমার দ্বারস্থ হইয়া গাহিতেছে,—

"বলদেখি ভাই কি হয় মলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত পেরেত হবি,কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি'
কেউ বলে সাযুজ্য পাবি, কেউ বলে সালোক্য মিলে॥
বেদের আভাষ তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে,
* * *
যেমন জলবিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সেই মিশায় জলে॥'

হায় হায় সর্ব্বত্রই কি এই জিজ্ঞাসা "বলদেখি ভাই কি হয় মলে? সর্ব্বত্রই কি নানা মুনির নানা মত" পাইয়া, হতাশ হইয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ভক্ত রামপ্রসাদ বুঝিয়াছিলেন, "যা ছিলি তুই তাই হবি রে মরণ কালে।" কিন্তু আমি সেরূপ একটা বুঝিলাম কই! যা ছিলাম,তাই যদি জানিতাম, তাহা হইলে ত যাহা হয়, তা বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু আমি ছিলাম কি? আরো যেন বুঝিলাম যে, যাহা ছিলাম, তাই আছি,আর তাই হইব। কিন্তু এই যে আমি— এ কি? যে দিন এ কথার উত্তর পাইব, সে দিন সব গোল চুকিয়া যাইবে,তা জানি। কেন না বুঝিয়াছি, এই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান

---

* "জন্মান্তর রহস্য" শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত কর্তৃক অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৶৹ আনা"—এস্থলে এই পুস্তকের উল্লেখ হইয়াছে। পুস্তকখানি আমি নিজে পড়িয়াছি। বড় সুন্দর হইয়াছে। তর্ক যুক্তিতে অতি সংক্ষেপে সরল অথচ ওজস্বিনী ভাষায় ইহাতে হিন্দুর জন্মান্তর-রহস্য বুঝান হইয়াছে। এখনকার অনেক বিলাতী পণ্ডিতও যে এ জন্মান্তর বিশ্বাস করেন, তাহা এই পুস্তক হইতে জানা যায়। প্রত্যেক তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সাহিত্যানুরাগীর এ পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। এরূপ গ্রন্থ আমাদের দেশে যতই প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল। আমাদের চিন্তাস্রোত যতটুকু সুপথে প্রবাহিত হয়, ততটুকুই লাভ।

লাভ হয়। কিন্তু আমি কি? কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই। তাহাত জানি না। কোথা যাই, তাহাত বুঝি না। তাহার কূল কিনারা পাই না।

এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে এক দিন অন্য মনে এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়াছিলাম। সে ভীষণ অথচ আর্ত্তের জুড়াইবার স্থানের কথা আর বলিয়া কাজ নাই। এমন সময় পশ্চাতে সরল হাসির ধ্বনি শুনিলাম। ফিরিয়া দেখি—ধর্ম্মের মহাবাজারের সেই সন্ন্যাসীঠাকুর সেখানে উপস্থিত। ঠাকুর আমায় চিনিয়াছিলেন, বলিলেন, আবার এ শ্মশানে কেন! আমি ব'লাম 'ঠাকুর বহুদিন ধরিয়া লোকালয়ে হারাণ ধনের সন্ধান করিয়া পাই নাই, এ দেখিতেছি, যদি এই নির্জ্জন স্থানে সে মিলে।' ঠাকুর বলিলেন,—

"উত্তম পরামর্শ করিয়াছ, তোমার ভাল হইবে। আমি আজ তোমার ঔষধ বলিয়া দিতেছি। আগে মনটাকে খাঁটী কর। তোমরা যেমন ব্যায়াম করিয়া শরীরকে নীরোগ ও সরল কর, সেইরূপ তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও নির্ম্মল করিবার জন্য প্রথমে চেষ্টা কর। সেটা যে কর্ত্তব্য, তাহা আর ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হয় না। কিরূপে সে অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিতে হয়, তাহা গুরুর নিকট উপদেশ নিও। আশা করি, তাহার জন্য প্রথম তোমার যতটুকু শ্রদ্ধা আবশ্যক, তাহা নষ্ট হয় নাই।"

"যখন আরশিতে মলা থাকে, তখন তাতে মুখ দেখা যায় না। আরশি পরিষ্কার হইলে, তবে ত মুখ দেখিবে। তুমি এই সংসার-গুহার মধ্যে রহিয়াছ। তোমার চারিদিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন রহিয়াছে। তোমার মুখত ঐ গুহার ভিতর দিকে ফিরান রহিয়াছে। তোমার কি [illegible] মুখ ফিরাইতে সাধ্য আছে! তুমি কি গুহার বাহিরে কি আছে দেখিতে পাও? কেবল তাহার আব্ছায়া গুহার মধ্যে পড়ে। তাই তাহার [illegible] একটু ছায়া ছায়া ধোঁয়া ধোঁয়া রকমের জ্ঞান পাও। যদি সম্মুখে একখানা দর্পণ রাখিতে পার, তবে পশ্চাতের যাহা আছে, তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে।"

"তোমার চিত্তই ঐ দর্পণ। ওখানা ভাল করিয়া সাফ কর, তাহা হইলে অনন্ত জ্ঞান-সূর্য্য তাহাতে প্রতিফলিত হইবে। তখন বুঝিবে তুমি কে? তখন বুঝিবে, মরিলে কি হয়। এখন তাহার জন্য সাধনা করিও না। যতই চিত্ত নির্ম্মল করিবার জন্য বাসনা করিবে, ততই বিশ্বাস আপনি ফুটিতে থাকিবে, ততই তোমার চিত্তদর্পণ পরিষ্কার হইবে।" তুমি সেই ভগবদ্বাক্য মনে রাখিও—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্ তস্মিন্ জাগর্ত্তি সংযমী।"

যাহা তোমার মলিন চিত্তে অন্ধকার ঢাকা, তাহা সংযমীর নিকট দিনের ন্যায় প্রকাশিত। আগে চিত্ত সংযম করিতে শিখ, তাহাতে চিত্ত নির্ম্মল হইবে, তবে ত তোমার বিশ্বাস আসিবে, সত্য দেখিতে পাইবে, কথাটা মনে রাখিও।

"তুমি গোড়া ধরিতে পার নাই, শেষ ধরিতে যাইতেছ কেন? অঙ্ক শাস্ত্রের যোগ শিখ নাই, গ্রহণ গণিতে যাও কেন। এখনও ভাল করিয়া জলে নামিতে পার না, সাঁতার কাটিতে যাও কেন? 'ক খ' শিখ নাই, কাব্যদর্শন পড়িবার চেষ্টা কর কেন?"

আমি বলিলাম, ঠাকুর সব ত বুঝিলাম, কিন্তু আসল কথাটা ত এখনও বুঝিলাম না। আমি চিত্ত নির্ম্মল করিব কি দিয়া? আমার যে বিশ্বাস নাই। সে দিন আপনি যে মহামায়ার সাধনার কথা বলিয়াছিলেন—তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় কৈ? বিশ্বাস হয় কৈ?

সন্ন্যাসী।—তোমার সে প্রবৃত্তি হয় নাই, তাহা বুঝিয়াছি। তাই আজ আর সে কথা বলি নাই। চিত্তশুদ্ধির আরও উপায় আছে। নিষ্কাম কর্ম্ম কর, কর্ত্তব্য পালন কর, পরহিতার্থ জীবন উৎসর্গ কর, জগতের কর্ম্মচক্রে আপনাকে বাঁধিয়া দাও। জগতের কর্ম্মরূপ সেই জগন্নাথের মহারথের ডোর ধরিয়া অগ্রসর হও। ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া আসিবে।

আমি বলিলাম, ঠাকুর কর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি ক্ষীণ বাঙ্গালী। শুইতে পাইলে বসি না, বসিতে পাইলে দাঁড়াই না, আবার হিত করিতে গিয়া বিপরীত করিয়া বসি। এমন নিষ্কর্ম্মা লোকের কর্ম্ম-পথ নাই। আমার বিশ্বাসের পথ নাই। আর কি অন্য পথ নাই।

সন্ন্যাসী।—আছে! সে তোমার জন্য নহে। সে বড় কঠোর পথ। সে যোগের পথ। সে ত তুমি বুঝিবে না।

আমি বলিলাম, 'ঠাকুর আমি বুঝিতেও চাই না। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমি যোগ বিশ্বাস করিতে পারিব না। আমি বুঝিয়াছি, আমার উপায় নাই। তুমি যাও। আমার যখন ভক্তি-পথ নাই—কর্ম্মপথ বন্ধ—জ্ঞান-পথ রুদ্ধ, তখন আমার গতি নাই, বুঝিয়াছি। বুঝিলাম, আমার এ জন্মটা বৃথা গেল। আমার বৃথা আশা—বৃথা চেষ্টা। আমি সংসারে ডুব দিব, প্রবৃত্তির দাস হইব, ধর্ম্মকে দূর করিব। দেখি সে পথে একটু সুখ পাই কি না। যে কটা দিন বেঁচে থাকিব, কেবল সুখ খুঁজিব। প্রবৃত্তিকে আর সংযত করিতে চেষ্টা করিব না।

সন্ন্যাসী।—তুমি পাগল। ধর্ম্ম বিনা কি সুখ আছে! তুমি হতাশ হইও না। তুমি এখনও ভক্তি পথে যাইতে পারিবে। আমি আশা দিতেছি, চেষ্টা করিও। সদা সেই ভগবদ্বাক্য মনে রাখিও ;—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

তোমার উপস্থিত রোগের এই মহৌষধ। প্রতিদিন এই মহাবাক্য স্মরণ করিও। যত বেশী বার স্মরণ করিতে পার, ততই মঙ্গল। ততই আশু ফল ফলিবে।

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

তাহার পর আমি কতক্ষণ শূন্য মনে সেই নির্জ্জন স্থানে বসিয়াছিলাম বলিতে পারি না। শৃগালের কোলাহল শুনিয়া চমক হইল। চাহিয়া দেখিলাম, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। অগত্যা গৃহে ফিরিলাম।

সেই হইতে অনেক দিন গিয়াছে। কিন্তু হায়! আমি কি করিয়াছি! আমি ত সেই দোকানদার ঠাকুর বা সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের উপদেশ শুনি নাই। তাঁহাদের বাক্যে আমার শ্রদ্ধা হইল কৈ? আমি এখন বুঝিয়াছি যে, এ [illegible]নে আর কিছু হইবে না। যদি জন্মান্তর [illegible]ক, তবে পরে যদি কিছু হয়, দেখা যাইবে। [illegible]ান্নতি নিয়মে, প্রকৃতির নিত্য আপূরণ [illegible]তেছে, বুঝিয়াছি। যদি মৃত্যুতে আমার জীবত্বের লোপ না হয়—তবে প্রকৃতিই ক্রমে তাহার আপূরণ করিয়া লইবেন। একজন্মে না হয়, দশ জন্মে আমার শক্তি হইবে। আবার বিশ্বাসকে পাইব, আবার সাধনা করিতে পারিব। এখন বৃথা হাঁকু মাকু করিয়া কি হইবে? আমি বুঝিয়াছি, এখনও আমি প্রকৃতির অধীন। আমার কোন পুরুষকার নাই, স্বাধীনতা নাই। এখনও আমার প্রকৃতির অধিকারের বাহিরে আসিবার জন্য চেষ্টা করিবার সামর্থ্য হয় নাই। আমার এখনও সাধনার সময় আসে নাই। যদি জন্মান্তর থাকে, তবে কখন না কখন তাহা আসিতে পারে। কিন্তু জন্মান্তর যে আছে, তাহা বুঝিলাম কই?

[illegible]দবধি জ্ঞানের পথ বল, কর্ম্ম পথ বল, ভক্তি পথ বল—সকলই বন্ধ হইয়াছে। এখন সংসার সমুদ্রে গা ঢালিয়া দিয়াছি। দেখি, কোথায় যাই। বাত্যাবিতাড়িত তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত সংসার-সিন্ধুর উপর ভাসিয়া ভাসিয়া যাই-

তেছি, দেখি না কোথায় যাই। ডুবেছি, না ডুবতে আছি--দেখিব একবার পাতাল কতদূর। সেই হইতে বুঝিয়াছি,আর জ্ঞানের অভিমান করিব না—মূল অজ্ঞেয় তত্ত্ব জানিবার জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিব না—আর কখন মনে আনিব না "বল্ দেখি তাই কি হয় মলে?"

কিন্তু তা পারিলাম কই? সময় নাই,অসময় নাই কথাটা দুপ্ করিয়া অজ্ঞাতসারে কোথা হইতে আসিয়া মনের উপর আঘাত করে। বুকের কলিজা গুলাকে পিষিয়া দিয়া যায়। তাই আজ আমার এ দারুণ দুঃখের কথা তোমাদের কাছে খুলিয়া বলিলাম। তোমরা কি কেও বল্‌তে পার—"মলে কি হয়?"

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

মদনমোহন।

(কুচবিহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দর্শনে।)

শান্তিময় ভাবময় মন্দির-মাঝারে
বিরাজিত মূর্ত্তিমান্ মদন-মোহন!
রজত-রচিত-ছত্র শোভে শিরোপরে
পদতলে বিস্তারিত সুচারু আসন।
মনোমদ কমকাবি ভুষন-রঞ্জন
কনক-মুরলীধর হৈম-গঠন!

সুবর্ণের চারুচূড়া রতন-জড়িত
বিভাসিয়া চারিদিক কেমন উজলে!
পূত পীত পরিধেয় কিবা সুশোভিত,
হেরিলে ধড়ার শোভা মন যায় গ'লে।
এ মহা-মহিম-মূর্ত্তি রাজ-রাজেশ্বর
যে দেখেছে সেই জানে কেমন সুন্দর!

অনুপম বাল-কান্তি জলদ-বরণ
ভাবের অনন্ত জ্যোতিঃ স্ফুরিত বদনে!
বৃদ্ধ-শিশু-রমণীর মানস-মোহন
ধন্য দেব, একা তুমি জগতের মনে!
অই যে দক্ষিণ পদ রে'খেছ হেলা'য়ে
হেরিলে অসংখ্য চিত্ত যাইবে গলিয়ে।

ভক্ত-চূড়ামণি তব যে শিল্পী-প্রবর
রচিয়াছে তনু-কান্তি হেন ভাব-ময়,
পাইলে বারেক তাঁরে প্রসারিয়ে কর
জুড়াতেম আলিঙ্গনে তাপিত-হৃদয়।
উজ্জ্বল উরসে জ্বলে হীরকের হার!
সুবিমল নীলাকাশে নক্ষত্র কি ছার!

মধুর অধর শোভা!—বংশী-রন্ধ্র-পানে
অগ্রসরে সমাকুল হেন মনে লয়!
আবার কি মধুময় সঙ্গীতের তানে
মাতাবে জগতী-জনে ওহে দয়াময়!
কিবা ভাব দর্শনের সরল বঙ্কিম!
পাদ-পদ্ম পাণি-তল অলক্ত-রঙ্গিম!

যাঁর প্রতিমূর্ত্তি হেন মানস-রঞ্জন
যমুনা-পুলিন-চারী সে মোহন চাঁদ
ত্রিভুবনে অনুপম—না জানি কেমন!
ধন্য সে গাণ্ডীবধর,—যাঁর ভুজবাঁধ
পরম যতন করি পরিতেন হরি
কৌস্তভ-শোভিত চারু হার পরিহরি!

ধন্যরে দ্বাপরবাসী যাদব পৌরব!
যদুবংশ-সরোবর-সম্ভূত-কমল,
বিতরিয়া চারিদিক সৌরভ-বিভব
পূরাইলা তোমাদের কামনা সকল!
ধন্য তুমি রে যমুনে, দিনেশ-নন্দিনি,
পবিত্রিলা তব অঙ্গ শ্যাম গুণ-মণি!

ভূতলে বৈকুণ্ঠধাম তুমি বৃন্দাবন,
পালিত তোমার অঙ্কে নিখিল-পালক।
রাখালের বেশে সাজি রমা-বিনোদন
করিলা কতই কেলি নবীন নায়ক!
তব অঙ্গে কত কুঞ্জ নিকুঞ্জ কানন
এখনো বিরাজে, যাহে কলুষ নাশন!

হে ময়ূর, কটুস্বরে কি খেদ তোমার?
যাঁর পদাম্বুজ-রজঃ অমর-লোভন
তব পরিহৃত-পুচ্ছে শিরোশোভা তাঁর
কতই আদরে তিনি করেন ধারণ!

তাইকি গগনে হেরি নব নীর-ধর
শ্যাম ভ্রমে হর্ষে পুচ্ছ বিস্তারিত কর !—

শব্দের অমৃত-নদ অয়ি বেণুবর,
কত জন্ম করেছিলে তীব্র আরাধনা,
মাধবের ফুল-দল-কোমল-দ্বিকর
অধর সহিত তাই তোমাতে যোজনা !
অচ্যুত-চুম্বন-সুধা করি তুমি পান
সুধাময় হ'য়ে সদা কর সুধাগান।

গাইলে তোমার স্বরে বন-ফুলমালী
উদ্ভ্রান্ত হইত ধরা শ্রবণ আশায়,
শিখাইলে কোকিলেরে ললিত কাকলী,
ঝঙ্কারে ভ্রমর—বুঝি শিখিবারে চায়।
কল্লোলিনী কলস্বন না পারি শিখিতে
বিদারে বিশাল বক্ষ তরঙ্গ-আঘাতে !

শ্যামাঙ্গের অঙ্গরাগ সৌরভ হরিয়া
মলয়-সমীর, তব গৌরব এমন !
পরিতুষ্ট জীব-কুল তোমারে পাইয়া
শান্তি-পূর্ণ মধুময় তব আলিঙ্গন !
দেব-কাম্য পুষ্পবাস চন্দন-বাসিত
বিতরণে মুগ্ধ কর ভব-জন-চিত !

বন-ফুল, সমতুল কি আছে তোমার ?
কমলা-কান্তের তুমি সাধের ভূষণ !
বুঝিয়াছি ধন্য সৃষ্টি তোমা সবাকার,
ব্রজ-বিনোদের যত যতনের ধন !
হতভাগা অরে কলি পাপ-অবতার,
জন্মেছিস লয়ে শুধু পাতকের ভার !

দ্বাপরের অমৃতের অনন্ত-অর্ণব
শুকিয়ে গিয়াছে আজি তোর ভাগ্য-ফলে !
অবশেষে কণা-বিন্দু আছিল যে সব
তাও বুঝি যায় উড়ি নবীন-হিল্লোলে !
কেশব, এই যে তব প্রতিমা শোভন
এও কি [illegible] পতিত-পাবন ?

দেখিয়া ভারত-বাসী এ মধুর ঠাম
হৃদয় ঢালিয়া দিয়া যুগ-পদ-তলে,
পুরাবে না আর কি গো চির মনস্কাম ?
ভাসিবে না আত্মোচ্ছ্বাসে নয়নের জলে ?
মন্দির দুয়ারে নিত্য 'হরি' 'হরি' রবে
আর নাকি তব নামে গগন কাঁপাবে ?

ভ্রান্ত আমি—জড়-মতি ! তাই মোহ-বশে
প্রতিমূর্ত্তি বলি তোমা করেছি বিশ্বাস !
নিমগ্ন যে অনুদিন তব প্রেম-রসে
সে অতুল সুধাপানে যাঁহার অভ্যাস
সে জানে এদিব্য-মূর্ত্তি অমর অজর,
অসীম করুণা-রূপী তুমি পীতাম্বর !

তোমার বদন খানি বাৎসল্য-নিলয় !
স্নেহের প্রবাহ কারো ছুটি শত ধারে
অই নীল সিন্ধু-জলে পরিণত হয় !
নিভৃত হৃদয়-কক্ষে সোহাগ-আদরে
লুকাইয়া রাখে তোমা অতি সাবধানে !
সুস্বাদু ভোগের বস্তু দেয় চন্দ্রাননে !

তত্ত্ব-পথে চিত্ত কারো সতত ধাবিত,
সংজ্ঞাহারা—আত্মভোলা—মত্ত ভক্তি-মদে
তব পাদোৎপল-মধু-লোভে লালায়িত,
পূজে তোমা পরাৎপর সার গুরু বোধে !
সংযত পরম-নিষ্ঠ সেই ভাগ্যবান
অবিচারে পালে ব'ব শ্যায়ের বিধান !

বিকার-বিহীন তব বিমল মূরতি—
বারিদ-বিমুক্ত যথা উজ্জ্বল ভাস্কর—
হৃদি-শত-দলাসনে সন্তর্পণে অতি
স্থাপন করিয়া কেহ সংযোগ-তৎপর !
নিখিল মেদিনী যদি চূর্ণ হ'য়ে যায়
তথাপি নিশ্চল-মতি কটাক্ষে না চায় !

তাঁর চিদানন্দ-সরে উঠিয়া লহরী—
বিভোর করিয়া তাঁরে রাখে অনুক্ষণ !
ধরণী-আসনে বসি ধরা পরিহরি
অব্যয়-শাশ্বত ধামে করে বিচরণ !
উন্নত-শৈলেশ-শিরে বিহার যাঁহার
কূপ-মগ্ন-মায়া-কীটে কি করিবে তাঁর ?

পিপাসা মিটায় কেহ পিতৃ-সম্বোধনে !
সংসারের শরে শরে হইয়া কাতর
আকুল-নয়নে যবে চাহে মুখ-পানে
ন্যস্ত করে আত্ম-ভার তোমার উপর !-
প্রসারি করুণা-ভুজ সুস্থ কর তারে
তনয়-বৎসল তুমি খ্যাত চরাচরে !

তুষ্ট কেহ দামোদর, প্রিয়-সম্ভাষণে,
প্রেম-ভরে দিতে চাহে গাঢ়-আলিঙ্গন !

পলকের ব্যবধানে যুগান্তর গণে
পরিশুদ্ধ-সখ্য-সুধা ভুঞ্জে অনুক্ষণ!
ভীষণ ঝটিকাকুল-ভব-পারাবারে
নির্ব্বিঘ্নে চালক তুমি চালাও তাহারে।

কোন নারী শুদ্ধ-শীলা করে প্রণিপাত
বাঁধে তোমা প্রাণেশ্বর প্রেমের বন্ধনে!
ভক্তি-মলয়জে মাখি আত্মা-পারিজাত
প্রদানে অঞ্জলি সুখে তোমার চরণে!
দূরীভূত মোহময়ী যতেক বাসনা
তব অনুরাগে মাত্র তাহার কামনা!

বাঞ্ছা-কল্প-তরু তুমি সদ্যঃ-ফল-দাতা,
প্রদানো অভীষ্ট বর পদাশ্রিত জনে
কাঁদে যবে ভক্তে বলি "কোথা দীন ত্রাতা
সমুদ্ধার কর প্রভো পাতক লাঞ্ছনে!"
নির্ব্বিকারে করুণার বিকার সঞ্চারে
আকুল হইয়া ধাও উদ্ধারিতে তারে।

নির্ব্বিকারে নিরাকারে পরিতৃপ্তি যাঁর
তোমায় অসীম-রূপে পূজে সেই জন!
আমি মূঢ় জড়-চেতা কি বুঝিব তার?
অসম্ভব দুরাশায় নাহি আকিঞ্চন!
দয়াময়, দয়া ক'রে কর আশীর্ব্বাদ
হেরিতে এ কান্তি তব থাকে যেন সাধ!

ভক্ত-চিত্ত-পুরী-সহ উজলি মন্দির
ঐ যে তুমি বিরাজিত বাঁকা শ্যামরায়
এমূর্ত্তি ঈক্ষণে অক্ষি থাকে যেন স্থির!
লক্ষ্য-হীন ভাবে যেন ভ্রান্তি না জন্মায়!
সাকারে সংযোগ করি অনন্ত মহিমা
ভুঞ্জি যেন চির দিন তার মধুরিমা!

তব পাদোদক-মধু আত্ম-শুদ্ধি-কর,
সুর পেয় সুধা যার সমতুল্য নয়
পান করি জুড়াইনু বিদগ্ধ অন্তর
এ সুধায় যেন নাথ চির সাধ রয়।
হৃদয় জ্বলিতেছিল না পেয়ে যে ধন
আজি সেই তৃপ্তি-মধু লভিনু এখন!

জুড়ালে লোচন আজি রাজীব-লোচন
প্রকাশি অতুল দয়া; কিন্তু দয়াময়,
দয়াময়ী কেন মোরে নিদয়া এমন?
অমল যামিনী-পুঞ্জ লাগে বড় ভয়!

যে দৃশ্যে প্রান্তরে পান্থ আতঙ্কে অধীর
আমারো হেরিয়া তাই হলো চক্ষুস্থির!

না না! ভয় কি আমার? এযে ভূভারতে
বৈকুণ্ঠ-বিহারী তুমি নহ ত এখন!
লৌকিকতা-রক্ষা তাই পারনি ভুলিতে!
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-সহ এবে তব বিচরণ!
লাজ-ময়ী কমলিনী অন্তঃপুর মাঝে
বিরাজেন ফুল্ল-মনে ললনা-সমাজে!

ধন্য রঙ্গ লীলা-ময়, অগম্য চিন্তার
রসাতলে যায় বঙ্গ ঘোর স্বেচ্ছাচারে;
আদর করে না তাই এ মহা শিক্ষার,
পদ্ম-বাস পূতি-গন্ধে কলুষিত করে
মরি কি অদ্ভুত ভাব,—বিশ্বে নিরুপম!
নেত্র-ধর,হেরি নেত্রে নাশ মোহ-তমঃ!!

ধন্য হে অনন্ত দেব, ক্ষীরোদ ত্যজিয়া
ক্ষীরোদ-শায়ীর সঙ্গে তব অবতার!
দশাস্যের শক্তি-শেল হৃদয়ে ধরিয়া
ত্রেতায়, রাখিলে ভবে কীর্ত্তি চমৎকার!
ভ্রাতৃ-প্রেম কি যে ধন দেখালে ভুবনে!
সে মধুর যশোগানে মত্ত মহাজনে!

ভক্তি স্নেহে বিনিময় দ্বাপরে এখন,
অগ্রজ নাগেন্দ্র তুমি, অনুজ শ্রীবর!
ভ্রাতৃ-স্নেহে ঢল ঢল রেবতী রমণ,
দুইরূপে এক আত্মা কেমন সুন্দর!!
যেন নীলাচল শুভ্র তুষার রঞ্জিত!
সূর্য্যকান্তে নীল-কান্তে অথবা গ্রথিত!

পঞ্চমে বিনোদ ভাষী বংশীরব সনে,
সুগভীর শৃঙ্গনাদ মিশাও উল্লাসে!
মধুরে গভীরে মিশি পশিলে শ্রবণে
কার সাধ্য মত্ত-চিত্ত রাখিবে স্ববশে?
দেখাও ত্রিভঙ্গ-রূপে গলাগলি ধরি
চির-প্রেম পাশে বদ্ধ যুগল-মাধুরী!!

হে দেব, পুণ্ডরীকাক্ষ, আমি অভাজন
শক্তি-হীন ভক্তি-হীন বিঘ্ন-বিড়ম্বিত!
তোমার চরণে আসি লয়েছি শরণ,
মায়ের অঞ্চল এবে বহু দূরে স্থিত;
তুমি যদি মাতৃ রূপে স্নেহ না করিবে
অভাগা দুর্ব্বল তবে কেমনে বাঁচিবে?

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

উদ্বাহ-বিচার। (৪)

কৌলীন্যের কুফল।

তিব্বতবাসী ভিন্ন অন্য কোন জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের বহু বিবাহের কথা শুনা যায় না। পুরাণখ্যাত কুন্তী এবং দ্রৌপদীর বহু বিবাহ বিশেষ ঘটনা মাত্র ; এইরূপ ঘটনা বিশেষকে কোন সমাজের প্রথা বলা যাইতে পারে না। রমণীর বহু বিবাহ শুধু তির্ব্বতীয় সমাজেরই চিরন্তন প্রথা। সুতরাং তদ্বিষয় এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

এক ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিলেই তাহাকে বহু বিবাহ বলা যাইতে পারে। এ হিসাবে হিন্দু রমণী ভিন্ন জগতের সমস্ত পুরুষ রমণীর মধ্যেই বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু পরিত্যাগ (divorce) কিম্বা মৃত্যু দ্বারা স্বামী বা স্ত্রীর বিয়োগ ঘটিলে, এক ব্যক্তি একাধিকবার বিবাহ করিলেও সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না। তবে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী জাতির এবম্বিধ বহু বিবাহে নানা প্রকার সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া, হিন্দু সমাজ ইহা পোষণ করেন না। এই বিরোধে মতান্তর থাকিলেও, তাহা আমাদের সমালোচ্য নয়। স্বামী কিম্বা স্ত্রীর কোন প্রকার বৈধ অবিয়োগ সত্ত্বেও অপরের পাণি গ্রহণ করা যে নিতান্তই ঘৃণনীয় এবং অনিষ্টজনক, ইহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যজাতি শত মুখে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য মত আমরা আলোচনা করিতে চাহি না। পুরুষের শেষোক্ত প্রকার বহুবিবাহে মুসলমানাদি বহু জাতির বিশেষ কোন আপত্তি আছে বলিয়া জানি না, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারেরা তদ্বিষয়েও একবারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন ;—

"ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্ব মারিণ্যৈদত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥"

মনুসংহিতা—৫ম অঃ, ১৬৮ শ্লোক।

"ভার্য্যা অগ্রে মরিলে, তাহার দাহাদি ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিবে এবং পুনরায় অগ্ন্যাধান কার্য্য করিবে।"

মনু স্থানান্তরে বলিয়াছেন ;—

"মদ্যপাঽসাধু বৃত্তা চ প্রতিকূলাচ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা ব্যাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃত প্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥
যা রোগিনী স্যাৎ তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপাধিওব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ॥"

মনুসংহিতা,—৯নঅঃ ৮০-৮২ শ্লোক।

"মদ্য পানাশক্তা দুশ্চরিত্রা, পতিবিদ্বেষিনী, অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্তা, অপকার সাধনক্ষমা ও ধনক্ষয়কারিনী (অপব্যয় কারিনী) স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আদ্য ঋতু হইতে অষ্টমবর্ষে, মৃত বৎসা হইলে দশম বর্ষেও কেবল কন্যা প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে অধিবেদন করিবে, কিন্তু অপ্রিয়ভাষিনী হইলে, তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। পীড়াগ্রস্ত অথচ পতিপ্রাণা সুশীলা স্ত্রীর অনুমতি লইয়া পতি অন্য বিবাহ করিবে ; কদাচ তাঁহার অবমাননা করিবে না।"

এই সকল উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলেই শাস্ত্রানুসারে একাধিক বিবাহ করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, স্বেচ্ছাকৃত বহুবিবাহেরও পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন।

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

মনুসংহিতা—৩য় অঃ, ১২।১৩ শ্লোক।

"দ্বিজাতিগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত।

স্বেচ্ছাকৃত পুনর্ব্বিবাহে বিভিন্ন বর্ণের নিম্নলিখিত স্ত্রীগণই পরস্পর শ্রেষ্ঠ হয়; শূদ্রাই কেবল শূদ্রের ভার্য্যা হইবে। শূদ্রাও বৈশ্যের বিবাহ যোগ্যা। শূদ্রা, বৈশ্যা এবং ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণের বিবাহ যোগ্যা এবং শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিবাহ যোগ্যা হইবে।"

"ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রকন্যাস্তু ন বিবাহ্যা দ্বিজাতি ভিঃ।
বিবাহ্যা ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাহ্যাঃ কচিদেব তু" ॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

দ্বিজাতিগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির কন্যা বিবাহ করিবে না। তাহারা অগ্রে ব্রাহ্মণী (সবর্ণা কন্যা) বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ স্থল বিশেষে ক্ষত্রিয়াদি জাতীয় কন্যা বিবাহ করিতে পারে।

এই সকল শাস্ত্রীয় বচনের দোহাই দিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন,—"বহু বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য নহে।" কেবল উপরোদ্ধৃত বচনের প্রতি লক্ষ্য-করিলে এ কথা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্বে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত যে বিবাহ, তাহা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কাম্য বিবাহ মাত্র। অপিচ, উপরিউক্ত বিধানানুসারে সবর্ণা বিবাহ ব্যবস্থেয় নহে; যাহারা এক স্ত্রী বর্ত্তমান সত্বেও স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ব্বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের পক্ষে বর্ণান্তরে বিবাহই উক্ত বচনানুসারে ব্যবস্থেয়। কলিযুগে অনুলোম বিবাহ (নীচবর্ণা কন্যা বিবাহ) নিষিদ্ধ, সুতরাং উক্ত বিধিমতে বর্ত্তমান কালে অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করা যাইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব-কথিত যুক্তি খণ্ডনার্থ আরও দুই একটী বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্ ॥"
মনুসংহিতা—৩য় অঃ, ১৫ শ্লোক।

"দ্বিজাতিগণ যদি মোহবশতঃ হীন জাতীয় স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পুত্র পৌত্রাদি সহ স্ববংশে শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।"

এই বচনানুসারে ব্রাহ্মণগণের সবর্ণ ব্যতীত বর্ণান্তরে বিবাহ করিলেই পতিত হইতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে অনুলোম বিবাহ বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত একাধিক বিবাহে সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করাও শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তবেই দেখা যাইতেছে, শাস্ত্র-সম্মত কারণ ব্যতীত স্ত্রী বিদ্যমানে পুনর্ব্বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রের ২য় প্রশ্নের ৫ম পটলস্থ ১২শ শ্লোকে বলা হইয়াছে;—"যে স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্র লাভ হয়, তৎ বিদ্যমানে অন্য বিবাহ করিবে না।" এতদ্ভিন্ন একাধিক বিবাহ করিলে যে সবর্ণা এবং প্রথমা স্ত্রীই প্রকৃত স্ত্রী মধ্যে পরিগণিতা হন, ধর্ম্ম কার্য্যে স্বামীর সঙ্গিনী হন, গৃহকার্য্যে ও পতিপরিচর্য্যায় একমাত্র অধিকারিনী হন, অন্য কোনও স্ত্রীর যে সে অধিকার নাই, শাস্ত্রে একথার ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। বিধান-পারিজাত-ধৃত কাত্যায়ণ বচনে, মৎস্য-সূক্তের ২১শ পটলে, মনুসংহিতার ৯ম অধ্যায়-স্থিত ৮৬ সংখ্যক শ্লোকে উহার বিশেষ প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে।

তবেই দেখা যাইতেছে, প্রথম পরিণিতা সবর্ণা স্ত্রীই ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পরিগণিতা। অনুলোম বিবাহের অসবর্ণা স্ত্রী বা সবর্ণা জ্যেষ্ঠা ব্যতীত অন্য স্ত্রীগণ ধর্ম্মকার্য্যে, গৃহকার্য্যে বা স্বামীর পরিচর্য্যার অধিকারিণী নহেন, সুতরাং তাঁহারা পত্নী মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারেন না। বহু বিবাহ-প্রথা সমর্থনকারিগণ যে সকল বচনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, বহু বিবাহকে শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, সেই সকল বচন যে নিতান্তই হেয় এবং কামুকের পক্ষে প্রযোজ্য, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা তাহা সুন্দর রূপে বুঝা যাইতেছে। বস্তুত, শাস্ত্র-সম্মত

কারণ ভিন্ন অহেতুকি বহু বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত নহে। দেব-চরিত মুনিগণ কেনইবা এমন অসদ্বিধির সমর্থন করিবেন ?

সাধারণ জ্ঞানেও বহু বিবাহের ভূরি ভূরি দোষ দৃষ্ট হয়। রাজা বাদসাহদিগের বহু বিবাহের ফলে যে কত রাজ্য ছারখার হইয়াছে, কত অমানুষিক লোমহর্ষণ ব্যাপার এবং রক্তপ্লাবী বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহা রাজস্থান ও মুসলমান রাজ্যের ইতিহাস-পাঠকদিগকে বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। পৌরাণিক আখ্যান এবং মেয়েলী রূপ কথায়ও চিরকাল বহু বিবাহের কুফলময় দৃষ্টান্ত সমূহ অনুকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সপত্নীকলহ বিদ্বেষে কত গৃহ যে অশান্তি এবং কুৎসিৎ ব্যাপারে প্রেতাবাস শ্মশানের ন্যায় বসবাসের অযোগ্য হইয়া থাকে, তাহা কৌলীন্য-প্রধান বঙ্গের অধিবাসীর নিকট বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। দিন যেমন পড়িয়াছে, জীবিকা যেমন দুরূহ হইয়াছে, তাহাতে একটী স্ত্রী ও তদুৎপন্ন সন্তান সন্ততিগণের ভরণপোষণ এবং উপযুক্ত শিক্ষা বিধান করাই সাধ্যাতীত ব্যাপার। ধনী ইয়ুরোপ পর্য্যন্ত এ চিন্তায় ব্যাকুল। এইজন্য সে দেশে কত নরনারী অবিবাহিত অবস্থায় দিনপাত করিতেছে। ফরাসী দেশে বিবাহ-পরাঙ্মুখ যুবক যুবতীর সংখ্যাতিশয্য সমাজে বিপরীত কুফল সংঘটন করিয়াছে। হায়, দীন দরিদ্র বঙ্গ-বাসীর মনে অযথা পরিবার বৃদ্ধির বিষময় ফল-চিন্তা একবারও উদিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না !

হিন্দু শাস্ত্রমতে গৃহীর বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য। যারা সহধর্ম্মিনী, যায়া-হীন ব্যক্তি যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকারী। নিজের এবং বংশের উদ্ধার জন্য পুত্রোৎপাদনও বিবাহের ন্যায় হিন্দুগৃহীর অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা, যুক্তিবলে এ বিধির অসারতা প্রমাণ করিতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দুর বিশ্বাস তাহাতে চলিতেও না পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যুক্তি কয়জন বিশ্বাসী খ্রীষ্টানেরই বা বিশ্বাস টলাইতে পারিয়াছে ? শত সহস্র বিষয়ে বাইবেলের মত বিজ্ঞানের মতের বিরোধী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, অথচ বাইবেল ফেলিয়া "চার্চ্চে"কেহ বিজ্ঞান পাঠ করে না। যদিও দেখিতেছি, আধুনিক উচ্চ বংশজ হিন্দুগণের মধ্যে প্রায় পোণে যোল আনারও অধিক সংখ্যক ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ কার্য্যেই, শাস্ত্র বিধির প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য রাখিয়া চলেন না, শাস্ত্রবিহিত হিন্দুজীবন এবং তাঁহাদের জীবন স্বতন্ত্র পদার্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; সকলই যেন সুবিধাবাদী, যেখানে আঁটাআঁটি ঠেকাঠেকি, স্বার্থের ও স্বেচ্ছাচারিতার বিঘ্ন বাধা উপস্থিত, শুধু সেই খানেই ঋষি ঋষি শব্দে চীৎকার, শাস্ত্রের দোহাই হাঙ্গামা ; নতুবা শাস্ত্রের কথা কেহ স্মরণও করেন কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ বা রাজনীতির অনুরোধে, দেশোদ্ধারের জন্য হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান প্রয়াসী, বস্তুত, ধর্ম্ম-পিপাসায় উদ্দীপ্ত ধর্ম্মানুরাগীর দর্শন প্রাপ্তি দেশে অতি দুর্ল্লভ হইয়াছে। তথাপি নিজেদের কথায় উচ্চ আসন স্থাপন জন্য আমরা সমগ্র হিন্দুসমাজকে অনিষ্ঠাবান বলিতে প্রস্তুত নই, শাস্ত্রও অমান্য করিতে বলি না। কিন্তু শাস্ত্রের সারার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক দেশ, কাল ও অবস্থার অনুসরণ না করিয়া, বিধির সুবিধা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করাই বরং মহাপাপ। ধর্ম্মহানি নিবারণ এবং ধর্ম্মবৃদ্ধির অনুরোধে ভিন্ন, ধন-মান-বর্দ্ধন-কামনায় বহু-বিবাহের ব্যবসায় করিতে কোন্ শ্রুতি, কোন্

ঋষি কোন্ শাস্ত্রে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিনা। বঙ্গীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণ যে শতাধিক পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়া, বিবাহের ব্যবসায় করেন, তাহা কে না জানে? আমরা যথাস্থানে এইরূপ বহু বিবাহ-কারিগণের বিবাহের তালিকাদি প্রদান করিয়াছি। আশা করি, তদ্দ্বারা সকলেই এই কুৎসিৎ ব্যাপারের বিস্তৃতি কথঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে পারিবেন। পবিত্র উদ্বাহ-ব্রত, দাম্পত্য প্রেম ও ধর্ম্ম, ব্যবসায়ীর নিষ্ঠুর হস্তে পড়িয়া কতই লাঞ্ছিত হইতেছে! হা দেশাচার, হা কুলাচার, তুমিই আজ সর্ব্বোপরি আসন পাইয়াছ! নিজের কুৎসা, নিজের গ্লানি রটনা করিতে কার হৃদয় সায় দেয়, কার না কণ্ঠ রুদ্ধ হয়? কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, এই নিদারুণ পাপ-ব্যবসায় দেশে ও পবিত্র সুস্থ সমাজে ঘোর ব্যভিচার-স্রোত প্রবহনেও বিশেষ সাহায্য করিতেছে।

দেশাচার ও কুলাচারের অনুরোধে শাস্ত্র বিধি কিরূপে দলিত হইতেছে, তাহা এই বহু বিবাহ ব্যবসায়ের আনুষঙ্গিক কুফলগুলি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা ঋতুমতি হইলে, শাস্ত্র-মতে ভ্রূণহত্যাদির ন্যায় মহাপাতক হয়—এবং কন্যাদাতা পতিত হন। ভগবান ব্যাসও বলিয়াছেন;—

"যদিসা দাতৃবৈ কন্যারজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।
ভ্রূণহত্যাশ্চ যাবত্যঃ পতিতস্যাৎ তদপ্রদঃ"॥
ব্যাসসংহিতা—২য় অঃ, ৭শ্লোক।

"যদ্যপি কন্যাদাতার অনবধানতা বশত অবিবাহিতাবস্থায় ঋতুমতী হয়, তবে ভ্রূণহত্যার পাতক হয়। ঋতুকালের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কন্যা দান না করে, সে পতিত হয়।

তপোধন বশিষ্ঠ দেবের নিম্নোদ্ধৃত বচন দ্বারাও উক্ত বাক্যের পোষকতা হইতেছে।

"পিতুঃ প্রদানাৎতু যদা হি পূর্ব্বং কন্যাবয়ঃ সমতীত্য দীয়তে।
সাহন্তি দাতার পীক্ষমাণা কালাতিরিক্তা গুরুদক্ষিণে চ॥
প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যামৃতুকাল ভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠত্যাং দোষঃ পিতর মৃচ্ছতি॥
যাবচ্চ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামাম ভিযাচ্যমানাম্।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং মাতা পিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥
বশিষ্ঠ-সংহিতা—১৭শ অধ্যায়।

"যদি পিতা দান করিবার অগ্রে কন্যাকাল অতীত হয় এবং তৎপরে কন্যা প্রদত্ত হয়, তবে সেই কন্যা গুরুর হিতরত উত্তম পাত্রে প্রদত্ত হইলেও দৃষ্টিপাতে দাতাকে অধঃপাতিত করে। পিতা ঋতুকাল ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র না হইতেই কন্যাদান করিয়া থাকেন। অবিবাহিত অবস্থায় কন্যা ঋতুমতি হইলে দোষ হয়। অনুরূপ বর প্রার্থী আছে,—কন্যাও বিবাহ করিতে অভিলাষবতী, এমন অবস্থায় দান করা না হইলে, সেই কন্যা যত বার ঋতুমতী হইবে, পিতা মাতা ততবার ভ্রূণ হত্যার পাপী হইবে; ইহা ধর্ম্ম কথা।"

যমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে;—

"প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥
মাতাচৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাম্"॥
যম-সংহিতা—২২।২৩ শ্লোক।

"যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেছে দেখিয়াও কন্যা অর্পণ না করে, ঐ পিতা সেই কন্যার মাসে মাসে যে রজঃ হয়—সেই রক্তপান করিয়া থাকে; অর্থাৎ তৎ-তুল্য পাপী হয়।* মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কন্যা কা

* গর্ভ হইতে গণনা করিলে, দশম বর্ষের শেষ মাসে কন্যার বয়ঃক্রম ১০ বৎসর ১০ মাস হয়। আর দুই মাস অতীত হইলেই গর্ভ-দ্বাদশ-বর্ষ বয়ক্রম হইবে। অন্ততঃ এই সময়ে (দশম বর্ষের শেষ মাসে) দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেছে বিবেচনা করিয়া, কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত; ইহাই বচনের মর্ম্ম।

ভগিনীকে বিবাহ হইবার পূর্ব্বে রজস্বলা হইতে দেখিলে তাহারা তিন জনেই নরকে গমন করে।"

পরাশর-সংহিতার ৭ম অধ্যায়ে ৭।৮ শ্লোক দ্বারা উপরোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়,এবং সংবর্ত্ত সংহিতার ৬৭ শ্লোক দ্বারা উপরোদ্ধৃত ২৩শ শ্লোকটী অবিকল অনুকৃত হইয়াছে; সুতরাং ঐ সকল শ্লোক পুনরোদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

এই সকল বচনাদি দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রমাণিত হইতেছে, কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে, সেই কন্যার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ নিরয়গামী হইয়া থাকেন। এদত্তিন্ন এইরূপ কন্যার গ্রহীতাকেও পাপগ্রস্ত এবং হেয় হইতে হয়। যথাঃ—

"যাবন্নোত্তিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া অথ ঋতুমতী ভবতি দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরক মাপ্নোতি পিতৃ পিতামহ প্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে। তস্মাৎন গ্নিকা দাতব্যা" ॥ দায়ভাগ।

"স্তন প্রকাশের পূর্ব্বেই কন্যা দান করিবে। যদি কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হয়, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে নরক গামী হয়। এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করে। অতএব ঋতু দর্শনের পূর্ব্বে কন্যা দান করিবে।"

"পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্য সংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥
যস্তুতাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞান দুর্ব্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাংক্তেযং তং বিদ্যাদ্বৃষলী পতিম্॥"
উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

"যে অবিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে রজস্বলা হয়, তাহার পিতা ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হন। সেই কন্যাকে বৃষলী বলে। যে জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, সে অশ্রাদ্ধেয় * অপাংক্তেয় † ও বৃষলী পতি।

ঋতুমতী কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর বলেন;—

"যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞান মোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্য পাঙক্তেয়ঃ সবিপ্রো বৃষলী পতিঃ॥
পরাশর-সংহিতা, ৭ম অঃ ৯ম শ্লোক।

"যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞান মুগ্ধ হইয়া সেই কন্যাকে (ঋতুমতী কন্যাকে) বিবাহ করেন, তিনি শূদ্রপতি সদৃশ। তাহার সহিত কেহ এক পংক্তিতে ভোজন এবং সম্ভাষণও করিবে না।"

যমসংহিতার ২৪শ শ্লোকেও ঠিক উপরিউক্ত বাক্যই বলা হইয়াছে। তাহাতে একার্থবোধক দুই একটী শব্দের বৈলক্ষণ্য দেখা যায় মাত্র।

ঋতুমতী কন্যার দাতা এবং গ্রহীতা উভয় পক্ষই যে পতিত এবং নিরয়গামী হইয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বচনগুলি দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব এ সম্বন্ধে অধিক বচন প্রমাণ খুঁজিতে যাইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। তবে, একটী কথা এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক; মনুসংহিতার অষ্টম অঃ ২২৬ শ্লোকের মর্ম্মমতে অবিবাহিতা ঋতুমতী কন্যাগণ ধর্ম্ম কার্য্যে অনধিকারিণী, সুতরাং তাহারাও পতিতা মধ্যে পরিগণিতা।

বহুবিবাহ এবং ঋতুমতী কন্যার বিবাহ বিষয়ে ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এবম্বিধ নিষেধ থাকা সত্বেও কুলীন ব্রাহ্মণগণ অকিঞ্চিৎকর কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত অহরহঃ অম্লানবদনে এই সকল শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন। তাঁহাদের এবম্বিধ অসঙ্গত ব্যবহারের দরুণ নিজেরাতো মজিতেছেনই—সমাজকেও মজাইতেছেন।

কুলীন সমাজের কুলাভিমানী ব্যক্তিগণের বিবাহ সংখ্যা এবং অবিবাহিতা কন্যাগণের বয়সের পরিমাণ ইত্যাদির সংবাদ বঙ্গীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলেই অবগত আছেন। পরমারাধ্য স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়,১৯২৪ সংবতে (১২৭৪ সালে) হুগলী জিলায় বহু-

* যাহাকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়।

† যাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিলে পাপ হয়।

বিবাহকারী ব্যক্তিগণের এক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাতে ১৩৩ জন কুলীনের নাম পাওয়া যায়, এবং মোট বিবাহ সংখ্যা ২,১৯৬টি প্রদত্ত হইয়াছে। আজকাল সকল বিষয়েরই একটা গড়পরতা হিসাব ধরিতে দেখা যায়, সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া, উক্ত তালিকা আলোচনা করিলে জন প্রতিগড়ে ১৬টী বিবাহ পড়িবে। তালিকার লিখিত বিবাহের উচ্চসংখ্যা ৮০টী এবং নিম্নসংখ্যা ৫টী বটে। এই তালিকার নিম্ন ভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আরও বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। ৪,৩,২ বিবাহ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি অনেক ; বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাঁহাদের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল না।"

বহুবিবাহবিচার—১মপুঃ, ৬৫ পৃঃ।

এতদ্ভিন্ন ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন তারিখের সঞ্জীবনীতে যশোহর, খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিসাল, এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি জিলার বহুবিবাহকারিগণের এক তালিকা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে মাত্র ৯৬ জন লোকের নাম পাওয়া যায়। উক্ত তালিকার বিবাহের উচ্চসংখ্যা ৩৬টী এবং নিম্নসংখ্যা ২টী। বলা বাহুল্য যে, এই তালিকা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ; অনেক নাম এই তালিকাভুক্ত হয় নাই এবং অনেক নামের বিবাহের প্রকৃত সংখ্যার অপেক্ষা তালিকায় কম লিখিত হইয়াছে। আর এক সংখ্যক সঞ্জীবনীতে অনেক নামের তালিকা বাহির হইয়াছিল।

পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া, বহু বিবাহ কারিগণের এক বৃহৎ তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার "নোটবুক" হইতে বাছিয়া বাছিয়া, পূর্ব্ববঙ্গের ৬৮টী ব্যক্তির নাম লইয়াছিলাম। তাহাতে দেখা যায়, উক্ত ৬৮জন লোকের মোট বিবাহ সংখ্যা ৯৬৭টী উর্দ্ধ সংখ্যা ১০৭ এবং নিম্নসংখ্যা ২টী। এস্থলে বলা আবশ্যক, এই তালিকা, আমাদের সমালোচিত সঞ্জীবনীর প্রকাশিত তালিকা হইতে সম্পূর্ণ নূতন। ইহা ভিন্ন আরও বিস্তর নাম আমাদের জানা আছে, যাহা ঐ সকল তালিকা ভুক্ত হয় নাই। আমাদের অজ্ঞাত কত নাম যে তালিকায় উঠে নাই, তাহা ভগবানই জানেন।

কুলীন কন্যাগণের বিবাহ সাধারণতঃ যৌবন অতীতেই হইয়া থাকে ; অনেকের বৃদ্ধ বয়সেও বিবাহ হইয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে, অনেক কুলীন রমণী বৃদ্ধবয়সে মরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনে আর বিবাহ হইল না। অনেক স্থলে বৃদ্ধা রমণীর, অল্পবয়স্ক বালকের সঙ্গে, অথবা যুবতী কন্যার বর্ষীয়ান বৃদ্ধের সঙ্গেও বিবাহ হইতে দেখা গিয়াছে। এই সকল কথা সম্বন্ধে কুলীনকুল-গৌরব সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে পুস্তক লিখিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা একবার পাঠ করেন, আমরা বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি। তিনি ভুক্তভোগী লোক, তাঁহার যুক্তিযুক্ত কথা অন্তর ভেদ করে। কৌলীন্যের অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাপেক্ষা আমরা অধিক আর কি লিখিব। আমরা ভরসা করি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, সমাজের বহু বিবাহ প্রথা সংশোধন করিয়া, সমাজকে ঘোরতর পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবেন। (সমাপ্ত)

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

সাধ্বী অঘোর কামিনী দেবী। *

মহা প্রস্থান।

"এসেছে আমার যাবার সময়;
বাড়ী যাই, বাড়ী যাই;
চ'খে জল নাই, ভবে মায়া নাই,
তবে আর দেরি নাই।
রহিল গো সত্য তোমাদের তরে,
নাহিক সম্বল আর;
এ সত্য পালিও, না রবে জীবনে
ভয়-তা' পাপ-ভার"।
নিবে আসে দীপ, জ্ব'লে উঠে প্রাণ,
জ্বলন্ত-অনল সম;
নাহি দেহে বল, তবু কণ্ঠে গান,
"তুমি হে ভরসা মম"।
ভক্তদল মিলে, ভাসি অশ্রুজলে,
মার নাম-গুণ গায়,
ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, তবু মা মা বলে,
কর-তালী দেয় সায়।
অন্তিম নিশ্বাস বহিল তাঁহার
মায়ের মধুর নামে,
হেসে হেসে তাই, গেলেন চলিয়ে
মায়েব আনন্দ-ধামে।

আবাহন।

"হাসিয়ে হাসিয়ে, মা নাম গাহিয়ে,
কে আসে কে আসে ওই?
কার পুণ্যালোকে এ অমর-লোকে
আলোকিত সবে হই?
আসিছে বিজয়ী বীর সুর-নারী
বিজয়-মুকুট-প'রে,
চল যাই সবে ডেকে আনি তারে
জয়-জয় ধ্বনি ক'রে।"
খদিজা, মৈত্রেয়ী, গোপা, গার্গী, মেরী,
সুর-নারী যত আর;
জয় জয় ব'লে আসেন সকলে
যথা পরলোক-দ্বার।
"এস গো ভগিনী অঘোর কামিনী,
এস এস সাধ্বী সতী,
সার্থক জীবন, আদর্শ রমণী,
ধন্য তুমি পুণ্যবতী!"
দিলেন সকলে মহাকুতূহলে
প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন;
কি মহা উচ্ছ্বাস! কি মহা আনন্দ!
কি অপূর্ব্ব সম্মিলন?

পরিচয়,—সাধন ও প্রচার।

"বহুদিন হ'তে সুনাম তোমার
আমাদের জপমালা;
বহুদিন হ'তে, শুনি তব মুখে
মা নাম অমিয়া ঢালা।
যবে পতি-পাশে, গৃহ-দেবালয়ে,
বসিতে পূজিতে মায়,
তোমার পূজায় আমাদেরো পূজা,
কৃতার্থ হ'তাম তায়।
রোগীর শিয়রে, শোকার্ত্তের প্রাণে,
কে দিবে সান্ত্বনা আর,
তুমি বিনা দেবী শোন হাহাকার,
বাঁকিপুর অন্ধকার!
রাজ-গৃহ-পথে, রেলের শকটে,
প্রতিবাসী ঘরে ঘরে,—
কে আর মা ব'লে কাঁদিবে, কাঁদাবে,
তেমন প্রেমের ভরে?
কি যে দুটী আঁখি, পেয়েছিলে তুমি!
এত অশ্রু কোথা ছিল?
এত গো দরদ কোথা পেলে তুমি?
কে তোমারে শিখাইল?
বল বল শুনি তেমনি আবার,
তেমনি আবার বল,
"জয় মা, জয় মা" আঁখি-নীরে ভেসে,
ভাবে প্রেমে ঢল ঢল!

ব্রহ্মচর্য্য ও সেবা।

"বঙ্গ-কুলনারী চিরবিলাসিনী
জগতে জানিত সবে,
সধবা সে নারী ব্রহ্মচর্য্য লয়!
কে শুনেছে কোথা কবে?
অধ্যাত্ম-বিবাহে, আত্মিক মিলনে,
পতি সেবা কর সতী!
এমন সধবা কয়টী ভারতে?
কজন এমন সতী?

---

* বাঁকিপুর নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশ চন্দ্র রায়ের পরলোকগতা পত্নী।

সার্থক তোমার সাধন ভজন,
সংযম, সেবা-ব্রত!
বৈরাগ্যে তোমার ঘুচিল বঙ্গের
বিলাস-কলঙ্ক যত।
সন্তান তোমার কাঁদিয়া অধীর;
প্রতিজ্ঞা অটুট তবু!
বঙ্গ-নারী-প্রাণে এতই বীরত্ব!
কে জানিত আগে কভু?
আপনার সুখ ভুলিলে গো তুমি,
পরকে করিতে সুখী;
পরের সেবায়, পরের ব্যথায়,
আপনি হইলে দুঃখী;
সেবার আগুন জ্বলিল তোমাতে,
থাকিতে পার কি ঘরে?
তাই কি ছুটিলে ব্রাহ্মণী যথায়
কাতরা সূতিকা-জ্বরে?
শিয়রে বসিয়ে কত সেবা দিয়ে,
হরিলে যাতনা আর;—
পূর্ণ হ'ল কাল, মানাম শুনালে,
আসিল সে ভব-পার।
কে কোথা কাতর কোন্ ছাত্রাবাসে,
খুঁজে খুঁজে ছুটে গেলে!
দারুণ বসন্ত, বিসূচিকা-ভয়,
কিছুতে না ভয় পেলে!
মা নাই নিকটে, তাই কি তাদের,
মায়ের দায়িত্ব নিলে?
আপন সন্তানে জল চিড়া দিয়ে,
মিষ্টান্ন এদের দিলে।
নাহিক পুস্তক, নাহিক বেতন,
সঙ্কটে সম্বল-হারা,—
কেন মার মত, তোমারি বা কাছে,
ছুটিয়া আসিল তারা?
কাঁদিল পরাণ ছুটিলে অমনি,
পুর-নারী-দ্বারে দ্বারে;
ভিক্ষা ক'রে এনে তুষিলে সন্তানে,
মা বিনে কে এত পারে?"

নারীর জন্ত দরদ।

"নারী-অপমান দেখে দেশময়
কত না পাইলে ব্যথা!
"আজিও হয়নি নারীর সম্মান"
লিখে গেলে শেষ কথা।

বড় ব্যথা পেলে, যবে গো শুনিলে
আশাজোল অত্যাচার;
আবেদন ক'রে লাট-পত্নী কাছে
চাহিলে গো প্রতিকার।
গয়া-যাত্রী নারী রেলের ষ্টেসনে
না পায় বিশ্রাম-স্থান;
জলে ঝড়ে রোদে কত কষ্ট পায়,
কাঁদিল তোমার প্রাণ।
সে দুঃখ দূরিতে, কত ব্যস্ত হ'য়ে,
করিলে গো আবেদন,
ফলিল সুফল তোমারি চেষ্টায়,
হইতেছে আয়োজন।
নারী কি একাই অজ্ঞান আঁধারে
চিরদিন প'ড়ে রবে?
তোমার কোমল নারীর পরাণ
কতদিন আর স'বে?
শাসন-পালন—সুশিক্ষা-প্রণালী
দেখিয়া শিখিবে ব'লে,
ছুটিলে গো লক্ষৌ জেনানা মিসনে,
নয় মাসে সিদ্ধ হ'লে।
করিলে স্থাপিত নারী-বিদ্যালয়,
নারীর উন্নতি-আশে
করিলে স্থাপিত ছাত্রী-সেবা তরে,
ছাত্রীবাস নিজবাসে।
কোথা সিন্ধু দেশ, কোথা বঙ্গ দেশ,
বেহারে চলিল ছাত্রী,
অজানিত টানে ছুটে এলো সবে,
মহাতীর্থে যেন যাত্রী!
বাড়ী বাড়ী গেলে দৃষ্টান্ত দেখালে,
কথায় হবে না জেনে,
ঘোর শত্রু যারা মিত্র হলো তারা,
মেয়ে দিল হার মেনে।
জ্ঞান-ধর্ম্ম-নীতি, সংসারের বিধি,
শিখালে কত কি আর;
জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে যথায়,
শিক্ষা নয় গুরু-ভার।
লাট-সহকারী বোল্টনের মুখে
সুখ্যাতি ধরে না তার,
দেখে বিদ্যালয় বলেন বিস্ময়ে,
"এমন দেখিনে আর।"
নাহি দিন রাতি, ছাত্রীবাসে তুমি
ছাত্রী তরে ব্যস্ত কত!

নিজ হাতে রেঁধে, নিজে বেঁটে দিয়ে,
সেবা কর আর মত।"
এত ও পারিতে! কেমনে পারিতে
সে ক্ষীণ শরীর ল'য়ে?
এত সেবা-ভার নয় সাধ্য কার,
বাঙ্গালীর মেয়ে হ'য়ে?
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য বাঁকিপুর?
ধন্য সে ভারতভূমি!
আত্ম-জয়ী হয়ে দেশ জয়ী হ'লে,
কাল-জয়ী নারী তুমি!
চল দেবী চল, ল'য়ে যাই সবে,
গাইয়ে মায়ের জয়;
ব্রহ্মানন্দ যথা চিদানন্দ রসে,
আনন্দে আনন্দময়!

ব্রহ্মানন্দ-দর্শন।

"এস দেবী এস," ব'লে ব্রহ্মানন্দ
ডেকে লন সমাদরে;
"ব্যাকুল আমরা এ অমর পুরে
বহুদিন তোমা তরে।
হ'লে চিরজয়ী বীর-নারী তুমি,
সম্মুখ সমরে ঘোর;
সেবার নেশায় অঘোর-বিভোর;
ধন্য গো সাধ্বী অঘোর!
ছিল বড় সাধ তোমাদের ল'য়ে
রচি প্রেম-পরিবার;
পূরেছে সে সাধ গড়েছ জীবন;
কি সুখ আজি আমার!
এত কাল ধ'রে এত সেবা ক'রে,
তবু তিরপিত নও!—
এ আনন্দ ধামে দেব-সেবা ক'রে
চির-তিরপিত হও।
অনন্ত জীবন সম্মুখে তোমার
অনন্ত সাধন লও;
অনন্ত বন্ধনে অনন্ত মিলনে,
অনন্তে মগন হও।"

শ্রীকালী নাথ ঘোষ।

তীর্থদর্শন

২৭শে অক্টোবর (১৮৯৫) প্রাতে অগ্রবন অর্থাৎ আগ্রা ত্যাগ করিয়া ভোর ট্রেণে বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। যখন বেলা ১১টা, তখন আমরা মথুরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। মথুরায় দেখিবার এমন কিছু নাই বলিয়া, সেস্থানে আর নামিলাম না। আগ্রায় যেমন মুসলমানের কীর্ত্তি, বৃন্দাবনেও তেমনি হিন্দুর কীর্ত্তি রহিয়াছে। বৃন্দা দূতী এই বনে বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম বৃন্দাবন হইয়াছে। পথেই পাণ্ডার দল আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিল। যাঁহারা তীর্থ স্থানে গিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তীর্থস্থানে পাণ্ডাদের হাতে কি ভোগই না ভুগিতে হয়! এই ভোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং অপরিচিত স্থানে বাসা ইত্যাদির সুবিধার আশায়, আমরা যুগলকিশোরকে পাণ্ডা করিলাম। পাণ্ডাজি শিকার পাইয়া মহা উৎফুল্ল হৃদয়ে আমাদের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার সেই সস্মিত মুখ মণ্ডল এখনও যেন দেখিতেছি। ১২ টার সময়ে বৃন্দাবনে পৌছিলাম। পাণ্ডা গাড়ী ভাড়া করিল, এবং আমাদিগকে লইয়া ভগবান দাসের কুঞ্জে উপস্থিত হইল। এই কুঞ্জটী একটী চকমিলান দোতালা বাড়ী বিশেষ। কুঞ্জ বলিলেই মনে হইত যে, লতা পাতায় মণ্ডিত সুন্দর বাগান, সেই তপোবন সদৃশ বাগানের ভিতরে শান্তিময় কুটীর সকল বিরাজ করিতেছে। ভগবান দাসের কুঞ্জে আসিয়া সেই কাল্পনিক কুঞ্জ অন্তর্হিত হইল। এই কুঞ্জটী যমুনার নিকটে, বাড়ীর গেটটী বেশ বড়। এইরূপ

অনেক কুঞ্জ এখানে আছে। বড় বড় লোকে যাত্রী ও বৃন্দাবনবাসিগণের সুবিধার জন্য এই সব কুঞ্জ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, অল্পমূল্যে ভাড়া পাওয়া যায়। আমাদের কুঞ্জে ৩০ জন বিধবা বাস করেন, ইহাঁরা অধিকাংশই বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া। সকলেই কায়স্থ জাতীয়া, পাবনা জেলা বাসিনী। অধিকাংশের খরচই বাড়ী হইতে আসে। ইহাঁরা যাবজ্জীবন বৃন্দাবনে বাস করিবেন বলিয়া এখানে আছেন। আমরা উপর তলায় একটী কামরা ভাড়া লইলাম। জনৈক বিধবা আমাদিগকে পাক করিয়া দিলেন। আমাদিগের পাণ্ডা আমাদিগের পরিচর্য্যার জন্য একটী বালক নিযুক্ত করিয়া দিল। আমরা যমুনার কেশীঘাটে স্নান করিলাম। কৃষ্ণ কেশী নামক দৈত্যকে এই ঘাটে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম কেশীঘাট হইয়াছে। যমুনায় কচ্ছপের বড়ই প্রাদুর্ভাব। তীর্থস্থান বলিয়া ইহাদের উপর কেহ অত্যাচার করে না। ঘাটে যাওয়া মাত্র ১০।১২টী কচ্ছপ ভাসিতে ভাসিতে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। আমরা ভয়ে জলে না নামিয়া ঘটিযোগে উপরেই স্নান করিলাম। কচ্ছপগুলিকে দেখিলে ঘৃণা ও ভয় উভয়ই উপস্থিত হয়। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একজন পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বিদেশে বেড়াইতে আসিয়া এত বাঙ্গালী আর কোথাও দেখি নাই। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। কাশী যেমন শাক্তদিগের, বৃন্দাবন তেমনই বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ। সেইজন্য বৃন্দাবন বৈষ্ণব বৈষ্ণবীতে পরিপূর্ণ। অধিকাংশ মাথাই শুন্যের ন্যায় কামান এবং তরমুজের বোঁটার ন্যায় চৈতনযুক্ত। বৃন্দাবনের বানরও প্রসিদ্ধ। পথে, ঘাটে, গাছে, ছাদে সর্ব্বত্রই কেবল বানর। বাহিরে কিছু রাখিবার যো নাই, রাখিলেই খাবার লোভে তাহা লইয়া উচ্চস্থান আশ্রয় করে, কিছু খাবার জিনিস দিলে জিনিসটী ফেলিয়া দেয়, না দিলে নষ্ট করিয়া ফেলে। তীর্থস্থানে এবং পশ্চিমে বানর, হনুমানের বড়ই সম্মান, সেইজন্য মর্কটদিগের দৌরাত্ম্য বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে মথুরা হইতে দলে দলে রাজ-পুরুষেরা আসিয়া, এখানে বানর, হরিণ ও ময়ূর শিকার করিতেন। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর দরখাস্ত করিয়া বানর মারা রহিত করিয়াছেন। আমরা এইরূপ নরবানরের মধ্য দিয়া প্রথমে নিকুঞ্জ বনে (বিহার-কুঞ্জ) আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা এবং সখীদিগের সহিত বিহার করিতেন। কুঞ্জটী বড়। প্রস্তর-নির্ম্মিত আঁকা বাঁকা সুন্দর রাস্তা কুঞ্জের নানা স্থানে লতার ন্যায় গিয়াছে। এই স্থানে অসংখ্য বানর। বানরদিগের জন্য কিছু খাবার আনা হইয়াছিল। বানরেরা আক্রমণ করিয়া আমাদিগের পাণ্ডার নিকট হইতে সমুদায় লুটিয়া লইল। যে স্থানে গোবিন্দ ষোড়শ সহস্র গোপিনী সহ ক্রীড়া করিতেন, সেই স্থান এখন বানর বানরীদিগের লীলানিকেতন হইয়াছে। একটী ক্ষুদ্র ঘরে রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে ফুলশয্যা করিয়া রাখা হয়। প্রাতে নাকি দেখা যায় যে, কেহ যেন শয়ন করিয়াছিল। কথিত আছে, এক চোবে দেখিবার জন্য এক রাত্রি এখানে বাস করিয়াছিল; প্রাতে দেখা গেল, সে বোবা হইয়া রহিয়াছে। শুনিলাম, বৃন্দাবনে কাক থাকে না। ব্রজবাসিগণের বিশ্বাস, রাধিকাদের ঘুমের ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কা করিয়া সন্ধ্যার সময়ে

তাহারা বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যায়। ললিতা-কুণ্ড প্রভৃতি দেখিয়া, বস্ত্রহরণ বৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাছের গোড়া ও ঘাট বান্ধান। কৃষ্ণ গোপিনীগণের বস্ত্রহরণ করিয়া এই গাছে উঠিতেন বলিয়া পাণ্ডারা বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতেছে। অনেক-গুলি কাপড় গাছে ঝুলান আছে। কথিত আছে,এই ঘাটের নিকটস্থ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বকাসুর নিহত হইয়াছিল। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য মন্দ নয়। ইহার পর আমরা নিম্নলিখিত মন্দিরগুলি দেখিলাম।

(১) সাজির মন্দির।—আগ্রা ও দিল্লী মুসলমানদিগের মস্‌জিদে পরিপূর্ণ; আর বৃন্দাবন হিন্দুর মন্দিরে আচ্ছন্ন। এটী একটী উৎকৃষ্ট মন্দির। প্রায় সমুদায়ই শ্বেত পাথরের কাজ। নানারূপ ছবি ও মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। শ্বেতপাথর কাটিয়া ঢেউতোলা করিয়া নানা ভঙ্গিতে থামগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে। রক্ষক আমাদিগের জন্য একটী সুসজ্জিত হল খুলিয়া দিল। হলটী ক্ষুদ্র বটে কিন্তু ঐশ্বর্য্য,সৌন্দর্য্য ও আড়ম্বরের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। আলো দিবার নানা প্রকার বন্দোবস্ত আছে, আলো দিলে না জানি কি সুন্দরই দেখায়। মন্দিরটীর গঠনপ্রণালী ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। নেপালের একজন ধনী বণিক বহু অর্থ ব্যয়ে এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। একস্থানে তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রী ও ভ্রাতার চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে।

(২) গোবিন্দজীর মন্দির।—এইস্থানে গোবিন্দজী রাধা ও ললিতার সহিত বিরাজ করিতেছেন। ইনি দিবসের এক এক সময়ে এক এক বেশ ধারণ করেন। ইহা বৃন্দাবনের সকল মন্দির হইতে উচ্চ। কথিত আছে, ইহার চূড়া দিল্লী হইতে দেখা যাইত বলিয়া হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী আরঙ্গজিব তাহা ভাঙ্গিয়া দেন। মূর্ত্তিগুলিও কোন কোন স্থানে ভাঙ্গা, বাদসাহ তাহাদের উপরও অত্যাচার করিতে ছাড়েন নাই। এখন বিগ্রহ নূতন মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। অম্বর-রাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক ১৫৯০ অব্দে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহা এখন জয়পুরের মহারাজার তত্ত্বাবধানে আছে। মহারাজ সেবার জন্য বৃন্দাবনের আয়ের এক তৃতীয়াংশ দান করিয়াছেন। কৃষ্ণ যদু-বংশের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া ইহাঁকে রাজপুতেরা অত্যন্ত ভক্তি করে। কৃষ্ণ মাখনভক্ত ছিলেন,এজন্য এখানে সেবার জন্য প্রচুর মাখন দেওয়া হয়। এই মন্দিরটী ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ ও প্রধান মন্দির। পুরাতনটী দেখিতে বড়ই চমৎকার। ইহা হিন্দু শিল্পের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

(৩) শেঠের মন্দির।—মথুরাবাসী গোবিন্দ দাস ও রাজকৃষ্ণ দুই ভাই এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৮৪৫ অব্দে আরম্ভ হইয়া ছয় বৎসরে শেষ হয়। ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার আশি ফিট করিয়া উচ্চ গেট তিনটী বড়ই সুন্দর। এই মন্দিরটী যেন একটী দুর্গ বিশেষ। চারিদিকে শত শত কামরা-যুক্ত অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড মন্দির। যে দেখিবে,সে-ই বিস্মিত ও সুখী হইবে। মন্দিরের সম্মুখে প্রসিদ্ধ সোণার তালের গাছ। ভূগর্ভে ইহার ১৬ এবং উপরে ৪০ হাত আছে। ইহা একটী থাম। তালগাছের সহিত বড় একটা সাদৃশ্য দেখিলাম না। থামটী সোণার পাতে কিংবা গিল্‌টী করা তামার পাতে জড়িত। দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এখানে সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে।

(৪) ব্রহ্মচারীর মন্দির।—গোয়ালিয়রের রাজার গুরুদেব এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া

দিয়াছেন। মধ্যে প্রকাণ্ড হল। শ্বেতপাথরের কাজ। দেখিলাম, সন্ধ্যার সময়ে কীর্ত্তন হইতেছে। দলে দলে লোক বিগ্রহ ও মন্দির দেখিয়া বেড়াইতেছে।

(৫) লালাবাবুর মন্দির।—পাইকপাড়ার রাজাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবু এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন। এটী একটী দেখিবার মত জিনিস। লালাবাবু ইহার জন্য ৪০ হাজার টাকা আয়ের বিষয় লিখিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহ সেবার জন্য এক শত টাকা বরাদ্ধ আছে। প্রতিদিন এখানে পাঁচ শত লোক প্রসাদ পাইয়া থাকে। পোনের দিনের বেশী কেহ আহার পায় না। বৃন্দাবনে কাহাকেও উপবাসী থাকিতে হয় না। লালাবাবু স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাই আহার করিতেন। ব্রজবাসিনীরা লালাবাবুর জন্য রুটি প্রস্তুত করিয়া রাখিত। সেই হইতে লালাবাবুর নামে এক প্রকার রুটি প্রচলিত আছে। শেষ অবস্থায় লালাবাবু গোবর্দ্ধনে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানেই হঠাৎ পতিত হওয়ায় তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে। শাক্তেরা এই অপমৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করে যে, "যখন তিনি বৈষ্ণব হইয়া নৌকাযোগে বৃন্দাবনে আসেন, তখন কাশী ঘাটে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব হইয়া শাক্তের তীর্থ দেখিবেন না বলিয়া নৌকার পর্দ্দা ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দেন। এই পাপের জন্য তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে।"

এতদ্ভিন্ন মদনমোহন, গোপীনাথ, যুগলকিশোর প্রভৃতির মন্দির এবং গোকুল, গোবর্দ্ধন ইত্যাদি দেখিবার স্থান রহিয়াছে। পথ, ঘাট, বৃক্ষ ও মন্দির শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী নীরব ভাষায় প্রচার করিতেছে। মথুরা ও বৃন্দাবন যেন জীবন্ত কৃষ্ণচরিত।

সুন্দর সুন্দর ভিক্ষার্থী বালকগণ কখন ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে, কখন যুগল মিলনে সম্মুখে আসিয়া গান করিতে করিতে নাচিতে লাগিল। কিছু না দিলে তাহারা 'দাদা একটা পয়সা দাও' বলিয়া আদরে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। তাহাদের সেই সুন্দর আব্দার ও মধুর ডাকে পরাস্ত হইয়া শেষে কিছু কিছু দিতে হইল। প্রায় দেব মন্দিরের সম্মুখেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

২৮শে অক্টোবর স্নান ও আহারান্তে বৃন্দাবন ত্যাগ করিলাম। যখন আমাদের গাড়ী মথুরা হইয়া যমুনার পুলের উপর আসিল, তখন যমুনা-বক্ষ হইতে মথুরাপুরীকে বড়ই সুন্দর দেখা যাইতে লাগিল। যমুনা-গর্ভ হইতে সৌধ সকল উঠিয়াছে। সুধা-ধবলিত, স্তরে স্তরে সজ্জিত, অট্টালিকা শ্রেণী,—যমুনা নদী ও তাহার পুলিন এবং অতীত স্মৃতি একত্র মিলিত হইয়া, অন্তর ও বাহির এক মধুর ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যমুনা-বক্ষ হইতে সৌধ-কিরীটিনী মথুরার আলোক-চিত্র লইলে সুদৃশ্য চিত্র উঠিতে পারে।

দিল্লীর যাত্রীদিগকে হাতারশে ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমরা হাতারশ-জংসনে নামিলাম। ইহা একটী প্রকাণ্ড ষ্টেশন। এখানে ৮ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। আহারান্তে রওনা হইয়া রাত্রি ৩টার সময়ে দিল্লীতে অবতরণ করিলাম; এবং নিকটবর্ত্তী একটী সরাইয়ে উপস্থিত হইয়া একটী কামরা ভাড়া করিয়া শয়ন করিলাম। প্রাতে ৮টার মধ্যে স্নান ও আহারাদি সমাপন করিয়া একখানি একা করিয়া এগার মাইল দূরবর্ত্তী পৃথ্বীরাজের দিল্লী দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এই দীর্ঘ পথটী বড়ই সুন্দর। দুই ধারে বৃক্ষ-

শ্রেণী, ইহারই মধ্য দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বের স্থান কেবল ভগ্নাবশেষ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপে পরিপূর্ণ। দেখিলেই প্রাচীন দিল্লীর ঐশ্বর্য্য ও বিস্তার দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। দিল্লী হিন্দুরাজ্যের মহাশ্মশান,মুসলমান-সাম্রাজ্যের মহাসমাধি এবং মহাকালের ভীষণ লীলা-ক্ষেত্র। প্রায় ৩০ মাইল ব্যাপিয়া প্রাচীন অট্টালিকার ইষ্টক ও ভগ্নস্তূপ ইন্দ্রপ্রস্থের সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ বিশপ হিবর সাহেব এই ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া কহিয়াছিলেন, প্রকাণ্ড লণ্ডন নগর যদি কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়,তবে তাহার ধ্বংসাবশেষ ইন্দ্র প্রস্থের তুল্য হইবে না। আমার প্রাণের ভিতরে অতীতের স্মৃতি ও মহাভারত জীবন্ত হইয়া উঠিল। সেই জীবন্ত মহাভারত পাঠ করিতে করিতে, দেখিতে দেখিতে এগার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রসিদ্ধ কুতুব মিনারের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহা উচ্চে ২৩৮ ফিট, গোড়ার পরিধি প্রায় ১৪০ ফিট। উপরে উঠিবার জন্য ভিতরে ৩৭৫টী সিঁড়ি আছে। লালবর্ণ বেলে পাথর ও শ্বেত-পাথরের-যোগে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা পাঁচতালা অর্থাৎ থাকে বিভক্ত। ইহাদের উচ্চতা নিম্ন হইতে ক্রমে ৯৫, ৫১ ৪১, ২৬ ও ২৫ ফিট। কলিকাতার অক্টরলোনীর মনুমেণ্টের উচ্চতা ১৬৫ ফিট। কথিত আছে, ইহা পৃথ্বীরাজ নির্ম্মাণ করেন, পরে কুতুব ভাঙ্গিয়া পরিবর্ত্তিত আকারে গঠন করিয়াছেন। ইহারই অনুকরণে নিকটে আর একটী নির্ম্মিত হইতেছিল; অসম্পূর্ণাবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কেইন সাহেব কুতুব মিনারের গঠন-প্রণালী,সৌন্দর্য্য, বর্ণ, ও বিচিত্রতা সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে,সমুদায় পৃথিবীর ভিতরে এক ফ্লরেন্স নগরের টাওয়ার ব্যতীত সর্ব্ব বিষয়ে ইহার তুল্য টাওয়ার আর দ্বিতীয় নাই। কুতুব ইহা আরম্ভ করেন, এবং আলতমাসের সময়ে তাহা শেষ হয়। আমরা প্রথমে লাল ফোর্টে গেলাম। ইহাতে পৃথ্বীরাজের বাড়ী ও দুর্গ ছিল। লালফোর্ট দ্বিতীয় অনঙ্গপাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইঁহারই পুত্র তৃতীয় অনঙ্গপাল মামুদের ভয়ে লাল-ফোর্টে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পরিধি প্রায় আড়াই মাইল, প্রাচীর প্রায় ৬০ ফিট উচ্চ এবং চতুর্দ্দিক পরিখা-বেষ্টিত। দক্ষিণ দিকের গড় বুজিয়া গিয়াছে। ইহার পর পৃথ্বীরাজের ভুতখানায় গেলাম। মন্দিরের গাত্রে ও থামে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। পদ্মনাভ নারায়ণ,ঐরাবত পৃষ্ঠে দেবরাজ,হংসপৃষ্ঠে পিতামহ ও ষাঁড়ের পৃষ্ঠে নন্দী সহ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। অনেক মূর্ত্তিই মুসলমানদিগের অত্যাচারে ছিন্ননাসা, বিকৃত-কলেবর ও হস্তহীন হইয়াছে। অনঙ্গ পালের দীঘি ১৬৯ ফিট লম্বা ও ১৫২ ফিট প্রস্থে। ইহারই নিকটে প্রসিদ্ধ জাহান পান্না। সাহজাহানের কন্যা জাহানারা পিতাকে সেবা করিবার জন্য সাহজাহানের সহিত কারাগারে গিয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার কবর আছে। এই পিতৃভক্তিপরায়ণা কন্যার নাম দিল্লীতে বড়ই আদরণীয়। মুসলমানদিগের প্রথম বাদসাহ কুতুবের সুন্দর ও বৃহৎ কবর দেখিয়া আমরা কুতুব-মিনারে উঠিলাম। সিঁড়িগুলি বড়ই সুন্দর, তথাপি আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। অধিকাংশই উঠিয়াছিলাম। উঠিয়া চতুর্দ্দিকে কি মহা শ্মশানই-না দেখিলাম! এক দুইজন নহে—হিন্দু, পাঠান ও মোগল এই স্থানে আপন আপন প্রেতকার্য্য

সম্পন্ন করিয়াছে। যে স্থানে দুই একজনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা হয়, সেই শ্মশানক্ষেত্র দেখিয়া যদি প্রাণে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, তবে যে স্থানে বিধাতা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া তিনটী মহাবংশের শেষ দেহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই মহাশ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া প্রাণে যে মহাভাব ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে পারে, তাহা বলা যায় না, দর্শক তাহা অনুভব করিয়াই বুঝিতে পারেন। অদূরে অতীত সাক্ষী যমুনা ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। যমুনা কত বংশের উত্থান পতনই দেখিল, কত বংশের অন্তর্জলিও না করিল! কত বংশের অন্তিম ভস্ম ভাসাইয়া শোকের গান গাইতে গাইতে কত লোককেই না কত মহা উপদেশ প্রদান করিল! চতুর্দ্দিকব্যাপী ভগ্নস্তূপাবলী অতীত বংশের স্তূপীকৃত কঙ্কালরাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে। যাঁহারা শবসাধন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা পিতৃপুরুষগণের এই মহাশ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া এই অনন্ত কঙ্কাল রাশির মধ্যে আপনার সাধন-আসন স্থাপন করুন।

ইন্দ্রপ্রস্থ, নূতন দিল্লী, সবই এখান হইতে দেখা যাইতেছে। এখান হইতে অষ্টাদশ-পর্ব্ব লক্ষ-শ্লোকাত্মক মহাভারতের জন্ম হইয়াছে, এই স্থান হইতেই ভারতের সর্ব্বনাশকারী ভ্রাতৃদ্রোহের জলন্ত-উদাহরণ-স্থল কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সূচনা হইয়াছে, এই স্থান হইতেই ভারতের বর্ত্তমান অবনতির বীজ উপ্ত হইয়াছে, এইস্থান হইতেই ভারত আপনার ধর্ম্মশাস্ত্র গীতা, পুরাণ ও ভাগবত, আপনার বল ও ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া জগৎকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন। এস্থানের গৌরবে মৃত ভারত এখনও গৌরব করিতেছেন এবং সভ্য জগতের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। নূতন দিল্লী দেখিবার বাসনা তত বলবতী ছিল না; পাণ্ডব, কৌরব ও চৌহান বংশের মহা শ্মশান-ক্ষেত্র ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিতে আসিয়াছিলাম—দেখিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিলাম। চারি দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। উঃ চতুর্দ্দিকে কি ভীষণ শ্মশান! কি মহাশ্মশান!! অগ্নিহীন ধূমশূন্য সহস্র সহস্র চিতা কুতুবমিনারের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া, উঃ কি লোমহর্ষণ ভাবেই জ্বলিতেছে!!!

কুতুবমিনার হইতে অবতরণ করিয়া দেবালয়ের প্রাঙ্গণস্থ প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভটী দেখিতে গেলাম। ইহাকে লোকে ভীমের গদা বলে। পিলারটীর বহির্বেষ্টন ১৬ ফিট ৪ ইঞ্চি; ভূমি হইতে উচ্চতা ২২ ফিট। গোড়ার ২ফিট প্রস্তরে বান্ধান। এই স্তম্ভের অঙ্গে ছয় পংক্তি লিপি খোদিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহা পড়িয়া জানিয়াছেন যে, রাজা ধুব কর্ত্তৃক ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইনি বৌদ্ধ রাজা বলিয়া অনুমিত হয়েন। পিলারটী বিশুদ্ধ লোহায় নির্ম্মিত। একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, হিন্দুগণ এত পূর্ব্বে এরূপ বৃহৎকায় ও গুরুভারবিশিষ্ট লৌহদণ্ড নির্ম্মাণ ও উত্তোলন করিয়াছিলেন, যাহা এখনও ইউরোপীয়গণেরও বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। পৃথ্বীরাজ ও কুতুব উদ্দীনের দিল্লী দেখিয়া আমরা যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে যাত্রা করিলাম। ইহা নূতন দিল্লী হইতে দুই মাইল দক্ষিণে। আমাদের পথে হুমায়ুনের কবর পড়িল। ১৫৬০ অব্দে পিতা হুমায়ুনের স্মরণার্থ, মহাত্মা আকবর কর্ত্তৃক ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৬ বৎসর লাগিয়াছিল। উচ্চতা ৭০ ফিট, ব্যাস

৬০ ফিট। সমুদায় ভারতের মধ্যে ইহা একটী আশ্চর্য্য সমাধি-মন্দির। এই স্থানে আকবর-জননী হাসিদা বাবু এবং দারা, ফিরোজ সা, জাহান্দার সা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আলমগীর প্রভৃতিরও কবর আছে। ইহার চারিধারে সুন্দর বাগান শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বে বাগানের নানা স্থানে সজীব ফোয়ারা সকল জলক্রীড়া করিত; তাহার চিহ্ন এখনও আছে। ইহার পর আলাউদ্দীনের সুদৃশ্য কবর দেখিয়া মহাভারতের লীলাক্ষেত্র ইন্দ্রপ্রস্থের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হুমায়ুন-জয়ী সের সা এইস্থানে আপনার রাজধানী স্থাপন ও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চ পাণ্ডবকে পাণিপত, সোনপত, ইন্দ্রপত, টিলপত ও ভাগপত নামক যে পাঁচ খণ্ড জমী দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টিলপত ও ভাগপত এখনও বর্ত্তমান আছে, অপর তিনখানা যমুনার গর্ভে অদৃশ্য হইয়াছে। পুরাতন দুর্গ যে স্থানে ছিল, সেরসা তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া সেইস্থানে আপনার কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে স্থানে মহাবীর অর্জ্জুনের দুর্গ ছিল, সেই স্থানে হুমায়ুনের মস্জিদ শোভা পাইতেছে। যে স্থানে পাণ্ডুপুত্রগণ নারায়ণ ও মহর্ষি ব্যাস কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেন, সেই স্থানে সেরসার রাজবাড়ী কালের ভীষণ পরিবর্ত্তনের কথা ঘোষণা করিতেছে। আর, যে স্থানে রাজসূয় মহাযজ্ঞ উপলক্ষে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গান্ধার প্রভৃতি দেশের রাজা মহারাজা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন,—যে স্থানে দর্পহারী মধুসূদন দর্পিত শিশুপালের দর্প হরণ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যক্ষেত্র যজ্ঞ ক্ষেত্রের কোন চিহ্নই নাই,—সেইস্থানে সাহজাহান কর্ত্তৃক ১৬৩১ অব্দে নূতন দিল্লী নির্ম্মিত হইয়াছে। সেরসা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার নাম সেরগড় রাখেন; কিন্তু লোক এক্ষণে তাহাকে ইন্দ্রপথ বা পুরাতন কেল্লা বলিয়া থাকে। এখানে এখন দরিদ্রের কুটীর ও দোকান বিরাজ করিতেছে! সেরসার দুর্গের সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় প্রাচীরোপরি উঠিলাম। যে স্থান ভীম অর্জ্জুনের পদভরে কম্পিত হইত, যে স্থান মহর্ষি ব্যাসের অমৃত নিস্যন্দিনী কবিতার মাধুর্য্যে পরিপ্লুত হইত, যে স্থানের আকাশ যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় জ্বলন্ত উপদেশে প্রতিধ্বনিত হইত, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। বর্ত্তমান ভুলিয়া, আপনাকে বিস্মৃত হইয়া, যেন সেই দ্বাপর যুগে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মহাভারতের ঘটনা সমুদায় যেন জীবন্ত হইয়া মানস নেত্রের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। দুর্গের উপর দাঁড়াইয়া প্রাচীন গৌরব ও বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিতে লাগিল। আকুল প্রাণকে আরও আকুলিত করিয়া এই নীরব ধ্বনি হইল;—

কত কাল পরে বল ভারত রে,
দুখ সাগরে সাঁতারে পার হবে।

শরীর রোমাঞ্চিত হইল!! বিধাতাই জানেন, সে দিন কত দূরে!

ইহার পর বাসার দিকে ফিরিলাম। দূর হইতে দিল্লীর জগদ্বিখ্যাত যুমা মস্জিদের চূড়া দেখা যাইতেছিল। ক্রমে আমাদের গাড়ী মস্জিদের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। হিন্দুদিগের বিনা পাশে প্রবেশ নিষেধ; আমরা অন্য স্থান হইতে পাশ আনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সাহজাহান চতুর্থ বর্ষে আরম্ভ করিয়া দশম বর্ষে ইহা শেষ

করেন। এই মস্‌জিদ যে বেদির উপর উত্তোলিত হইয়াছে, তাহা অতি অদ্ভুত, না দেখিলে বুঝান যায় না। ৪০টী সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া বেদির উপরে উঠিলাম। মস্‌জিদটী মক্কারদিকে মুখ করিয়া আছে। ইহা দিল্লীর সমুদায় বাড়ী হইতে উচ্চ। ইহা দৈর্ঘ্যে ২৬০ ফিট ও প্রস্থে ১২০ ফিট। এক এক জনের জন্য এক এক খানি আসন নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহা লম্বা ৩ ফিট ও প্রস্থে ১½ ফিট। শ্বেত পাথরের আসনগুলি কাল পাথরের বর্ডারযুক্ত। প্রস্তর-নির্ম্মিত বহুসংখ্যক আসন আছে। শুক্রবারে প্রায় দশ হাজার লোক একত্র হইয়া থাকে। দেখিলাম, মন্দিরটীর জীর্ণসংস্কার হইতেছে। অজু করিবার জন্য মধ্যে একটী সুন্দর ও বৃহৎ জলপূর্ণ চৌবাচ্ছা আছে। যে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুন্দর ও সুদৃশ্য আধারে কোরাণ রক্ষিত হইয়াছে, তাহা একখানি ক্ষুদ্র ঘর বিশেষ। বাহির হইতে দেখিলাম; হিন্দুর ভিতরে যাওয়া নিষেধ। নূতন দিল্লী সহরের নাম সাজেহানাবাদ। ইহার চারি ধারে প্রাচীর, ভিতরে যাইবার জন্য কাশ্মীর, কাবুল, লাহোর, আজমীর, দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি নামে গেট আছে। কলিকাতা-গেটের ভিতর দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে। আমরা চাঁদনী চক দিয়া বাসায় আসিলাম। চাঁদনী চক (রূপার রাস্তা) লম্বায় এক মাইল এবং প্রস্থে ৭০ ফিট। শাল, চাদর, কিংখাপ ও সোণা রূপার কাজ এখানে সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। বাদসাহেরা রাস্তাকেও কেমন সুন্দর ও বিলাসপূর্ণ করিতেন, তাহা রূপার রাস্তাটী (চাঁদনী চক) দেখিলে বেশ বুঝা যায়।

সাহজাহানের কেল্লা দেখিতে আর তত ইচ্ছা হইল না। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাসায় আসিলাম। বিশ্রামান্তে কুইন্সগার্ডেনে বেড়াইতে গেলাম। ইহা আমাদের বাসার নিকটেই, ষ্টেশনের অপর পারে। আহারান্তে আমরা দুইজনে হরিদ্বারে যাত্রা করিলাম। পূর্ণিমার যোগ বলিয়া হাজারে হাজারে হরিদ্বারে যাত্রী যাইতেছে। আমরা মধ্যশ্রেণীর যাত্রী বলিয়া জনতা হইতে কতক রক্ষা পাইলাম।

ভোরে উঠিয়া দেখি, আমরা সাহবাণপুর আসিয়াছি। গিরিরাজ হিমালয় বিরাট দেহ বিস্তৃত করিয়া রাগে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। অদূরে তুষার-মণ্ডিত হৃষীকেশের শিখরদেশ প্রাতঃ-সূর্য্যের তরল কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে। মুগ্ধ প্রাণে এই মধুর দৃশ্য দেখিতে ২ লাক্‌সার হইয়া বেলা ৯টার সময়ে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলাম। আমাদের পাণ্ডা গোবর্দ্ধন তাঁহাদের বাসায় আমাদিগকে লইয়া গেলেন। বাসাটী অতি সুন্দর স্থানে, পর্ব্বতের গায়ে। বাসার নীচ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন, গঙ্গার অপর পার হইতে পর্ব্বতশ্রেণী উঠিয়াছে। জল প্রস্তরে প্রতিহত হইয়া শ্রুতি-মধুর-কল্লোল ধ্বনি উৎপন্ন করিতেছে। আমরা একটী ক্ষুদ্র কুটুরী দখল করিয়া বসিলাম। আমাদের কুটুরী হইতে নদী, পর্ব্বত সমুদয়ই সুন্দর দেখিতেছি। পূর্ণিমার যোগ বলিয়া হরিদ্বার যাত্রীতে পূর্ণ হইয়াছে। জয়পুরের মহারাজা দলবলে আসিয়াছেন। যাত্রী-নিবাস সকল যাত্রীতে পূর্ণ হইয়াছে। ২।১ টী বাঙ্গালীর সহিত কচিৎ দেখা হইল। অধিকাংশ লোকই বিহারী ও রাজপুত।

আমরা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গেলাম। ঘাট যাত্রীতে পরিপূর্ণ। ঘাট প্রস্তরে বান্ধান। গঙ্গার একটী খরস্রোত বক্রভাবে

এই স্থান দিয়া যাইতেছে। ছোট বড় কত শত মাছ বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। হাত হইতে খাবার খাইতেছে। কি সরলতা! কি স্বাভাবিক ভাব!! কিছুক্ষণ এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম। বাঙ্গালী মৎস্যপ্রিয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মাছের এইরূপ সরলতা, বিশ্বাস ও নিঃশঙ্কতাপূর্ণ ভাব দেখিয়া তাহাদের সহিত যে খাদ্য খাদকতা সম্বন্ধ আছে, সে ভাব আদৌ মনে আইসে নাই। জলচরে স্থলচরে এত আত্মীয়তা, খাদ্য খাদকের এমন সুহৃদ্ ভাব, ধর্ম্ম গ্রন্থে পড়িয়াছি, আর আজ তাহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিলাম। লোকের জনতা ভেদ করিয়া যেমন ঘাটে নামিলাম, তেমনই মৎস্যের জনতা ভেদ করিয়া জলে নামিতে হইল। জল বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা,কারণ পর্ব্বতস্থ বরফ সকল গলিয়া স্রোত রূপে বহিয়া যাইতেছে। জল অল্প,কিন্তু স্রোত বড়ই প্রখর। স্থির ভাবে দাঁড়ান মুস্কিল। সম্মুখে কাঠ ও লোহার একটী ক্ষুদ্র পুল আছে। বড় আরামে বরফ জলে স্নান করিলাম। খাদ্যখাদক সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া কিছু ক্ষণ ব্রহ্মকুণ্ডে মৎস্যের সহিত একত্র কোলাকুলি ভাবে স্নান করিলাম; তাহারা বিশ্বস্ত ভাবে আমাদের সহিত খেলা করিতে লাগিল। আহারাদি সমাপন করিয়া বিকালে কন্‌খলে গেলাম। বাসা হইতে ৪ মাইল দূরে। বৃন্দাবনের ন্যায় এখানে বানরের বড় প্রাদুর্ভাব। কন্‌খলে যাইবার পথে গঙ্গার প্রসিদ্ধ কেনালের উৎপত্তি স্থান দেখিলাম। এই সুদীর্ঘ কেনাল কাণপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। হরিদ্বারে গঙ্গায় এক সুদূর বাঁধ দিয়া ইহার অধিকাংশ জলকেই খাল পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে। এই খালকে লোকে কটলীখাঁর খাল বলে। যখন খনন আরম্ভ হয়, হরিদ্বারের পাণ্ডারা কাটাখালে গঙ্গা যাবেন না বলিয়া দম্ভ করিয়াছিল। তাহাতে কটলী হাস্য পূর্ব্বক এই উত্তর দেন, ভগীরথ যাকে শঙ্খের শব্দে লইয়া গিয়াছিল,আমি তাহাকে চাবুকের জোরে অনায়াসেই লইয়া যাইতে পারিব। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই অদ্ভুত খাল খনন করিয়া,স্থান বিশেষে নদীর উপর ও মধ্যদেশ দিয়া এমন ভাবে লইয়া গিয়াছেন যে, দেখিলে হতজ্ঞান হইতে হয়। সেতুর উপর দিয়া আমরা কন্‌খলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হরিদ্বারের দুই দিকে দুই পর্ব্বত-শ্রেণী, মধ্যে ত্রিধারা হইয়া গঙ্গা প্রবাহিত। এই তিন ধারা কন্‌খলে আসিয়া মিলিয়াছে। এইস্থানে বিদুর যোগ সাধন করেন, এবং এই স্থানেই বিদুর-মৈত্রেয়ী সংবাদ হয়।

হরিদ্বারে গঙ্গা যেন কিশোরী বালিকা। বাল্যের চঞ্চলতা, যৌবনের উদ্ভিন্ন শ্রী এবং লজ্জাশীলতা একত্র সমাবেশ হওয়ায়,কিশোরী গঙ্গার কি সৌন্দর্য্যই না বিকাশ পাইতেছে! কিশোরী বালিকা পর্ব্বতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কূল ছাড়িয়া অকূলে প্রাণ সঁপিবার জন্য গুন্ গুন্ স্বরে অনন্ত পথের পথিক হইয়াছে। প্রতিরোধকারী পর্ব্বতের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য কতই না মিনতি করিতেছে! রসিক পর্ব্বত প্রতিধ্বনি-চ্ছলে কত আমোদই করিতেছে। এই রসিকতা ও মিনতি একত্র মিলিত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতই রচিত হইতেছে। প্রকৃতির এই অস্ফুট গানে ভাবুকের ভাব, ভক্তের ভক্তি, প্রেমিকের প্রেম এবং বিশ্বাসীর বিশ্বাস উথলিয়া উঠে। প্রকৃতি নীরব আহ্বানে সকলকে অনন্তের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে—এই জন্যই হরিদ্বার তীর্থক্ষেত্র এবং যোগী ঋষির আদরের স্থান। পর্ব্বত-দুহিতা আপনার প্রাণের আকুল ক্রন্দন পর্ব্বতের

চরণে অর্পণ করিতে করিতে আকুল প্রাণে আপনার জীবন-নাথের উদ্দেশে ছুটিয়াছে! কাহার সাধ্য এ গতিকে রোধ করে? তাই কূল ভাঙ্গিয়া, দেশ ডুবাইয়া, রাজ্য ভাসাইয়া কত প্রতিকূল অবস্থা ও ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিয়া, যুবতী গঙ্গা, সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া, আপনার প্রাণ-সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতেছে। 'যেমন বুকভরা আশা, তেমনই হৃদয়-ভরা আলিঙ্গন। হরিদ্বার এই জন্য দাম্পত্য প্রণয়ের শিক্ষা-গুরু। সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি আর্য্য সতীগণ এই দাম্পত্য প্রণয়ের প্রতিকৃতি স্বরূপা। প্রকৃতি শব্দহীন ভাষায় এই দাম্পত্য-প্রণয় ভারতকে শিক্ষা দিতেছেন।

ভক্তিশিক্ষার্থীও হরিদ্বারে আসিয়া মহান শিক্ষালাভ করিতে পারেন। ভক্তিমন্দাকিনীর উৎস বিধাতা সকলের হৃদয়-কন্দরেই নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন তাঁহার কৃপায় হৃদয়কন্দর ভেদ করিয়া সেই উৎস ভক্তবৎসল লীলাময় শ্রীহরিকে পাইবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হয়, তখন ভিতর ও বাহিরের পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা, শত শত লোকের প্রতিকূলতাচরণ, সকলই সেই স্রোতে ভাসিয়া যায়। রাগানুগা ভক্তি গঙ্গার ন্যায় নির্ম্মল ও স্বাভাবিক। পার্থিব পাপপঙ্কে, লোকের বিদ্রূপ আবর্জ্জনায় এই জলকে অপবিত্র করিতে পারে না। আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া, আপনার গানে আপনি উন্মত্ত হইয়া, আপনার সৌরভে আপনি বিমোহিত হইয়া, ভক্ত অহেতুকী ভক্তির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জীবনসমুদ্রে আপনাকে সমর্পণ করেন। সে মিলন কি সুন্দর! কি মধুর!! কি পবিত্র!!! রাধাকৃষ্ণের মিলন ইহারই প্রতিরূপ, মধুর ভাবের ইহাই পরিণতি। ভক্তিশিক্ষার্থী এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে হিমালয়ের পাদমূলে এই নব ভক্তিগীতোপনিষৎ পাঠ করিতে পারেন। প্রকৃতির এই মহাগ্রন্থ অভ্রান্ত, ইহা সকলেরই ধর্ম্ম-শাস্ত্র। বিশ্বাস-নেত্রে পাঠ করিলে, আত্মা কৃতার্থ, হৃদয় শীতল, প্রাণ তৃপ্ত এবং বাসনানল নির্ব্বাপিত হয়।

প্রকৃতির মহাগ্রন্থের এই সমুদায় পাঠ করিতে করিতে কনখলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কনখলে দেখিবার এমন বিশেষ কিছু নাই। মন্দির দেখিলাম। হিন্দুর নিকট কনখল এক মহাতীর্থ ক্ষেত্র। প্রসিদ্ধ 'কুশাবর্ত্ত' দেখিয়া বাসায় আসিলাম।

বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিয়া, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একখানি কম্বল গায়ে জড়াইয়া গঙ্গার ধারে ধারে ধীরে ধীরে বাঁধা ঘাটে বেড়াইতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে আহা কি দৃশ্যই দেখিলাম! প্রকৃতির এমন মুক্ত আলয়ে এমন মনোমোহন দৃশ্য আর দেখি নাই। দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ প্রাণে ব্রহ্মকুণ্ডের সেতুর উপর আসিয়া দর্শকদিগের সহিত একত্র বসিলাম। আমার সম্মুখে জলস্রোত পর্ব্বত শরীরে প্রতিহত হইয়া কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার কূলে নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী সোপানাবলীর উপর শত শত প্রদীপ জ্বালিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন, কত প্রদীপ জলে ভাসিতেছে, কত আলো তীর-ভূমি আলোকিত করিতেছে। সোপানাবলীর সহিত সংলগ্ন হইয়া মন্দির কয়েকটী উঠিয়াছে, তাহাতে মৃদুমধুর গান ও বাদ্য হইতেছে, ঘাটে লোক সকল দলে দলে ধর্ম্ম সঙ্গীত করিতেছে, দক্ষিণদিকে জয়পুরের মহারাণীর পটবাস হইতে গান ও বাদ্য শ্রুত হইতেছে, বাম দিকে ও নিম্নদেশ দিয়া গঙ্গার প্রবাহ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। পশ্চাতে জলস্রোত, তার পর ক্ষুদ্র চড়ায় সন্ন্যাসীর দল, চড়ার অপরদিকে ক্ষুদ্র নদী, নদীর তীর হইতে পর্ব্বত শ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে। মস্তকোপরি সুনীল আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ উদিত হইয়া আপনার সুধাময় কিরণ বর্ষণ করিয়া ধরাকে সুধাময়ী করিতেছেন, শত শত নক্ষত্র প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে ধরাতে দৃষ্টিপাত করিতেছে। প্রকৃতির এই মুক্ত অনন্ত প্রসারিত সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত মিলিত হইয়া, মর্ত্ত্যে এক অপরূপ স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছে। এই অপূর্ব্ব স্বর্গের সংস্পর্শে অন্তর বাহির মধুময় হইয়া গেল। মনে হইল, স্বর্গ হইতে দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহা ধর্ম্মক্ষেত্রে যেন

সমবেত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার করিয়াছেন। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এত ঘনিষ্ঠযোগ পূর্ব্বে কখন অনুভবও করি নাই। ক্ষণকালের জন্য মনে হইল, এই জগৎব্রহ্মাণ্ড এক লীলাময়ের লীলায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। একই শক্তি ঊর্দ্ধে, অধোতে, চতুর্দিকে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য বিস্তার করিতেছে। সেই শক্তির স্থূল ও সূক্ষ্ম বিকাশে এই গ্রহ তারকা পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এবং জ্ঞান-প্রেম-সমন্বিত অধ্যাত্ম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহা কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। সেই শক্তি বহির্জ্জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং অন্তর্জ্জগতে ধর্ম্মস্রোতরূপে কার্য্য করিতেছে। সেই শক্তি অন্তর ও বাহির ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে এবং শৃঙ্খলা,সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। জড়, নর, চেতন, অচেতন সেই এক শক্তিতেই নাচিতেছে, হাসিতেছে ও কাঁদিতেছে। লীলাময় ব্রহ্মের লীলা-সমুদ্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিমগ্ন রহিয়াছে। আমি সেই লীলা-সমুদ্রের একটী ক্ষুদ্র নগণ্য বুদ্‌বুদ্। সেই শক্তির অনুগত হওয়াই আমার ধর্ম্ম; ইহার অনুগত হওয়ার জন্যই সাধনের প্রয়োজন। ধর্ম্ম বাহিরে নয়—হৃদয়ের হিরণ্ময় কোষে—যুক্তিতর্কের অতীত স্থানে। যুক্তি, তর্ক ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া যে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় প্রভুর দ্বারে হত্যা দিতে পারিয়াছে, সে-ই ধন্য হইয়াছে।

অনেকক্ষণ এই ভাবে অতীত হইল। ধীরে ধীরে লোক সকল যাইতে লাগিল। এক দল সন্ন্যাসী আসিয়া সেই বরফ জলে স্নান করিয়া গেলেন। আরও কাহাকেও কাহাকেও স্নান করিতে দেখিলাম। যখন ব্রহ্মকুণ্ড নির্জ্জন-প্রায় হইল, তখন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া মাছদিগকে খই খাওয়াইলাম। ২৫০।৩০০ ছোট বড় মাছ ভাসিয়া ভাসমান খই সকল খাইতে লাগিল। সেই অপরূপ দৃশ্য এখনও যেন দেখিতেছি। আহারান্তে হরিদ্বার পরিত্যাগ করিয়া অমৃতসরে যাত্রা করিলাম। হরিদ্বারে পূর্ণিমার যোগ উপলক্ষে অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সহিত ধর্ম্মভাবের যে অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিয়াছিলাম, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ।

নিরাকারের সাকাররূপ। (১)

"সমস্তে চিতে বিশ্বস্বরূপ স্বকায়।"

"তুমি চৈতন্যস্বরূপ, তুমি বিশ্বরূপাত্মক, তোমাকে নমস্কার।"—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

পরমেশ্বরকে বিশ্বরূপ বলিয়া সম্বোধন করা,অতি উচ্চতম অবস্থার কথা। অনন্তের অতি পরিস্ফুট অনুভূতি না হইলে, কেহ তাঁহার এই বিরাট-পুরুষ রূপ দর্শন করিবার অধিকারী হয় না।

এই বিশ্বরূপ দর্শন অত্যুন্নত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ; ইহাই সার্ব্ব-ভৌমিক ধর্ম্মের প্রাণ; এই উদার ও উন্নত ভূমিতেই সাকার-নিরাকারের চিরন্তন বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

ঈশ্বরকে যাঁহারা সাকার বলেন, তাঁহারা অজ্ঞ; যাঁহারা নিরাকার ভাবেন,তাঁহারা অন্ধ। ঈশ্বরকে সাকার বলা মিথ্যা,নিরাকার বলাও মিথ্যা; সাকার না নিরাকার, এ প্রশ্ন করাও মিথ্যা। হয় বল,তিনি সাকারও নহেন,নিরাকারও নহেন, এক অর্থে তাহা সত্য হইবে; নয় বল, তিনি সাকারও নিরাকারও, আর এক অর্থে তাহাও সত্য হইবে; কিন্তু কোনও অর্থেই, ঈশ্বরকে কেবল সাকার বা কেবল নিরাকার বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু সাকার বলিতে এ স্থলে, কেবল চক্ষুগ্রাহ্য জড়-আকৃতি-বিশিষ্ট পদার্থকে নির্দ্দেশ করিতেছি না। যাহার আকার আছে, তাহাই সাকার; এবং আকারের সাধারণ লক্ষণই পার্থক্য নির্দ্দেশ,সীমা নির্দ্ধারণ। যতক্ষণ নদী জলধি হইতে স্বতন্ত্র থাকে, ততক্ষণ নদীর আকার এক, জলধির আকার এক। কিন্তু যখন "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার" তখন নদী আকারবিহীন হইয়া যায়। আকা-

শকে আমরা নিরাকার বলি, কারণ আকাশ যাবতীয় বস্তুর সীমা নির্দ্ধারণ ও নির্দ্দেশ করে, কিন্তু আকাশের সীমা কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তবে যখন নৈয়ায়িক অসীম ও অখণ্ড আকাশকে ঘটাকাশ, পটাকাশ বলিয়া, সসীম ও খণ্ড খণ্ড করেন, তখন নিরাকার আকাশ, এই কল্পিত বিভাগ নিবন্ধন, ঘটপটের আকার ধারণ করিয়া থাকে।

পার্থক্য নির্দ্দেশ বা সীমা নির্দ্ধারণই যদি আকারের মৌলিক লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বাহ্য প্রকৃতির ন্যায়, মানসিক সৃষ্টি সমূহও সাকারের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়। তাহা হইলে চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহনক্ষত্র, নদীসরিৎ, পশুপক্ষী, বা নরনারীর ন্যায়, বেদ-বেদান্ত, রামায়ণ মহাভারত, কুমার-ভট্টি, সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতির চিন্তা, ভাব এবং কল্পনাও সাকার পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হয়; এবং সে অবস্থায়, প্রস্তরেতে খোদিত, মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত বা চিত্রপটে অঙ্কিত দেবদেবীর ন্যায় মনের চিত্র-ফলকের উপরে, ভাষার তুলিকায়, ভাবের বর্ণে রঞ্জিত পরমেশ্বরও সাকার হইয়া যান।

সাকারের সত্য অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিয়া, একবার নিজের কথাই ভাব দেখি,—তুমি আপনি সাকার, না নিরাকার,—দেহ, না আত্মা? কেবল দেহ বলিলে অসত্য হইবে; আবার কেবল নিরাকার চৈতন্য বলিলেও মিথ্যা হইবে। কারণ, অনাত্ম বস্তুর তুলনায়, তাহার জ্ঞাতারূপেই তুমি তোমার আপনাকে জান; অর্থাৎ এই দেহের মধ্য দিয়া, ইন্দ্রিয় প্রপঞ্চের সাহায্যেই কেবল তোমার বিষয়ের অবরোধ ও আত্মার অনুভূতি জন্মিতেছে। নিরাকার, বিদেহী আত্মা যে কিরূপ, জানি না, বুঝি না, কল্পনাও করিতে পারি না। তবে, পরলোক সম্বন্ধে এই আশা ও এই বিশ্বাস আছে যে, মৃত্যুর পরেও আত্মা থাকিবে, কিন্তু কি অবস্থায় থাকিবে, কে জানে?

আর যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, কোনও না কোনও আকার ধারণ অবশ্য-ম্ভাবী। ব্যক্তিগত জীবনের অমরত্ব যদি সত্য হয়, তবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানবাত্মার আকারান্তর ধারণ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। কারণ, ব্যক্তিগত অমরত্বের অর্থই এই যে, ইহজগতে যেমন আমরা প্রত্যেকে এক এক জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আছি, পরলোকেও সেইরূপ স্বতন্ত্র ব্যক্তি থাকিব, এবং তাহা হইলেই এই স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্যই একটা না একটা আকারের প্রয়োজন হইবেই হইবে। নিরাকার ব্যক্তিত্ব জ্ঞানে ধারণাই হয় না।

কেবল নিরাকার ব্যক্তিত্ব কেন, নিরাকার কোনও কিছুই জ্ঞানে ধারণা হয় না। শুদ্ধ নিরাকার কেবল একটা ভাব, একটা কল্পনা, একটা negative abstraction, একটা অভাবাত্মক শব্দ মাত্র। গুণবাচক বিশেষ্য মাত্রেই যেমন কেবল মাত্র একটা মানসিক সৃষ্টি, নিরাকারও সেইরূপ একটা মানসিক সৃষ্টি মাত্র। সাধুলোক হইতে স্বতন্ত্র সাধুতা, কৃষ্ণ বস্তু হইতে পৃথক্ কৃষ্ণত্ব কিম্বা সুন্দর ব্যক্তি বা বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য যেমন কেবল একটা কথার কথা মাত্র,—এ সকলের অস্তিত্ব যেমন কল্পনার রাজ্যেই আছে, খাঁটি বিষয়-রাজ্যে কুত্রাপি নাই, সেইরূপ শুদ্ধ নিরাকারও কেবল কল্পনা মাত্র, খাঁটি বস্তু নহে। শুদ্ধ নিরাকার বলিলে ঈশ্বরকে একটা negative abstraction, অভাবাত্মক কল্পনারূপে দাঁড় করান হয়।

নিরাকার চৈতন্য বলিলেও বেশী কিছু এগোয় না; তাহাতেও ঈশ্বরের স্বরূপ সত্য-রূপে ব্যক্ত হয় না। নিরাকার চৈতন্য অর্থ-শূন্য বাক্য। বিবর্ত্তন চৈতন্যের মৌলিক লক্ষণ। চৈতন্য মাত্রেই অভিব্যক্তি-পরায়ণ; আর অভিব্যক্তি বা Evolution অর্থই আকার পরিবর্ত্তন। চেতনের রাজ্যে সততই এক আকার বিনষ্ট হইয়া আকারান্তরের প্রকাশ হইতেছে। কোনও এক নির্দ্দিষ্ট আকারে আবদ্ধ থাকা যেমন চৈতন্যের পক্ষে অসাধ্য, সেইরূপ একেবারে নিরাকার হওয়াও তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

খাঁটি, যুক্তি-সঙ্গত নিরাকার-বাদ যদি কিছু থাকে, তাহার অপরিহার্য্য পরিণাম শূন্যবাদ। সেরূপ নিরাকারবাদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত না হইলেও, অজ্ঞেয়-

তার সূচিভেদ্য অন্ধকারের দ্বারা, সে সত্য-জ্যোতিঃ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

নিরাকার চৈতন্য যদি কিছু থাকে, তাহা অব্যক্ত চৈতন্য। তাহা পরব্রহ্ম, সে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরুপাধি। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নাই, উপাসনা হইতে পারে না। উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধের জ্ঞান উপাসনার ভিত্তিভূমি; এই সম্বন্ধ আবার উপাস্যের স্বরূপের ও উপাসকের প্রকৃতির জ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু নির্গুণের স্বরূপ জ্ঞান কি সম্ভব? জ্ঞান মাত্রেই গুণের বা সম্বন্ধের জ্ঞান। যাহার গুণ নাই বা গুণ ব্যক্ত হয় নাই, যাহার কোনও সম্বন্ধ নাই বা সম্বন্ধী সৃষ্ট হয় নাই,তাহার জ্ঞানলাভ কিরূপে সম্ভব? কেবল ব্যক্ত চৈতন্যই মানব-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে; অতএব কেবল ব্যক্ত চৈতন্যেরই উপাসনা সম্ভব। আর অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়ার অর্থই নিরাকারের আকার ধারণ। নির্গুণ,নিরুপাধি নিরাকার অব্যক্ত চৈতন্য যখনই মানবজ্ঞানে ব্যক্ত হয়, তখনই তাহা সগুণ, সোপাধি ও সাকার হইয়া যায়।

কিন্তু এই সগুণ-নির্গুণ-ভেদ-জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রণালী মাত্র। মূলত,বস্তুতঃ পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, ব্যক্ত ব্রহ্ম ও অব্যক্ত ব্রহ্ম, একই সত্তা, দুই নহে। যাহা অব্যক্ত তাহাই ব্যক্ত; যাহা নির্গুণ ও নিরুপাধি, তাহাই আবার যুগপৎ সগুণ ও সোপাধিক। জ্ঞান কালাধীন। দেশ এবং কালের ছাঁচে না উঠিলে কোনও বিষয়ই জ্ঞান-ভূমিতে প্রকাশিত হইতে পারে না। এবং যাহা অব্যক্ত ছিল,তাহাই ব্যক্ত হইল, যাহা ব্যক্ত হইবে, তাহাই অব্যক্ত আছে; এই আকারে না ভাবিয়া ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুএর কিছুরই জ্ঞানলাভ হয় না।

কিন্তু এরূপ বিভাগ করিয়াও জ্ঞান কোনও ক্রমেই সেই মূল অদ্বিতীয় সত্তার একত্ব ধ্বংস করিতে পারে না,বরং এই বিভাগের দ্বারাই, এই বিভাগের মধ্যেই, ব্যক্তাব্যক্তের অখণ্ডনীয় একত্ব পুনঃঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কারণ,ব্যক্তের,সগুণের,সোপাধিকের পশ্চাতে ইহার ভিত্তি ও অবলম্বন রূপে, মূল ও উপাদান কারণ রূপে, ইহার সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকিয়া,ব্যক্তের সঙ্গে সঙ্গেই অব্যক্ত, নির্গুণ ও নিরুপাধিক সত্তা জ্ঞানে যুগপৎ প্রকাশিত হইতেছে। ব্যক্তকে ছাড়িয়া অব্যক্ত অবোধ্য, অব্যক্তকে ছাড়িয়া ব্যক্ত অবস্তু। ইহাদের যে বিভিন্নতা তাহা জ্ঞানের প্রণালী মাত্র, নতুবা সগুণ নির্গুণ, ব্যক্ত অব্যক্ত একই বস্তু।

যাহা কারণে নাই,তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না। না সতো সজ্জায়তে—অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না। যাহা বীজে নাই, তাহা অঙ্কুরে বা ফলেও থাকিতে পারে না। এই জন্য এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, কারণ ও কার্য্য, বীজ ও ফল একই বস্তু,ইহাদের মৌলিক একত্ব সত্য, নিত্য, অবিনাশী। কোনও কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই বলিয়াছেন যে, কারণ আর কিছুই নহে, কেবল অব্যক্ত কার্য্য মাত্র এবং কার্য্যও আর কিছুই নহে, ব্যক্ত কারণ মাত্র। কারণে যাহা অব্যক্ত, কার্য্যে কেবল তাহাই ব্যক্ত; বীজে যাহা লুক্কায়িত, ফলে কেবল তাহাই প্রকাশিত।

তুমি মাতৃগর্ভে যাহা ছিলে,আজও তাহাই রহিয়াছ, অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও তাহাই থাকিবে। ভ্রূণ অবস্থায় তোমার যাহা ছিল না, জীবনে তাহা তোমার কদাপি হয় নাই, হইবে না,হইতে পারে না। শিক্ষা এবং সাধনায় কেবল সেই অব্যক্তকেই ব্যক্ত করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে তোমাকে কিছুই দান করিতে পারে না। জগতের কুত্রাপি, বিশেষতঃ চেতনের রাজ্যে,দানের স্থান নাই; বিকাশ বা অভিব্যক্তিই এ রাজ্যের মৌলিক ও সার্ব্বভৌমিক বিধান।

সূর্য্যের কীরণ, আকাশের বায়ু, পৃথিবীর রস, এসকল পুষ্পের বিকাশের সহায়। যে কোরকে অব্যক্তরূপ আছে,এ সকলের সহায়ে তাহার সেই রূপ ব্যক্ত ও প্রকটিত হয়, যে কোরকে লুক্কায়িত সৌরভ আছে, এ সকলে মিলিয়া তাহার সেই সুগন্ধই বিকাশ ও বিস্তার করে; কিন্তু সূর্য্যের কীরণ, আকাশের বায়ু